বাতায়ন
Batayan
সংকলন

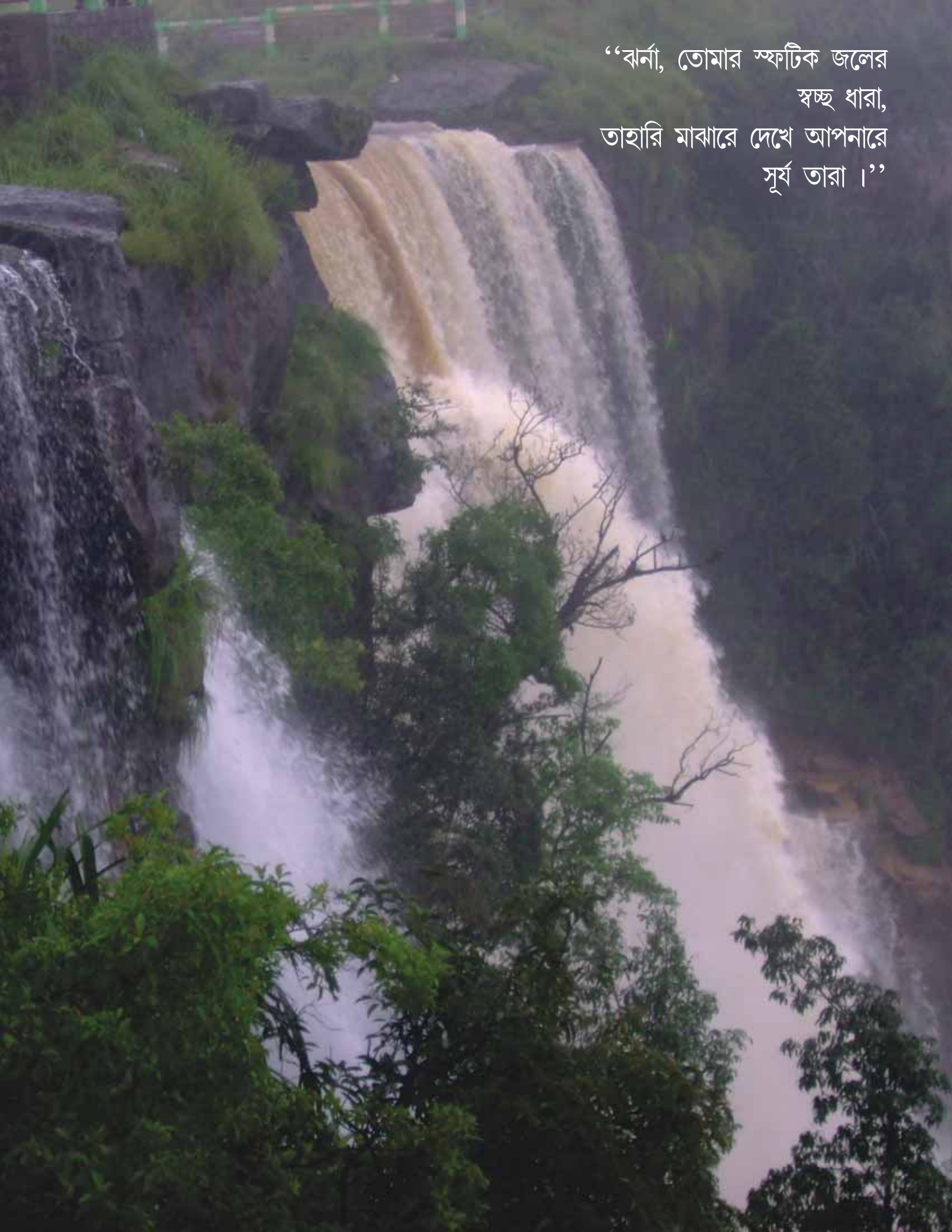

''ঝর্না, তোমার স্ফটিক জলের
স্বচ্ছ ধারা,
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্য তারা ।''

‘‘আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে’’

Sankalan

সম্পাদনা

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

অষ্টম সংখ্যা, জুলাই, ২০১৭

‘কেউ বা নিখাদ একাকী অন্তরা
নিঝুম ফেরে বইপত্তর কিনে
শামিয়ানার নকশা তাকে টানে
মন দিয়েছে লিটল ম্যাগাজিনে ।

---- ----- ----- ----- -----

রোদ উঠেছে শীতের সকালবেলা ।
জানলা খুলে একলা বসে ভাবি,
ফোন তুলে নিই । বন্ধুকে ফের বলি-
‘আজ বিকেলে বইমেলাতে যাবি ?’’

— শ্রীজাত
‘‘আজ দুপুরে’’

Contributors

দেবীপ্রিয়া রায় – লিখছেন স্কুল ও কলেজের দিন থেকে। পেশায় দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপিকা ও গৃহিণী। কাশীর প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মেয়ে দেবীপ্রিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে ডক্টরেট করে বিবাহসূত্রে সেই বছরেই আমেরিকা এসে শিকাগো শহরে বাসা বাঁধেন। গত ৪০ বছর শিকাগোর বাঙালী ও অবাঙালী সমাজের সাথে নানা ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। সাহিত্য চর্চ্চা দেবীপ্রিয়ার নেশা। শিকাগোর উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম সদস্য।

ইন্দ্রাণী দত্ত – সিডনির বাসিন্দা পেশায় বিজ্ঞানী কিন্তু গল্প লেখার তীব্র আকুতি টের পান। শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, ''আমরা যখন সত্যিকারের সংযোগ চাই, আমরা যখন কথা বলি, আমরা ঠিক এমনই কিছু শব্দ খুঁজে নিতে চাই, এমনই কিছু কথা, যা অন্ধের স্পর্শের মতো একেবারে বুকের ভিতরে গিয়ে পৌঁছয়। পারি না হয়তো, কিন্তু খুঁজতে তবু হয়, সবসময়েই খুঁজে যেতে হয় শব্দের সেই অভ্যন্তরীণ স্পর্শ।'' ইন্দ্রাণী খুঁজে চলেছেন।

Saswati Basu — Profession: University Teacher in Economics, lives in Sydney.

I enjoy this beautiful life thoroughly. Particularly I enjoy listening to songs, reading books on sociology, short stories, and travelling around. I love watching drama, good cinema and tennis. I also love to experiment with new cooking recipes and share them with our friends. Believe in donating money to voluntary organisations for the people in need.

নন্দিনী ঋদ্ধানশ – পেশাগত আর নেশাগত ভাবে শব্দের জগতের বাসিন্দা। স্বভাবে বোহেমিয়ান। কখনো মাছ হয়ে গভীর জলের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় আবার কখনো পাখী মনের ডানা মেলে নীল আকাশের দিকে ছুটে যায়। নিজের অস্তিত্বের অর্থ খোঁজা প্রধান লক্ষ্য। ভালোবাসে অন্যদের বলা গল্প আর বৃষ্টির গান শুনতে। জন্মস্থান শিলং, বর্তমান নিবাস কলকাতা, কর্মভূমি মানব মন।

সৈকত দে – ভারত সরকারের পরমাণু শক্তি বিভাগে কর্মরত প্রযুক্তিবিদ। পৈতৃক নিবাস উত্তরপূর্ব ভারতে অসমের তিনসুকিয়াতে। ছেলেবেলায় কাঁচা হাতের লেখায় 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের' 'শিশু প্রতিভা' খেতাবে পুরস্কৃত হয়ে লেখালেখির ভূত মাথায় চেপে বসে। কর্মজীবনে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের টানাপোড়েনে কোনটাতেই সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করা আর হয়ে ওঠে না। তাও প্রকাশিত অপ্রকাশিত রচনার সম্ভার নিয়ে এক অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যপ্রেমী হয়ে থাকতেই স্বচ্ছন্দ।

শাশ্বতী ভট্টাচার্য – যাদবপুর ইউনিভার্সিটির কেমেষ্ট্রিতে মাস্টার্স করে CSIR-এর স্কলারশীপে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটুট অফ্ কেমিক্যাল বায়োলজিতে পিএইচডি-র কাজ করেছেন। মেরিলান্ডের ন্যশানাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে পোস্ট ডঃ করে এখন ইউনিভার্সিটি অফ উইস্কনসিন, ম্যাডিসনে সায়েন্টিস্ট। ওর জীবনের অল্প কয়েকটা আফসোসের একটা হল, সায়ন্সকে জীবিকা নির্বাহ করার উপায় অবলম্বন করায় ওর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজটা একটুর জন্য হাত ছাড়া হয়ে গেলো।

Arpita Chatterjee — Postdoctoral Research Associate, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE-68198

Chumki Chatterjee — Co-editor : Kishore Bharati Magazine. CEO — Patra Bhatati Publication. Hobbies : Reading, writing, shopping.

মনীষা বসু – জন্ম কলকাতায়। সত্তর দশকে বিয়ের পর থেকে শিকাগোবাসী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক। Purdue University থেকে কম্পিউটার সাইন্সে বি এস ডিগ্রি। পেশায় আই. টি.। ছোটবেলার থেকেই লেখালেখির অভ্যাস। আমেরিকার বিভিন্ন বাংলা পত্র পত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রিয় অবসর – বই পড়া, গান শোনা, লেখা আর বাগান করা।

A curious study in contrasts, **Samrat** pursues pixels, paintbrushes, prose and poetry. Influenced by the surrealist and cubist art movements, he finds his inspiration in the random micro-moments of the macrocosm. He is someone in pursuit of an unknown mission, dabbling here and there and hoping he never finds it, for that would end this wonderful journey.

Souvik Dutta works as an IT professional in Chicago, IL and lives with his wife Amrita and son Hridaan. His passion includes study of ancient scriptures, texts and obscure works of Vedic sages. He lectures in and around the country on Vedic philosophies.

Menachem Ephraim Emanuel has devoted his dotage to pursuing his muse with a butterfly net. Born in Brooklyn he ended up in Chicago with stopovers in Washington DC, The Golan Heights, Alaska, and Seattle. Along the way he acquired seven children, several cats, a few grandchildren, a long suffering spouse and a severe case of rose fever.

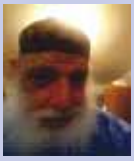

Maureen Peifer is a Chicagoan with a lifelong love of literature, writing, travel, and teaching. She is currently the school librarian at a Montessori school where she previously taught. Her summers are spent in Amsterdam, which inspired this poem.

Rochelle Wooding is a native of Ohio and graduate of Mercyhurst University with a Masters in Library Science. As a librarian in Chicago public schools, Rochelle demonstrated her love for literature in helping children develop reading habits and broaden their interests through books. She participates in the Chicago Writing Alliance and has published several first-person narratives.

Raised in rural Appalachia, **Josef Steiff** is a former social worker who now creates film, performance and written work that reflects his interest in the ways that people struggle to make personal sense out of random, impersonal events, exhibiting in the United States, Europe and Asia.

David Nekimken is a senior citizen who has been a poet most of his life, with poems published in a few publications. He has a self-published book of poems *Anything and Everything Goes*. He is a grandfather with three wonderful grandchildren. He currently lives in a housing co-op in Hyde Park.

Tinamaria Penn is a creative word artist and photographer who enjoys finding beauty in the mundane of everyday life experiences. It is Timamaria's aim to record moments in time through written expression and still pictures to help these moments to continue to live through the viewer's interpretation. Tinamaria now resides in Chicago, and her heart stays true to her Cleveland, Ohio roots. Some of her expressions can be found in her first published book, ***Clarity In Three Dimensions*** on Amazon.com

Ananda Sen is a Professor of Biostatistics at University of Michigan. Ananda also passionately pursues the hobby of acting whenever he can. When feeling stressed, he takes recourse to the Abrho keyboard on his desktop and types up Bengali poems. He is a regular contributor to Batayan. Ananda lives in Ann Arbor, Michigan with his wife and two kids.

Balarka Banerjee is a Molecular Biologist by profession and an executive in a Biotech company. Besides science his other passions are Drama — writing, acting, directing — Poetry and Art. He likes good cinema and music. He is a foodie and a good cook. No wonder he enjoys writing about his experiences and interests.

শুভ্র দত্ত – সিয়াটেলের বাসিন্দা, পেশায় রোবটিক্স প্রযুক্তিবিদ, আর নেশায় লিমেরিকবি, অর্থাৎ লিমেরিক লেখেন এমন কবি। তার চেয়ে একটু বিশদে বলতে গেলে – শুভ্র দত্ত আদতে কলকাতার ছেলে, পরে সিয়াটেল শহরের প্রায় তিন-দশকের বাসিন্দা। নানা সময়ে নানারকম পেশায় পা গলিয়েছেন – মহাকাশ বিজ্ঞান, ক্যামেরার ব্যবসা, বায়োমেডিকাল প্রযুক্তি, রোবটিক্স, ইত্যাদি প্রভৃতি। নেশাও নানান ধরণের; তার মধ্যে আছে ছবি তোলা, বাংলা বই পড়া, যন্ত্রপাতি তৈরী করা, ওয়েবসাইট বানানো, এবং অনর্থক অর্থহীন লিমেরিক লেখা। বাংলিমেরিক ডট কম (BangLimeric.com) ওয়েবসাইট ওনারই সৃষ্টি।

সুজয় দত্ত – ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

ধীমান চক্রবর্তী – জন্ম : ১৯৬৬ কলকাতা। বাল্য দিল্লিতে, কৈশোর কলকাতায়, প্রথম যৌবনের অধিকাংশ মুম্বাই-তে অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে প্রবাসী - প্রধানত এবং বর্তমানে মার্কিন মুলুকে, কিছুটা সময় জার্মানি এবং ফ্রান্স-এও। পেশায় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ও গবেষক। কাজের বাইরে সর্বঘটে কাঠালি কলা। নেশা : চা, ঘুম, কলকাতা।

রমা জোয়ারদার – দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম। গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলনঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ।

বিশ্বজিৎ মতিলাল, কলকাতায় সাংবাদিকতা, গণজ্ঞাপন, জনসংযোগ ও বিজ্ঞাপন শিল্পের দুনিয়ায় একটি অতি পরিচিত নাম। শিক্ষকতা এবং ছাত্রদের সাথে নানাভাবে নিজেকে যুক্ত রাখার আনন্দ তাঁর দক্ষিণের বারান্দা, টাট্‌কা হাওয়ার সুঘ্রাণ।

Swarvanu Sanyal — Software engineer living in Naperville, Illinois. I regularly write poems, fictional works like short stories, short plays and non-fictional works like essays in different topics.

I, **Allen McNair**, am a self-taught artist and poet inspired daily by the wonders of life around me, and by my present and past experiences. From individual poetic portrayals in my early years of writing, I have graduated to writing and illustrating my self-published epic saga, *I Dream of A'maresh*.

Viola Lee was born and raised in Chicago, Illinois. She studied Poetry at Loyola University, Chicago and received her MFA from New York University. Her poem *City of Neighborhoods* was published in an anthology of Chicago poetry called City of the Big Shoulders which was published by the University of Iowa Press. Her manuscript Lightening after the Echo was published by Another New Calligraphy last year. She teaches 6-9 year olds at Near North Montessori School and lives in Chicago with her husband, her son and her daughter.

Kathy Powers — I am a civil rights activist who developed my passions from coping with bipolar disorder symptoms. I have a tagline: "Advocacy is my therapy." Through advocacy I have discovered truth and beauty in helping people and sharing art.

Mohan Kharbanda has held key leadership positions operating Greenfield businesses in both the emerging and developed world. He received a bachelor's degree in mechanical engineering from the Indian Institute of Technology and a master's degree in business administration from the University of Minnesota. He currently serves on the advisory board of UT business school Center for Global Business. He has contributed to some business and political journals.

Bani Bhattacharyya — Since my childhood my passion was to write my day to day events. Born in Kolkata, I came to the USA in 1960's. Being married in America, I was busy to fulfill my professional duty and taking care of my family. Now, I live in Barrington, IL and enjoy writing novels, short stories and poems. Many of my articles are now published in Amazon and in various magazines.

Anjan Roy is a Freelancing Journalist writing in different Bengali Journals and Magazines in the US and abroad. He lives in Willowbrook, Illinois. Recipient of Mother Teresa Fellowship. He did master's degree of social work from Washington University Saint Louis, Missouri, USA. He was an eminent Journalist in Kolkata worked with Ananada Bazar Patrika, All India Radio and Calcutta Television and many others. Wrote articles and news-stories for Ananda Bazar Patrika, Desh, Hindusthan Standard, Amrita Bazar Patrika, Jugantar, Amrita, Paribartan and many other Calcutta-based newspapers and magazines.

বাতায়ন

Volume 2 : Issue Number 8 | Sankalan : June, 2017

EDITORS

Ranjita Chattopadhyay, IL, USA
Jill Charles, IL, USA (English Section)

DESIGN AND ART LAYOUT

Kajal & Subrata, Kolkata, India

PRODUCTION & MANAGEMENT

Anusri Banerjee, Perth, Western Australia;
a_banerjee@iinet.net.au

PHOTOGRAPHY

Front Cover : Captiva Island, Florida, US — Saumen Chattopadhyay, IL, USA
Front Inside Cover : Khayam Falls, Shillong, Assam — Arpita Chatterjee, IL, USA
Title Page : Cottesloe Beach, Western Australia — Tirthankar Banerjee, Perth, Australia
Title Page Back : Kolkata Book Fair 2017 — Tirthankar Banerjee, Perth, Australia
Back Inside Cover : Chicago Skyline — Kathy Powers, IL, USA
Back Cover : Life Feathers by Tinamaria Penn, IL, USA

PUBLISHED BY

BATAYAN INCORPORATED, Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org / www.batayan.org

Our heartfelt thanks to all our contributors and readers for overwhelming support and response.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

বাতায়নের দ্বিতীয় ''সংকলন'' সংখ্যাটির সম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে কিছু ভাবনা মনে আসছে। ইচ্ছে করছে সেই সব ভাবনা আপনাদের সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিই। আজ থেকে প্রায় বছর দুয়েক আগে একটা ছোট্ট স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে জন্ম হয়েছিল 'বাতায়ন' পত্রিকার। কি ছিল সেই স্বপ্ন ? স্বপ্ন ছিল নিজেদের মনের জানালা উদারভাবে খুলে দেওয়া। সে আর এমন কি ব্যাপার ? জানালার পাল্লা ধরে বাইরের দিকে ঠেলা দিলেই হয় ! এ চিন্তা মনে আসা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু রোজকার জীবনের চাহিদা মেটাতে মেটাতে কখন যেন সেইসব জানালার পাল্লাগুলো ভারী আঁটসাঁট ভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মনের জানালা খোলার তাগিদ তাই বেশ টের পাচ্ছিলাম। খোলা জানালা দিয়ে মনের আঙিনায় অনেকটা আকাশ, ঝলমলে আলো আর খোলা হাওয়া ঢুকবে এমনটা আশা ছিল। প্রতিশ্রুতি ছিল সেই উদার আলো বাতাসের সান্নিধ্যে নিজে সমৃদ্ধ হওয়া এবং অপরকে সমৃদ্ধ করার। মনের মুক্তাঙ্গনে সকলে একসঙ্গে সামিল হওয়ার আশায় বাতায়নের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার পথে আমাদের এগিয়ে চলা। আমার মতো আপনারাও নিশ্চয়ই মনের বন্ধ জানলা খোলার তাগিদ ভিতরে ভিতরে অনুভব করছিলেন। আর তাইজন্যই এই কাজে আপনাদের অনেকের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি সেই প্রথম দিন থেকে।

প্রখ্যাত আমেরিকান সাহিত্যিক হেলেন কেলার বলেছেন, 'The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.' হৃদয়ের সেইসব অনুভূতি প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল ভাষা। চলচ্চিত্র, নাটক এইসব শিল্প মাধ্যমের গোড়ার কথা হল ভাল গল্প। বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর 'পথের শেষ কোথায়' বইটির মুখবন্ধে বলেছেন, 'সত্যজিৎ রায় যত বড় চিত্র পরিচালক হোন না কেন, তিনি কি পথের পাঁচালীর মতন বিস্ময়কর কলাসৃষ্টি করতে পারতেন বিভূতি বন্দ্যোপাধায়ের উপন্যাসের ভিত্তির উপর নিজের সৃষ্টিকে আশ্রয় না করে ? ---- শম্ভু মিত্রের 'রক্তকরবী', 'পুতুল খেলা' কিংবা 'দশচক্র' কি তিনি রঙ্গমঞ্চে এমন সার্থকরূপে দাঁড় করাতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ এবং ইবসেনের সাহায্য না নিয়ে ?' ভাবের আদান প্রদানের জন্য ভাষা একমাত্র না হলেও একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম একথা অনস্বীকার্য। সভ্যতার আদিকাল থেকে মানুষ তার চিন্তা, উপলব্ধি প্রকাশ করে চলেছে লিখিত শব্দের সাহায্যে। তার অনিবার্য ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে গল্প, গান, কবিতা।

মনের ভাব প্রকাশের এই সহজ পন্থাটি আশ্রয় করে আমরা রূপ দিয়েছি বাতায়ন সাহিত্য পত্রিকার। কয়েকটি বিশেষ বিভাগ দিয়ে সাজিয়েছি এই ''সংকলন'' সংখ্যা। বিভাগগুলি হল কবিতা, গল্প, অনুবাদ, প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ, বিজ্ঞান ও ভ্রমণ। ইংরাজী ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে বাতায়নের প্রথম সংখ্যা 'জীবনের উৎসব' প্রকাশিত হয়েছিল। সেই শুরু আমাদের পথ চলার। এই ''সংকলন'' সংখ্যাটি আমাদের অষ্টম সংখ্যা। আমাদের ওয়েবসাইট www.Batayan.org এ গিয়ে সব সংখ্যাগুলি দেখলে বেশ অবাক লাগে। মনে হয় এতটা পথ চলে এসেছি ? আশা রাখি আরও অনেকটা পথ এগিয়ে চলব একসঙ্গে।

বাতায়নকে ভালবেসে পত্রিকাটির পাশাপাশি থাকার জন্য আপনাদের মত পাঠকদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই এই পত্রিকায় যাঁরা লেখা দিয়েছেন তাঁদের সকলকে। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরের কবি, সাহিত্যিকদের লেখায় ঋদ্ধ এই সংকলন। কিছু পূর্ব প্রকাশিত লেখার সঙ্গে নতুন লেখার সংযোজন এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। যে সব আলোকচিত্রী বিশ্বাস করে আমাদের হাতে নিজেদের শিল্প তুলে দিয়েছেন তাঁদের সকলকে বাতায়ন পত্রিকার পক্ষ থেকে অজস্র ধন্যবাদ। আপনাদের আলোকচিত্র বাতায়ন অলংকরণের বিশেষ উপাদান। যে কোন নাটকে প্রধান কুশীলবদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু সব নাটকেই কিছু নেপথ্যচারী থাকেন যাঁদের ছাড়া নাটক মঞ্চস্থ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এইরকম কিছু নাম হল গীতি ঘোষ, সুজয় দত্ত, আনন্দ সেন। বাতায়নের আজকের এই সর্বাঙ্গসুন্দর রূপদান প্রায় অসম্ভব হত এই মানুষগুলির সমর্থন, ভালবাসা ও সাহায্য না পেলে। পত্রিকার সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ ইংরাজী বিভাগটি সহকারী সম্পাদিকা জিল চার্লস-এর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা জিলের অনুপ্রেরণা। দেশ ও ভাষার ব্যবধান পার হয়ে এই ভালবাসাই আমাদের যোগসূত্র। আজকের দিনে যখন, সারা পৃথিবী জুড়ে হিংসা ও হানাহানির প্রবল প্রকাশ তখন এইরকম কিছু ভালবাসার যোগসূত্র মানুষের প্রতি মানুষের আস্থা রাখতে সাহায্য করে। 'রাতের তপস্যা' একদিন 'শুভদিন' আনবেই – এই বিশ্বাস পাথেয় করে আমরা এগিয়ে চলছি। বাতায়ন সংকলন সংখ্যা আপনাদের মন ভরিয়ে দেবে এই আশা আমাদের। আপনাদের কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ আগামী দিনগুলোতে পাশে থাকার জন্য। বাতায়ন পড়ুন, পড়ান। সকলে ভাল থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। আপনাদের জীবন সুখ, স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যে ভরে উঠুক এই প্রার্থনা জানাই।

শুভেচ্ছা আর ভালবাসাসহ,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

Bengali Section

— কবিতা —

বাইশে শ্রাবণ 10
আনন্দ সেন

লিমেরিক 11
শুভ্র দত্ত

নিরুদ্দেশ 12
সৌগত দত্ত হাজরা

প্লুটো 12
পিনাকী গুহ

কাজের লোক 13
শুভ্র দাস

তুমি ও আমি 13
দেবাশীষ ব্যানার্জী

অমৃত কলস 14
অর্পিতা চ্যাটার্জী

চেনা কাক 14
ইন্দ্রানী দত্ত

— গল্প —

অনুগল্প 15
ইন্দ্রানী দত্ত

গ্র্যান্ডভিউ হোটেল 16
শাশ্বতী বসু

তারিণী মামা 21
নন্দিতা রায়

অবস্থান 23
চুমকি চ্যাটার্জী

জোড়া হেলিক্সের সিঁড়ি 24
রুমী ভট্টাচার্য্য

মৃগদাব 27
ইন্দ্রাণী দত্ত

বেটু 30
শুভ্র দত্ত

উড়ো কাগজের টুক্‌রো 34
রমা জোয়ারদার

আজকের শ্যামা 36
সুজয় দত্ত

— অনুবাদ —

মীরের শের থেকে 43
ধীমান চক্রবর্তী

The Pilgrimage 48
Transliterated by Atithi

যদি ভুলে যাও 49
আনন্দ সেন

— প্রবন্ধ —

কবি প্রণাম 50
সুনয়না ইয়াং

ঠাকুরের কাছ হতে ঠাকুরকে পাওয়া 51
দেবীপ্রিয়া রায়

মাতৃভাষার আসল সংজ্ঞা 54
নন্দিনী ঋদ্ধান্‌শ

বাংলা কবিতা ও পাঠক 55
স্বরভানু সান্যাল

আমার পুজো, ওদের পুজো 58
সৈকত দে

— স্মৃতিচারণ —

ডিস্‌ওরিয়েন্টেড বা দিকভ্রান্ত 60
মনীষা বসু

ছেলেবেলার কথা 62
বানী ভট্টাচার্য্য

যাত্রায় শ্রীকৃষ্ণ হয়েছিলেন উত্তমকুমার 64
বিশ্বজিৎ মতিলাল

— বিজ্ঞান —

বুঝিবে সে কিসে 65
শাশ্বতী ভট্টাচার্য

— ভ্রমণ —

ভারতের বাহিরে টানিছে বিশ্ব 69
চিত্রা বসু
নীল আকাশের নীচে 72
রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

English Section

– Poems –

Gray Wilderness 80
Viola Lee
Mango King of Trees 81
Menachem Emanuel
Circle of Life, Circle of Being 83
David Nekimken
North Sea Jazz 84
Maureen Peifer
Communication of the Self 85
Allen F. McNair
If Our Hearts Travel 86
Jill Charles
You and I 86
Balarka Banerjee
Regarding Utopia 88
M. C. Rydel
Is This Bliss? 102
Kathy Powers
To Grandmother's House 105
Shreya Datta

– Essays –

Siding 87
Josef Steiff
Solis Invicti 89
Souvik Dutta
I Cannot Live Without Books 91
Rochelle George Wooding
A Glorious Defeat 92
Anjan Roy
A Journey With No Return 96
Mohan S. Kharbanda

– Stories –

Black Pearl 99
Mekhala Banerjee
Guavas Grow Near Juba – A Memoir 103
Bakul Banerjee
The Last Lesson 106
Jill Charles
The Land Where It Rained Erasers 116
Samrat Bose

– Review –

Pappadum 119
Balarka Banerjee

— কবিতা —

বাইশে শ্রাবণ

আনন্দ সেন

সকাল থেকে মাঝ আকাশে মেঘ জমে
লোডশেডিং এ চুলের গোড়ায় ঘাম নামে ।

বাজার মুখো চটির মৃত্যু রাস্তাতেই
এবার গ্রীষ্মে আমের তেমন ফলন নেই ।

গলির মোড়ে কফির দোকান সরগরম
কলেজ স্ট্রীটে বইপাড়ায় আজ বিক্রি কম ।

গাড়ীর কাঁচে বৃষ্টি মোছে উদাস চোখ
ছন্দ ছাড়াই হাঁটছে পথে হাজার লোক ।

স্কুলের ছেলে পিঠের উপর ব্যাগের চাপ
মানুষ হয়ে রাখতে হবে পায়ের ছাপ ।

অফিস ফেরত ভাবনাগুলো হোঁচট খেলো
মলের আলোয় সেলফিতে মুখ হারিয়ে গ্যালো ।

ভাসছিল দিন একঘেয়ে রোজ যেমন ভাসে
ফোনের বুকে হঠাৎ কখন মেসেজ আসে ।

সন্ধ্যে বেলা চিলেকোঠার একলা ঘরে
আকাশ এখন অন্য রঙে জানলা জুড়ে ।

হঠাৎ যেন কাঁপছে পাতা, গাইছে বাতাস
ওরা জানে আজ বাইশে, শ্রাবণ মাস ।

ধুলোয় মোড়া সঞ্চয়িতায় পড়ল হাত
ইউটিউবে দেবব্রতর জ্যোৎস্না রাত ।

হাতড়ে অতীত চ্যাটের ঘরে আলাপচারি
সর্বনেশে চোখ ছিল তার, এখন বুড়ি ।

হঠাৎ ঝেঁপে কাব্যি এল মাঝরাতে
সারা শহর ব্যস্ত তখন বৃষ্টি খেতে ।

কালকে থেকে দিনের পরে দিন যে যাবে, যেমন যায় ।
আসছে বছর আবার কোথাও দ্যাখা হবে পূর্ণিমায় ।

— কবিতা —

লিমেরিক

শুভ্র দত্ত

বুঝিয়ে দেখাই তোদের, কিভাবে সূর্যটা যায় অস্ত
অথবা কি করে ভাগ্যের ফেরে হয় সে রাহুগ্রস্ত
এই বলে দাদা তার দুআঙুলে
সৌখিন চীনেপ্লেট থেকে তুলে
মুখের ভিতর করল চালান রসগোল্লাটা মস্ত ।

***** ***** ***** *****

ভিড় করে তোরা দেখিস দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো ছবি
কত না বাহবা, পিছনের থেকে আমি শুনছি তো সবই
আমি যে পেরেক দেয়ালের পারে
ছবিটা আমিই রেখেছি তো ধরে
ভাবি, কবে তোরা আমার দিকেও একটু নজর দিবি ।

***** ***** ***** *****

তর্কের খাতিরেই এটা ধরা যাক তো
এক্সপিরেশন ডেট যদি লেখা থাকতো
বিষের শিশি লেবেলে;
সেই ডেট চলে গেলে
সে বিষ কি হত বেশী না কম বিষাক্ত?!

***** ***** ***** *****

কতই কেতায় বাজায় বাঁশি পাশের পাড়ার কানাই
সারে-গামা-পাধা-নি এই সাত স্বর তার জানাই
বানালো এক অদ্ভুত রাগ
পা ও ধা বর্জিত বেহাগ
নাম সে রাগের কি দেওয়া যায়? দিল ‘ধানাইপানাই’ ।

আকাশে উদিত বাঁকা রামধনু, অপূর্ব শোভা কি যে
সে ধনু তৈরী বৃষ্টিজলেই, ভুলে গেছিলাম নিজে
হায় হরি, শেষে একটু বাদেই
সে মেঘ মাথার ওপর এলো যেই
সাথে নেই ছাতা, অবস্থা যা তা, পুরোই গেলাম ভিজে ।

***** ***** ***** *****

যখনই জল আর ভোদ্‌কা মিশিয়ে গ্লাস থেকে ঢালি গলে
একটু বাদেই মাথা ল্যাগ্‌ব্যাগ পা-টা ঝিম্‌ঝিম্‌ টলে ।
জল-ও-রাম, সবই দেখি একই ফল ।
তাই ভাবি কিছু গড়বড় আছে নির্ঘাত ওই জলে ।

***** ***** ***** *****

চাঁদটাকে টানে পৃথিবী, চন্দ্র তাকে ঘিরে ঘোরে সে টানে
পৃথিবী তো ঘোরে সূর্যকে, সূর্য কাকে ঘিরে ঘোরে কে জানে
ঘোরায় ঘোরায় ঘোর লেগে যায়
ঘোর ঘনঘোর গোলোক ধাঁধায়
সে ঘোরার ঘোরে শুধু মাথা ঘোরে ব্রহ্মাণ্ডের-এ জ্ঞানে ।

***** ***** ***** *****

রংটা চাপা ? দরদীজন এই উপদেশ বিলায় তারে
ম্যাজিক ক্রীমের জাদুই শুধু ওর সমাধান করতে পারে
হায়রে আমার দরদীজন
কোন জাদু মন করবে শোধন
না পালটালে দৃষ্টি তোমার মনের কালো ঘুচবে না রে ।

— কবিতা —

নিরুদ্দেশ

সৌগত দত্ত হাজরা

এগিয়ে চলেছে তরী —
যেন জীবনেরই মতো ধীর সুনিশ্চিত লয়ে
অজানা ভবিষ্যৎ অভিমুখে ।
দিগন্তে মিলায় তটরেখা —
অস্পষ্ট অতীত যেন, বিস্মৃতির কুয়াশায় ঘেরা ।
সামনে চলেছে তরী, বিগতকে পিছে ফেলে রেখে ।

একটি, দুটি, তিনটি —
ক্রমশঃ অজস্র ঢেউ তুলে,
প্রগাঢ় নীলের বুকে দুধসাদা ফেনারেখা এঁকে,
জীবনেরই মতো যেন কালের অতল জলধিতে
স্থায়ী চিহ্ন রেখে যেতে চায় ।
নিজেরই চারপাশে বহু সাধ, বহু যত্নে তোলা
ছোট্ট সে আলোড়ন, কটি মাত্র ঢেউ —
নিমেষে মিলিয়ে যায়, সময় রাখেনা মনে তাকে ।

শাশ্বত হবেনা জানে, তবু থেমে থাকে না এ তরী ।
কী এক অমোঘ টানে অজানা সমাপ্তিরেখা পানে
এগিয়ে চলেছে শুধু — গতি আছে, গন্তব্য নেই ।

প্লুটো

পিনাকী গুহ

ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ছেলে বলে,
প্লুটো আর গ্রহ নয় সেটা জানো ?
নয়ে নবগ্রহ পড়া মনটা ধাক্কা খেল
কি কান্ড ! গুগুলেও দেখি সেটাই শেখানো ।

বিজ্ঞান ছোটে অশ্বমেধের ঘোড়া,
কাল অজানা, আজকেই হয় জানা ।
তবু পরিবার থেকে নির্বাসনের আগে,
তার মত কেউ জিজ্ঞেস করবে না ?

কি যায় আসে ? ছেলে সান্ত্বনা দেয়,
বামন গ্রহ, অবয়ব খুব ছোট ।
তাই গ্রহ সংসারে অপাংক্তেয় সে আজ,
ছিন্নমূল হল আমাদের প্লুটো ।

প্লুটোর স্মৃতিতে টাইম মেশিনে ছুটি,
ক্লাস ফাইভের সিলেবাসে মুখ গুঁজি ।
ঝিঁঝিঁর কোরাস, লো-ভোল্টেজের আলোয়
আলো-আধাঁরির ছেলেবেলাটাকে খুঁজি ।

লাভ নেই জানি উই ধরা বই ঘেঁটে,
গুগুল করি, ছেলেকে নিয়ে কাছে,
দেখি, গ্রহপুঞ্জের সংসারে আজ প্লুটো
নিশ্চয়ই বেশ সুখে শান্তিতে আছে !

— কবিতা —

কাজের লোক

শুভ্র দাস

নানা ভাবে এরা এসেছে আমাদের জীবনে
কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অসহায়া,
কেউবা পিতৃ বিয়োগে,
সদ্য স্বামীহারা কেউ,
কেউবা স্বামী পরিত্যক্তা,
আবার দারিদ্র্যে অপারগ, নাচার পিতামাতার অনুরোধে কেউ ।

উৎসুক চোখে ওরা এসেছে
মাসান্তে কিছু টাকা,
আর দিনান্তে পেট ভরার আশায় ।
পরিবর্তে, যে ভালবাসা দিতে পারেনি একান্ত আপনদের
তাই তারা উজাড় করেছে পরের ছেলেমেয়েদের জন্যে

আমরা কখনো এদের ডেকেছি রুমা,
কখনো গৌরী, শ্যামলী, বুড়ি, পঞ্চমী, হিমানী, সবিতা, কাজল
কখনো বা শিখা, সাবিত্রী
প্রবাসী ছেলেমেয়েদের আশা ভরসা থেকে
এখন তাদের বাবামায়েদের কাছে
এরা হয়েছে অপরিহার্য

সকালের জলখাবারে,
সপ্তাহের রেশনে,
রান্নার বাসন পরিষ্কারে,
সময় মত বাতের ওষুধ এগিয়ে দেওয়ায়,
হঠাৎ অসুস্থ হলে ডাক্তার ডাকায়,
আর সপ্তাহে একদিন টেলিফোন এলে
উৎসুক বাবা-মায়ের হাতে এগিয়ে দেওয়াতে,
সর্বত্রই রয়েছে এদের হাত

বছরে একবার ছেলেমেয়েরা আসে,
হই হুল্লোড় করে চলে যাবার সময়
মোটা বখশিস গুঁজে দেয় হাতে
বলে মা বাবাকে দেখিস, তারপর

তারপর, রোজকার কর্মময় একঘেয়েমির শেষে, টিভির পর্দার সামনে
নিজেদের স্বপ্নগুলোকে বিসর্জন দিতে দিতে
এরা হয়ত আগামী জন্মের স্বপ্ন দেখে — প্রবাসী হবার ।

তুমি ও আমি

দেবাশীষ ব্যানার্জী

তুমি ও আমি,
আর আমাদের মতো
অজস্র বেনামী প্রতীক্ষার ভিড়ে
সহস্র বিছিন্ন দ্বীপের ক্ষত
আর নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি
নির্জন নদীতীরে

তুমি ও আমি,
বায়ু হয়ে ছুঁয়ে আসি
আয়ুরেখার দুই প্রান্ত
ক্লান্ত, অবশ্রান্ত পথে
সাথে করে নিয়ে আসি ফিরে
ইমন রাগে বাঁশি

তুমি ও আমি,
মেঘ হয়ে শুয়ে
সৌদামিনীর বিষাক্ত আঁচলে
বেলা শেষের পরে
বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি ধরে
অলক্ষ্যে, অজান্তে
নিশ্চুপ, রামধনুর দুই প্রান্তে

তুমি ও আমি,
আর আমাদের মতো
বাদামী পাতার নীড়ে
স্বপ্ন বয় কীট হয়ে
আঁকা বাঁকা নদী পথে
বিলীন বিষন্ন সমান্তরালে

তুমি ও আমি,
সহস্র যোজন দূরে
দুই দ্বীপের দুই মরুভূমি

— কবিতা —

অমৃত কলস

অর্পিতা চ্যাটার্জী

কতকাল আগে ঠিক মনে পড়ে না ।
মনে হয় গত জন্মের আবছা স্বপ্ন ।
নাকি তারও আগে ?
নাকি দুই জন্মের মাঝখানের
কোনো এক ভাসমান সময়ের কাহিনী এ ?

অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা, যখন
নজর ফেরাতে দেয়নি
প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্যের দিকে ।
উপেক্ষিতা প্রেমিকার মন
উপেক্ষা করেছিল মায়ের মুখ ।
পুঞ্জীভূত অভিমানে,
গৃহকোণের অমৃতকলসও ছিল
কনীনিকা স্পর্শ বঞ্চিত ।
অতল স্পর্শী ক্ষোভ সম্বল করেই
জন্ম শেষ হয়েছিল সেইবার ।

তারপর মৃত্যুতে হলো মিলন ।
অভিমান সমাপ্তিতে দৃষ্টি পথে এলো
ফেলে আসা বন্ধ দ্বার ।
ক্ষমাহীন ভ্রান্তির প্রতিরূপ ছিল যা ।
একটি গোটা জন্ম ধরে,
অমৃতকুম্ভ অস্পৃশ্য রাখার ভ্রান্তি ।
যে দ্বার রুদ্ধ এখন ।

বন্ধ দুয়ারে ক্লান্ত আঘাত শেষে —
কে যেন পাঠালো আশ্বাস ।
'বেশ, আর মাত্র একটি জন্ম পাবে তুমি ।'
'শেষ বারের মতো ।'
খুললো দুয়ার ।
মুক্তি হলো যেন ।
যেমনটি হয়েছিল প্রস্তরীভূত অহল্যার,
একটি পদ স্পর্শে ।

সেই থেকে খুঁজে চলেছি স্পর্শ ।
অমৃত কলসের ।
পান করব ? এ তো স্পর্ধা !
কেবল স্পর্শ টুকুতেই আমার মুক্তি ।
গত জন্মের অপ্রাপ্তি আর
জন্মান্তরের অহং থেকে ।
মুক্তি, এজন্মের আমি'র
আমিত্ব থেকে ।

চেনা কাক

ইন্দ্রানী দত্ত

দেরি হবে আজ — এতো জানাই ।
শয্যার মল্লিকাকুসুম
রজনীগন্ধার মালাদুটি
চন্দনের সাজ
কতদিন পর আবার এসব
গুছিয়ে আসতে
সময় লাগবে বৈকি

কাক বসে আছে ছাদের আলসেয়
চেনা কাক
থাক বসে
অপেক্ষায়

আজ কিছু দেরিতে প্রাতরাশ হবে ।

— গল্প —

অনুগল্প

ইন্দ্রানী দত্ত

অনুগল্প - ১

— 'এই লীলা, কাল ফোন করলি না তো। রাতের দিকে একটা এস এম এস করলাম তোকে। পেন্ডিং দেখালো। মোবাইল অফ করে রেখেছিলি না কি ?'

— 'হুঁ। শুয়ে পড়েছিলাম আধখানা ভ্যালিয়াম খেয়ে।'

— 'মাথা ধরেছিল ?'

— 'সে তো আছেই। নিত্য সঙ্গী। আসলে কাল ও এমন অসভ্যতা করছিল — অসভ্যতাই আর কি বলব —'

— 'কেন কি হয়েছে ?'

— 'কিছুই না। কোনো ইস্যুই নয়। কোথায় কোন লকে চাবি লাগছে না, কোথায় কোন ক্যাবিনেটের হ্যান্ডেল খসে পড়ে গেছে, আমি ভুলে রাখি নি তাই হারিয়ে গেছে — এই সব ফালতু ব্যাপার নিয়ে এমন বিশ্রী ভাবে বলল যে তুই ভাবতে পারবি না।'

— 'সে তো আমাকেও, রোজই কিছু না কিছু, আর সবই নন ইস্যু। ইচ্ছে করে সংসারের মুখে ইয়ে দিয়ে চলে যাই। এই লোক গুলো যে কি। পুরুষ বিশেষ করে বাঙালী পুরুষ মানেই এই। সব বাড়িতেই তো এক প্রবলেম শুনি। সত্যি দেখবি একদিন চলে যাব সব ছেড়ে।'

— 'কাল বলে কি না — কি কর সারাদিন বাড়িতে, কিছু খেয়াল রাখতে পারো না ? আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে বলল। আঙুল তুললে এমনিতেই আমার মাথায় রক্ত উঠে যায় তার ওপর এই বয়সে এখন যদি কি করি করেছি শুনতে হয় — রাগে মাথা ঝনঝন করছিল, ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়লাম। সেদিন বলল গেট আউট কি না এক কথা তিনবার বলেছি। তুই ভাবতে পারিস শম্পা ? নিজের ওপরই রাগ হয় কেন পড়ে আছি এখানে। আর তুই বলিস শংকরের মেজাজ এর কথা। রূপকের আসল চেহারা যদি দেখতি। রেগে গেলে যা মনে হয় তাই বলে। ভাবতে পারবি না।'

— 'আরে গেট আউট মানে কি গেট আউট। আমাকে তো চুলের মুঠি ধরে চড়ও মেরেছিল শংকর।'

— 'কি বলিস মেরেছিল তোকে ?'

— হ্যাঁ, আমিও মুচড়ে দিয়েছিলাম হাত। ৬ মাস বাড়ি ছেড়ে, পুপুনের কাছে ছিলাম।'

— 'থাক থাক ওসব কথা। আর ভাবিস না। পরশু আসছিস তো রূপাই-এর জন্মদিনে ? এখন রাখলাম। বেরোবো। রাতে কথা হবে।'

শম্পা চিরকাল সেই রকম রয়ে গেল — কেমন একটা লো ক্লাস — মারামারি করে, আবার সে সব কথা হড়হড় করে বলে দেয় — ভাবতেই শিরশির করে আলতো একটা আনন্দ হ'ল লীলার। রূপকের নম্বর টিপল — 'শুনছ ? ব্যস্ত নাকি ?'

— গল্প —

গ্র্যান্ডভিউ হোটেল

শাশ্বতী বসু

— স্লো কর স্লো কর — হঠাৎ বলে ওঠে নীলা।

সুনন্দ তাড়াতাড়ি করে গাড়ীর গতি কমায়। রাস্তার পাশেই একটু নীচু জমিতে পাইনের জঙ্গল। সেই জঙ্গলের বাইরে খোলা জমিতে দিনের আলোয় ঝাড়বাতি সদৃশ বিশালাকায় শিং নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সেই চির পরিচিত সান্তাক্লজের শ্লেজ গাড়ীর সারথি Rein deer। হরিণ। নীলা ক্যামেরা হাতে নিয়ে ঝটিতি গাড়ী থেকে নামতে যায়।

— নেমো না। ওরা চলে যেতে পারে। আর গেলে, তাকিয়ে দেখো আমাদের গাড়ীর পেছনে অন্য গাড়ী গুলোর দিকে। ওরা তোমায় আস্ত রাখবে ভেবেছো ? সুনন্দ বলে।

নীলা থামে। খুব ধীরে গাড়ীর কাঁচ নামায়। তারপর ক্যামেরা ফোকাস করে ক্লিক করতেই তিনি মুখ ঘুরিয়ে পেছন ফিরে চলতে শুরু করলেন। ক্যামেরার পর্দায় ততক্ষণে তার পেছনের অংশটি বিদ্যমান।

— যাঃ ধরতে পারলাম না। হতাশ হয়ে বলে নীলা।

— আবার কোনো সময়ে পেয়ে যাবে। এখন চলো। সূর্যাস্তের আর মাত্র আধঘন্টা বাকি আছে। সুনন্দ গাড়ী স্টার্ট করতে যায়।

— না দাঁড়াও না আর একটু। নীলা অধীর ব্যগ্রতায় বলে।

— তবে দাঁড়াই। সানসেট দেখতে না পেলে আমায় যেন বলো না কিছু।

ওরা দাঁড়িয়ে থাকে। আরিযোনা স্টেটের ইউ এস হাইওয়ে 64 এর ওপর। ঝকঝকে কালো পীচের রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে সেই গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের সামনে। যেন কেউ এক কুচকুচে কালো চাদর টানটান করে পেতে রেখেছে।

এমন পরিষ্কার সে রাস্তা। দুপাশে পাইনের ঘন জমাট জঙ্গল। কোনোটা বয়স্ক, কোনোটা তরুণ, কোনোটা আবার লাল রঙে রঙ্গীন। পাইনের তলায় বুনো ঘাস। ঘাসে হলুদ ফুল ফুটে আছে। সেই ফুল আর সজীব ঘাস খেতে হরিণেরা জঙ্গল ছেড়ে চলে আসে হাইওয়ের ধারে। আবার তাদের লোভে আসে তাদের প্রেডিটর — নেকড়েরা। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে বেড়াতে আসা ভ্রমনার্থীরা ভাগ্যবান হলে তাদের দেখা পেয়েও যেতে পারে। নীলারা সেই ভাগ্যবানদের দলে বোধ হয় নয়। তাই খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও হরিণ বা তাদের শিকারী, কারোর দেখাই মিললো না। সূর্য ততক্ষণে যাই যাই করছে। তরুণ পাইনদের ছায়া একদিক থেকে আর এক দিকে দীর্ঘতর হচ্ছে। নীলা মন্ত্রমুগ্ধ।

— অনেক হয়েছে। এবার চলো। ঘড়িতে তখন কয়েক মিনিট বাকি সূর্য ডোবার। সুনন্দ গাড়ীর স্পীড তোলে গাড়ীতে স্টার্ট দিয়েই। লক্ষ্য ইভাপাই ভিউপয়েন্ট। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। সাউথ রিম।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখতে এসেছে ওরা সেই কলকাতা থেকে। তারপরে লস্ এঞ্জেলেস্ থেকেই ওরা গাড়ী ভাড়া করেছে। সান ডিয়েগো, টুস্কান, ফিনিক্স আর ফ্ল্যাগস্টাফ হয়ে তারপরে এখানে। ক্যালেন্ডারের ছবি দেখে আর বন্ধুদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রোমহর্ষক বিবরণ শুনে শুনে ওদের মনে অনেক দিন ধরেই এখানে আসার ইচ্ছেটা দানা বাঁধছিল। এবার কিছুদিনের ছুটি পেয়েই ওরা সটান বেরিয়ে পড়েছে। টিকিট বুক করেই সুনন্দ ওকে ফোনে বলেছিল — মেনি, ডান.....

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। নো জোক্। হাতে কড় কড়ে ইটিকিট। বলেই প্রাণ খুলে হেসেছিল সুনন্দ। হেসেছিল নীলাও। তবে অন্য আর একটা কারণে। মন খুব ভালো থাকলে সুনন্দ নীলাকে আদর করে ঐ নামে ডাকে। নামটা কিছু বেমানান নয় অবশ্য। মেনি বা মেনিবেড়াল। সত্যি নীলার চোখ দুটো বেড়ালের মত। বা বলা যায় দামী cat's eye বা বৈদূর্য্য মণির সঙ্গে তুলনীয় নীলার চোখ। শুধু চোখই নয়। নীলার চুল ও তাম্রাভ। মজার ব্যাপার হলো ঐ কটা চোখ আর কটা চুলের জন্য নীলার

এ্যাডমায়ার বেশী না শত্রু বেশী – সেটা হিসেব করে বলা মুশকিল । gorgeous, splendid, বেড়াল চোখো, ধলা বিলাই –

সবই সে শুনতে অভ্যস্ত । হালকা চেহারা, তামাটে ত্বক আর চুল, কটা চোখ নিয়ে ও যে কোন দেশের লোক সেটাই অনেকের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে যেত । ঠাকুরমাই প্রথম থেকে মেনি বলতো ওকে । আর বলতো .....

মেনি আমার পাহাড় দেশ থেকে এসেছে । ঐখান থেকে, যেখানে সবার চুল কটা আর চোখ কটা । কথাটা হয়তো নীলারও মনে গেঁথে গেছে । নীলা বেড়াতে ভালবাসে । ঝোঁক তার সমুদ্র আর পাহাড় দু-এরই উপর । কিন্তু নীলা জানে পাহাড়ের ওপর তার এক অজানা আকর্ষণ । দুর্দমনীয় টান । শিরায় শিরায় এই টান সে পাহাড় দেখলেই অনুভব করে । গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ছবি দেখেই সেই দুর্দমনীয় টান সে অনুভব করেছে । কিন্তু সে টান যেন অন্য সাধারণ একটা পাহাড় দেখেই যেমন হয়, তেমন নয় । তার চেয়েও বেশী, তার চেয়ে আরও তীব্র । কেন ? কে জানে । নীলার আশা কবে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন কে দুচোখ মেলে কাছ থেকে মন ভরে দেখবে ।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়নকে দুচোখ ভরে দেখার জন্য কতগুলি নির্দিষ্ট জায়গা বা ভিউয়িং এরিয়া সুন্দর করে ঘিরে দেওয়া আছে ভ্রমণার্থীদের জন্য । এদের বলা হয় ভিউয়িং পয়েন্ট । এরকম একটি পয়েন্ট – ''ইভাপাই'' পয়েন্টে ওরা যখন পৌঁছল তখন সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু শুধু ক্যানিয়নের দেওয়ালের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় মৃদু আলো ছড়িয়ে আটকে আছে ।

– তুমি নেমে পড় ক্যামেরা নিয়ে । আমি গাড়ীটা পার্ক করেই আসছি । সুনন্দর বলার অপেক্ষায় নেই নীলা । সে ততক্ষণে ক্যামেরা নিয়ে ছুট্টে একেবারে ভিউয়িং এরিয়ার রেলিং এর সামনে । গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন । সামনেই গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন । নীলার যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না – এত বিশাল – এত দিগন্ত বিস্তৃত – এত গম্ভীর –

এত নীরব একটি বিস্ময়ের অস্তিত্ব ওর চোখের সামনে – একদম কাছে, যেন ছোঁয়া যাবে এক্ষুনি ..... নীলার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল ।

– দেখছো ? কখন সুনন্দ এসে পাশে দাঁড়িয়েছে । এটা একটা প্লেটো । এটা সি লেভেল থেকে প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচু । সামনেই কিছুটা দূরেই যে ফাটলটা দেখছো সেটা আসলে একটা নদীখাত । কলোরাডো নদীর । এই নদীটিই লক্ষ বছর ধরে এই প্লেটোর পাথুরে বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে খইয়ে খইয়ে তৈরী করেছে এই ফাটলটি বা ক্যানিয়নটি । এই ফাটলের একদম তলায় কলোরাডো নদী –

দেখা যাচ্ছে না । অথচ একদিন আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার সামনে দিয়েই বয়ে যেত খরস্রোতা কলোরাডো । নীলা শোনে আর দেখে ।

ক্যানিয়নের ছোট খাটো টিলাগুলি বাতাসের বেগে ক্ষয়ে ক্ষয়ে আকার নিয়েছে এক প্রাসাদ নগরীর । সে প্রাসাদের গড়ন কোনটা ঠিক বুদ্ধ মন্দির, কোনটা ঠিক যেন পিরামিডের হুবহু প্রতিচ্ছবি, শীর্ষবিন্দু অবিকল । সূর্যের শেষবেলার রাঙ্গা আলো তার শরীরে । নীলা ভুলে যায় ক্যামেরা তাক করতে । ত্রিকোণাকৃতি বুদ্ধমন্দিরের গায়ের টকটকে গোলাপী রং ধীরে ধীরে ততক্ষণে ম্লান হয়ে আসছে । সূর্য ডুবে গেছে ওরা আসার আগেই । কিন্তু তাতে কোন ক্ষোভ নেই । যে চলে গেছে সে সবটুকু সুষমা আর লাবণ্য নিয়ে যায়নি । যেটুকু রেখে গেছে তাতেই নীলা আকণ্ঠ নিমজ্জিত । নীলা ভিউয়িং পয়েন্টের রেলিং ধরে অনেকটা ঝোঁকে সামনের দিকে । নীচে অনেক অনেক নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কলোরাডো । দেখা যায় না এখান থেকে । অন্য কিছু এরিয়াতে আবার তিনি দৃশ্যমান । তারপরে ফাটলটিও অদৃশ্য উঁচু নীচু পাথুরে টিলার ভিড়ে ।

নীচে বহু নীচে যেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কলোরাডো তার আশেপাশেই আছে একটা এবং নীচের একমাত্র হোটেল । ওপর থেকে যেসব যাত্রীরা বিভিন্ন পাকদন্ডী বা ট্রেইল দিয়ে ক্যানিয়নের তলদেশে যায় ওই কলোরাডোর পাড়ে, সেখানেই তারা রাতে বিশ্রাম করে । আবার ফেরে পরদিন ।

ইস্ যদি যেতে পারতাম ওখানে, ওই রকম পাকদন্ডী ধরে কিম্বা ঘোড়ায় চড়ে আরব বেদুইনের মতো –

– কি এত ভাবছো ? সুনন্দ ওর কাঁধ ছোঁয় আলতো করে । সুনন্দ জানে নীলার কল্পনা প্রবণ মন হয়তো এতক্ষণে কলোরাডোর স্রোতের উজানে ঠেলে কয়েক মিলিয়ন বছর পিছিয়ে গেছে ।

– তুমি একটু থাকো এখানে মেনি । আমি চট্ করে

গাড়ীটাকে কাছেই কোথাও পার্ক করে আসছি । আজ থাকবো এখানে মাঝরাত অবধি । হেসে সুনন্দ পেছন ফেরে । ভিউয়ার পয়েন্টে সবার চোখের সামনে ধীরে ধীরে সূর্য ডুবে যায় পশ্চিমে । দর্শকেরা ফিরে যায় প্রায় সবাই । কেউ বসে থাকে কাঠের বেঞ্চের ওপর । ভিউয়িং এরিয়া ফাঁকা হয়ে যায় । নীলাও বসে থাকে একা —

অদ্ভুত এক অনুভূতি নিয়ে । কিসের এ অনুভূতি নীলা বোঝে না । হয়তো বিরাটের সম্মুখে ক্ষুদ্রতার, তুচ্ছতার যে অনুভবটা ধীরে ধীরে গ্রাস করে নীলাকে ।

চারদিকে আশ্চর্য নীরবতা । শুধু সোঁ সোঁ একটানা আওয়াজ পাইনবনের ভেতর দিয়ে হাওয়া বয়ে যাবার । কিছু দর্শক যারা এখনও বসে আছে নীলার মত তারাও চুপচাপ । নীলা লক্ষ্য করেছে এ পর্যন্ত কেউ এখানে কথা বলেনি জোরে । প্রকৃতির নীরব উপস্থিতি, বিশেষ করে ক্যানিয়নের এই বিশালত্বের, এই ব্যাপ্তির এত প্রচন্ড ব্যক্তিত্ব যে সেই নীরবতা ভেঙ্গে কথা বলতে দর্শক মাত্রেরই সঙ্কোচ হয় । নীরবতাই এখানকার একচ্ছত্র অধিপতি । সঙ্গিনী তার এই আদিগন্ত বিস্তৃতি ।

হঠাৎ নীলা দেখতে পায় যেন সমুখের অন্ধকার সমুদ্রের অতল তলে এক টুকরো আলো চমকে উঠেই নিভে গেল । হয়তো ওটা সেই কলোরাডোর ধারের একমাত্র হোটেলটির আলো । হয়ত এখন সারাদিনের পথশ্রমে ক্লান্ত হাইকাররা হোটেলের ভেতরে আগুনের সামনে বসে হাত পা সেঁকে নিচ্ছে । হোটেলের বাগানে ঝলসানো হচ্ছে মাংসের টুকরো । হাইকাররা চুমুক দিচ্ছে রঙ্গীন পানীয়তে ।

নীলা শুনেছে হোটেলটির নাম নাকি ''ইন্ডিয়ান গার্ডেন'' । এই ইন্ডিয়ান কারা ? আমেরিকান ইন্ডিয়ান বা মেক্সিকান নিশ্চয়ই ।

মেক্সিকানরা তো অনেকটাই ভারতীয়দের মত দেখতে । এরিকা টেরেস এর কথা মনে হোল নীলার —

ইস্তাম্বুলের এক কনফারেন্সে আলাপ হওয়া মেক্সিকান মেয়ে । কিন্তু দেখতে একটি বাঙালী মেয়ের মত । হয়তো এরিকার মত কোন সুন্দরী সেখানে এখন গান গাইছে । হাতে তারও রঙ্গীন পানীয় ।

পানীয়র কথা মনে হতেই নীলার যেন তেষ্টা পায় সহসা । একটু জল পেলে ভালো হোতো । কিন্তু কোথায় জল ? আকাশে পঞ্চমীর চাঁদ । অন্ধকার খানিকটা তরল হয়েছে মনে হচ্ছে । চারিদিকে জমাট পাইন আর জুনিপারের জঙ্গল । জঙ্গলের তলায় হাঁটু সমান বুনো ঘাস । অদ্ভুত একটা মিষ্টি অথচ বুনো গন্ধ আসছে কোথা থেকে যেন । মিষ্টি গন্ধটা কিসের ? ল্যাভেন্ডারের না পাইনের ? শোনা যায় এখানকার একধরনের পাইনের ছাল থেকে হালকা একটা মিষ্টি গন্ধ বেরোয় । গন্ধটা বেশ অবশ করা । চারিদিকে কেউ নেই নীলা একা । শুধু পাইনের পাতার ঝুলে থাকা ঝালরগুলি বাতাসে ধীরে ধীরে দুলছে । যেন কোন কিশোরীর ঝাপানো চুল । একটা শিরশিরে অনুভূতি নীলার শিরদাঁড়া বেয়ে উঠতে থাকে ।

নীলা উঠে দাঁড়ায় । একটা আওয়াজ আসছে কোথা থেকে যেন . . . . . কল্ কল্ কল্ কল্ করে . . . . . যেন জল পড়ছে দূরে কোথাও . . . . . যেন বয়ে যাচ্ছে জল জোরে জোরে । তবে কি কলোরাডোর বয়ে যাবার শব্দ এত ওপর থেকেও শোনা যায় ? তবে কি গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের সেই কুখ্যাত খরস্রোতা অংশটি যার নাম ''Hance Rapid'' সেটি আশে পাশে কোথাও ? নীলা ভূতগ্রস্তের মতো চলতে শুরু করে । সরু পাথুরে নুড়ি ভরা রাস্তা . . . . . কখনো চড়াই, কখনো উৎরাই ধরে নীলা চলে । ছোট ছোট ঝাঁকড়া জুনিপারের অন্ধকার ছায়া । সেই ছায়ার তলায় আচমকা কেউ নীলার গালে মাথায় হাত বুলিয়ে যায় . . . . . নীলা ভয়ে চমকে ওঠে । অনুভব করে তৃষ্ণায় ওর সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে ।

— জল খাবে ? জল কিন্তু আমাদের ''কিভা'' তে আছে । ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে মিষ্টি গলায় কেউ বলে ওঠে । নীলা চমকে পেছন ফেরে । দেখে একটি কিশোরী দাঁড়িয়ে । চেহারা দেখে আমেরিকান ইন্ডিয়ান না স্প্যানিশ তা বোঝা যায় না । পরনে একটি বাদামী লোমের টিউনিক, কপালে একটি সাদা রিবন ঘুরিয়ে পেছন দিকে বাঁধা ।

— হুই অইদিকে . . . . . মেয়েটি নীলার পেছন দিকে একটা ঝোপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে । ওখানে চলো মা তোমাকে জল দেবে । মিসেস বেরীও তোমাকে বসতে দেবে আগুনের সামনে ।

— ওখানে কি আছে ? নীলা কোন রকমে জিজ্ঞেস করে ।

— ওখানে আমাদের বাড়ী মানে মিঃ বেরীর বাড়ী আছে ।

— চলো যাই । নীলা এগিয়ে যায় মেয়েটির দিকে । তেষ্টায় ততক্ষণে তার সব অনুভূতি অবশ হয়ে আসছে । নীলার আগে আগে মেয়েটি হাঁটে । কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা একটি বড় ঢিবির আড়ালে চলে যায় । আড়ালটি শেষ হতেই চোখে পড়ে একটি বড় অদ্ভূত গোল ধরনের বাড়ী । সম্পূর্ণ গোল, কাঠের । জানলা দরজা নেই . . . . . ছাদে একটি মইয়ের একটা দিক দেখা যাচ্ছে . . . . . মনে হচ্ছে বাকিটা ছাদ দিয়ে ঘরের ভেতর নামানো । ওটাই ঘরে ঢোকার দরজা মনে হচ্ছে । ঘরের সামনে প্রশস্ত উঠোন . . . . . তার মাঝখানে আগুন জ্বলছে । একটি মধ্যবয়স্কা নারী পাথরের একটি পাত্রে আর একটি পাথর দিয়ে, যেন হামান দিস্তা আমাদের . . . . . কিসব গুঁড়ো করছে । তার সামনে বড় বড় নানা আকারের গামলা জাতীয় কাঠের পাত্র । তার মধ্যে বিভিন্ন রংয়ের বিভিন্ন আকারের শস্য জাতীয় জিনিস । আগুনের মাঝখানে ঝলসানো হচ্ছে আস্ত বুনো কাঠবেড়ালী — শিকে গাঁথা । পর পর অনেকগুলো . . . . . রাতের খাবারের আয়োজন ।

নীলা গিয়ে দাঁড়াতেই কিশোরীটি উঠোনের এককোণে রাখা চামড়ার থলে থেকে জল ঢালে একটি কাঠের বাটিতে । তারপর নীলার দিকে এগিয়ে দেয় ।

মধ্যবয়স্কা নারীটি ততক্ষণে নীলার দিকে ফিরেছে । ফিরেই কি রকম উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে ছুটে আসে নীলার কাছে ।

— তু-ই-ই ই . . . . . এতদিন কোথায় ছিলি . . . . . কোথায় ছিলি . . . . . বলতে বলতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নীলাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে । মুখ ঘসতে থাকে পাগলের মত নীলার গালে, কাঁধে, গলায় . . . . . সঙ্গে চলে আর্তস্বরে বিলাপ ।

— তোকে আমি কত খুঁজেছি, কত খুঁজেছি পাহাড়ে নদীতে ঝোপে . . . . . তুই সেই যে নদীতে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে গেলি, তারপর, তারপর তো আর ফিরে এলি না . . . . . কোথায় গেছিলি তুই ? কোথায় গেছিলি আমার সব খালি করে . . . . .

পরিস্থিতির আকস্মিকতায় নীলা হতভম্ব । কি করবে ভেবে পায় না । এদিকে দম বন্ধ হয়ে আসছে এই বুকভাঙ্গা স্নেহের অসহ্য পীড়নে । বুঝতে পারছে এক মা তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে . . . . . অদম্য বাঁধভাঙ্গা তার উচ্ছ্বাস . . . . . সে উচ্ছ্বাসের আলিঙ্গন ফাঁসের মতো নীলার গলায় বসে যাচ্ছে . . . . .

— ছাড়ো, ছাড়ো আমায় । আমি এখনি চলে যাবো । আমি তোমায় চিনি না । আমি তোমার কেউ নই । প্লীজ্ ছাড়ো . . . . . আমার স্বামী আমাকে খুঁজবে . . . . . ছাড়ো . . . . . নীলা কোনরকমে বলতে পারে ।

— এখুনি আমি খুঁজে আনছি্ তোমার হাজব্যান্ডকে । বলে কিশোরীটি দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে যায় ।

— কি বললি ? কি বললি আমি তোর কেউ নই ? ওরে তোকে না পেয়ে আমি যে পাহাড় থেকে নীচে ঝাঁপিয়েছিলাম . . . . .

কন্যাহারা মায়ের আর্তবিলাপে বাতাস ভারী হয়ে যায় । কত যত্ন করে আমি তোকে বড়টি করেছিলাম . . . .

— এই তো মাদাম এখানে জল খেতে এসেছিল . . . . . নীলা চমকে উঠে তাকায় কিশোরীর গলার আওয়াজ শুনে । ততক্ষণে সে লতাপাতার কঠিন ফাঁস থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে । পা পিছলে পড়ে পুরো একটা বুনো গাছের মধ্যে আটকে গেছিল সে । সুনন্দর টর্চের আলো ততক্ষণে নীলার ওপর ।

— এখানে ? এখানে কি করছো তুমি ? সুনন্দ বিস্ময়ের শেষ সীমায় । আমি এতক্ষণ ধরে খুঁজছি তোমায় . . . . .

— হ্যাঁ জল খেতে এসেছিলাম । নীলা অস্ফুটে বলতে যায় . . . . . ।

— এখানে জল ? কোথায় ? কে বললো এখানে জল আছে ?

নীলা চারদিকে তাকায় । কোথায় কিশোরীটি আর তার মা . . . . . ঝলসানো কাঠবেড়ালী আর আগুন . . . . . কি সব দেখছিল ও ? একটা বিস্ময় আর আতঙ্কের অনুভব এতক্ষণ পরে নীলাকে গ্রাস করতে থাকে ।

— তোমায় খুঁজতে গিয়ে একটা সাপের ওপর প্রায় পড়েছিলাম আর কি । একটা মেয়ে অ্যামেরিক্যান ইন্ডিয়ান মনে হল . . . . . ছোট . . . . . পেছন থেকে চিৎকার করে আমায় থামায় । নাহলে কি যে হত আজ কে জানে । ওইতো আমায় এখানে নিয়ে এল বলেছিলাম না বসে থাকো কিছুক্ষণ . . . . .

— ওঃ তুমিও দেখেছো ? সবিস্ময়ে নীলা প্রায় চিৎকার করে ওঠে সুনন্দর কথা শেষ হবার আগেই।

— কি দেখেছি ?

— ওই ছোট মেয়েটাকে ? ওই ইন্ডিয়ান মেয়েটিকে ? ওই তো আমায় বলেছিল যে তোমাকে খুঁজে আনতে যাচ্ছে . . . . . একটু আগে ওর মাও ছিল . . . . . মেয়েটি আমাকে জল দিল . . . . . নীলা ঝড়ের গতিতে বলতে চায় সব একসঙ্গে। ও যে সত্যি নিজের চোখেই সব দেখেছে এটা প্রমাণ করার জন্য ও মরিয়া।

কিন্তু হঠাৎ নীলা থেমে যায়। ওর জিবটাতো এখনও শুকনো। তেষ্টাও তো কই একটুও মেটেনি নীলার। কিন্তু ওতো জল খেল, তবে কি ও সত্যি সত্যি জল খেয়েছিল ?

সুনন্দ আর নীলা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। হাইওয়ে দিয়ে তীব্র গতিতে একটা গাড়ী চলে যায়। স্তব্ধতা ভেঙ্গে সুনন্দ বলে, চলো যাই। গাড়ীটা সামনেই পার্ক করেছি।

হঠাৎ শোনা যায় :

— হু ইজ দেয়ার ? আর একটা টর্চের আলো এসে পড়ে ওদের মুখে।

— আপনারা কে ? এতরাতে কোনো ট্যুরিষ্ট তো এখানে থাকে না ? আপনারা ঠিক আছেন তো ? সিকিউরিটির ভদ্রলোকটি খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

— কেন কি হয়েছে এখানে ? কোন প্রবলেম ? সুনন্দ জিজ্ঞাসা করে।

— হ্যাঁ মানে নানা রকম গুজব আছে তো এই জায়গাটা নিয়ে মানে ঠিক যে জায়গাটায় আমরা এখন রয়েছি এই জায়গাটা নিয়ে আর কি। তাই জিজ্ঞেস করছি।

— কি গুজব ? কি রকম ? এই জায়গাটার কি হয়েছে ?

নীলার এতগুলো ব্যগ্র ব্যাকুল প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক চোখ নামায় মাটিতে। একটু ইতস্তত করে। যেন বলবে কি বলবে না এ ব্যাপারে ঠিক মনস্থির করতে পারছে না। মূহুর্তমাত্র। তারপরেই ভদ্রলোক গলা পরিষ্কার করেন। মাথা তুলে শান্ত ভাবে বলেন,

— লোকে এখানে একটি মহিলাকে দেখতে পায় মাঝে মাঝে। মধ্যবয়সী এবং একটি ছোট মেয়েকেও মাঝে মাঝে . . . . .

— কে সে ? কারা তারা ? এবার সুনন্দ সজাগ।

— প্রায় দেড়শো বছর আগে এখানে একটা হোটেল ছিল। মিঃ বেরীর। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের সর্বপ্রথম হোটেল। গ্র্যান্ডভিউ হোটেল। সেই হোটেলটা এই ভিউ পয়েন্টেরই, মানে এই আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে তার আশেপাশে কোথাও ছিল। সে হোটেলে একটি মেয়ে নাচতো। মেয়েটি পোবলান উপজাতীয়। খুব সুন্দরী . . . . . সবুজ চোখ, চুল আর গায়ের রং তামাটে। তাকেই নাকি লোকে দেখতে পায় এখানে।

— কেন আসে এখানটায় ? কি চায় ? নীলা অস্ফুটে জানতে চায়।

— সে নাকি তার মেয়েকে খুঁজে বেড়ায়। তার ১২ বছরের মেয়েটিকে। সে হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হয়ে যায়। সে ছিল খুব সুন্দরী মায়ের মতই। তাকে খুঁজতে গিয়েই পাহাড় থেকে পড়ে মায়ের মৃত্যু হয়। কিন্তু গভীর রাতে তাকে নাকি দেখা যায় মাঝে মাঝে। মহিলার ছোট মেয়েটিকেও মাঝে মাঝে এখানে ওখানে লোকে দেখেছে অনেক রাতে।

তাই বলছিলাম আপনারা এখানে কি করছেন। আশা করি আপনারা কিছু দেখেন নি। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকান। সুনন্দ নীলার মুহূর্তের জন্য একবার চোখাচোখি হয়ে যায়।

— না না আমাদের কিছু চোখে পড়েনি। কিচ্ছু না। চলো সুনন্দ। হ্যাঁ আমরা এখন ফিরি। অনেক রাত হল। বাই। সিকিউরিটির দিকে তাকিয়ে নীলা হাত নেড়ে চলতে শুরু করে।

''যখন কলম ধরি তখন কলম যেন অন্য কেউ ধরে — কে সে ? ভাবি আমি। এর ভাবনা এর ভাষা আমার কাছে কিছু জানা — কিছু ধোঁয়াশায় মোড়া। নিত্যদিন যারা আমার পাশে একদা ঘুরে বেড়িয়েছে, যারা এখনও বিদ্যমান সশরীরে তারা যেন অন্য চেহারা নিয়ে অন্য রঙে অন্য ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। সে কথার তোড়ে ভেসে যাই আমি। তারা হয়ে ওঠে জীবন্ত। হেরি তাদের অন্য রূপে। তাদের এই রূপ প্রথম বর্ষার জল পেয়ে বেড়ে ওঠা কলমি লতার মত হয়ে যায় আমারই অজান্তে। লোকে বলে আমি আমার নিজের জীবনের গল্প বলি। কিন্তু কি করে বোঝাই আমি এই অন্তরালবাসীদের অস্তিত্বের কথা ? যারা আমার কাছ থেকে কিছু কাদা মাটি নিয়ে তার ওপর আরোপ করছে নিজেদের 'হোতে যা চেয়েছিলাম' এর গল্প। তারাই গল্প বলে আমি শুধু শুনি।''

— গল্প —

তারিণী মামা

নন্দিতা রায়

আমাদের ছোট্ট সংসারে ধরাবাঁধা জীবনযাত্রার মধ্যে তারিণী মামার আগমন সত্যি একটা আলোড়ন এনেছে। ঠিক পুকুরের মাঝখানে একটা ঢিল পড়ার মত। চারিদিকে তরঙ্গ। ব্যাপারটা একটু খুলে বলি।

তারিণী মামার আসল নাম তারিণী নয়, বিশ্বজিৎ। কিন্তু কেমন করে তা তারিণী হল সেটা বিচার্য। মার কাছে শুনেছি পাড়ার লোকের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা থাকায় তারাই ঐ নাম দিয়েছে। তবে মামা আমার শুধুই যে পরোপকারী তাই নয়, চেহারাটাও খুব সুন্দর। তার ওপর দাদামশাইয়ের সঞ্চিত অর্থ হাতে থাকায় সাজগোজও বেশ উঁচুদরের।

সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে রান্নাঘর থেকে সুস্বাদু রান্নার গন্ধ আর তার সাথে মায়ের গাওয়া গান একসাথে নাকে আর কানে স্বাদ সুরের গুঞ্জন তুলল। বুঝলাম, আজ বাড়িতে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। বাবাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম আমার ছোটমামা, যার নাম তারিণী, তিনি আসছেন এবং বেশ কিছুদিন থাকবেন। জেনে ভারী ভালো লাগল।

সন্ধ্যাবেলায় নিজে ড্রাইভ করে মামা এলেন। নতুন ঝকঝকে গাড়ি, দামী পোষাক — বেশ মনোরম আবহাওয়া। পরদিন সকালবেলায় চা খেতে খেতে মামা বাবাকে বললেন পাশের পাড়ায় কে একজন প্রফুল্লবাবু আছেন যিনি একটা বড় কোম্পানী চালান। তাঁকে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারও বলা যায়। তাঁর রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে একটা বড় রকমের এক্সপ্যানসন হবে। একটা এনট্রিলেভেলের চাকরি শিগ্‌গীরই খালি হবে। দরখাস্ত দিয়ে কোন ফল হয়নি। বাবা বললেন, 'ও রকম দরখাস্ত ওদের মত অফিসে রোজ একশোটা করে আসে। ওতে কোন ফল হবেনা। দরকার একটা পার্সনাল টাচের।' আমার স্কুলে যাবার সময় হল, তাই মামার কথা আর শোনা হলনা। এরপর থেকে প্রতিটি দিনই উৎসবের মত মনে হল। মামা নানারকমের জোক জানেন। হাসাতেও পারেন খুব। কাজেই দিনগুলো খুব আনন্দেই কাটতে লাগল।

সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে একটু ফুলুরি খেতে ইচ্ছে করছিল, তাই বাজারের মধ্যে দিয়ে ফুলুরির ঠোঙা হাতে নিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ দেখি লুঙি আর আধময়লা গেঞ্জি পরে একজন আসছে তার হাতে বাজারের থলে। আরে, ইনি তো ছোটমামা দেখছি। পেছন পেছন দূরত্ব রেখে চলতে লাগলাম। দেখি থলে থেকে ঝুলছে গলদা চিংড়ির বড় বড় পা। পাশ থেকে একটা বড় রুইমাছের মাথাও দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া নানা রকমের শব্জিও আছে। আশ্চর্য, যে মানুষ দামী জামাকাপড় ছাড়া পরেননা তার এই সাজ ! মামা আমাদের পাড়া ছাড়িয়ে পাশের রাস্তায় ঢুকলেন। একটা প্রকাণ্ড গেটওয়ালা বাড়ির ভেতর মামা ঢুকে গেলেন। বাড়ি ফিরে মাকে একথা বলাতে মাও অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, আমারও দেখার ভুল হতে পারে।

মাস দুই পরে, হঠাৎ একদিন বাড়ি ফিরে বিরিয়ানি আর চপ কাটলেটের গন্ধ পেলাম। খাবারঘরে ঢুকে দেখি মামা বসে, পাশে তিনটে গিফটের প্যাকেট আর টেবিলের ওপর রাশিকৃত খাবার। অবাক হয়ে ভাবছি কি বলব তখন মা রহস্যটা খুলে বললেন। তারিণীমামার প্রফুল্লবাবুর কোম্পানীতে চাকরিটা হয়েছে। পার্সনাল টাচের কোন উপায় না দেখে মামা বুদ্ধি করে প্রফুল্লবাবুর বাড়িতে চাকরের কাজ নিয়েছিলেন। ভালো ভালো খাবার খেয়ে একদিন ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আজকাল বাজার করে ?' স্ত্রী উত্তর দিলেন, 'নতুন চাকর রেখেছি, খুব স্মার্ট। আগের চাকরকে যে টাকা দিতাম একেও তাই দিই কিন্তু দেখ এ কত ভালো ভালো মাছ তরকারি এনে দেয়।' প্রফুল্লবাবু বললেন, 'ওকে ডাক।' তারিণীমামা ছেঁড়া লুঙ্গিটাকে একটু বেশি করে দেখিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রফুল্লবাবু, 'আর কি জান ? লেখা পড়া কিছু করেছ ?' মামা বললেন, 'হ্যাঁ সার, আমি দলাই মলাই করতে জানি। ঘাড়ের ব্যথায় মালিশ করতে পারি। এম্ এস্‌সি পাশ করেছি, তবে কোন কাজ পাইনি। যা দিনকাল পড়েছে।' 'দেখছি তুমি ভদ্রঘরের ছেলে — আহা, কী বিপদেই না পড়েছ। দেখি, কি করতে পারি। ইতিমধ্যে তুমি আমার

ঘাড়ের ব্যথাটায় একটু ম্যাসাজ করে দিও ।' পার্সনালটাচে ইনটিম্যাসি আর তার ফলে এই চাকরি ।

মামাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'অত কম টাকায় অত ভালো ভালো জিনিষ তুমি কিনলে কী করে ?' মামা, 'আরে তাই কি হয় ? নিজের পকেট থেকে কিছু দাদন দিলাম । দাদন কি বুঝলি তো ? ওটা হল কিছু অগ্রিম দান । ইনভেস্টমেন্টও বলতে পারিস ।' মামা একটা গিফটের প্যাকেট আমার হাতে দিলেন । খুলে দেখি একটা চমৎকার হ্যান্ডব্যাগ । ঠিক করলাম কালই ওটা নিয়ে স্কুলে যাব ।

স্কুলে আমার প্রিয় বান্ধবী সলিলাকে বললাম, 'দেখ, মামা আমাকে এই হ্যান্ডব্যাগটা দিয়েছেন । কী সুন্দর তাই না ?' সলিলা শুনে খানিকক্ষণ চোখ নামিয়ে রাখল । তারপর সেখান থেকে টপটপ করে জল পড়তে লাগল । আমি তো অবাক । বললাম, 'আরে তুই কাঁদছিস কেন ?' অনেক সাধ্য সাধনার পর জানলাম সলিলার মামা নেই । সলিলা বলল, 'সকলের মামা আছে আমার কোন মামা নেই । এ যে কী দুঃখ ।' বাবাকে বললাম সলিলার দুঃখের কথা । বাবা, মা দুজনেই হাসলেন । মা বললেন, 'মামা তো কিনতে পাওয়া যায়না নাহলে তুই না হয় তাই কিনে দিতিস ।' বাবা কিন্তু একটা সমাধান বের করে বললেন, 'তারিণীকে জিজ্ঞেস কর ও রাজি আছে কিনা । সলিলা তাহলে ওকে অ্যাডপ্ট্ করুক । তোরা মামাকে ভাগ করে নে ।'

পরের দিন সলিলাকে বললাম বাবার কথা । ও শুনে খুসি হয়ে উঠল তারপরেই আবার গম্ভীর হয়ে গেল । জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হল ?' ও বলল, 'তোর মামা রাজি হবেননা । তুই তোর মামাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নে আর আমি আমার বাবা, মাকে গিয়ে বলি । দেখি তাঁরা রাজি আছেন কিনা ।' মামা বরাবরের পরোপকারী তাই রাজি হয়ে গেলেন । সলিলার বাবা, মা বললেন, 'জানাশোনা পরিবারের ছেলে । ঠিক আছে । মেয়ে যাতে খুসি থাকে তাই হোক ।'

ডবল মামাগিরির উদ্বোধনে মামা তিনটে সিনেমার টিকিট কেটে আনলেন । আমরা দুই ভাগ্নী আর মামা নিজে । হলে মামা সলিলার পাশেই বসলেন । আমার একটু হিংসে হল । তা যাইহোক সলিলার জন্যেই তো সিনেমায় আসা তাই মেনে নিলাম । ইতিমধ্যে মামা মার কাছে চা আর কফি বানানো শিখতে লাগলেন । বললেন অফিসের সহকর্মীদের একটু এনটারটেইন করবেন । মাঝেমাঝে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বই থেকে কি সব দেখতে লাগলেন । একদিন কাজের লোকটাকে চা বানিয়ে খাওয়ালেন । কী আশ্চর্য, লোকটা একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়ল । ডাকাডাকিতে জেগে উঠে বলল তার দোষ নাই । চায়ে ফোলা ছিল তাই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল । মা মামাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'চায়ে ফোলা গেল কি করে ?' মামা উত্তর দিলেন, 'রাত্তিরে ঘুম হয় না তাই এর ওপর একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম । একটু পাসিফ্লোরা মিশিয়ে চা খেলে যদি ঘুম আসে ।' আমরা মামার বানানো চা খেলাম তবে ফোলা ছাড়া । খুবই ভালো স্বাদ ।

আমার ফাইন্যাল পরীক্ষার আর বেশি দেরি নাই । তাই টিউটোরিয়াল আর রাতজেগে পড়ার চক্রে পড়ে সংসারের আর কোন খবরই রাখতে পারলাম না । পরীক্ষার শেষদিনে বন্ধুদের সাথে লেকের ধারে বেড়িয়ে এসে বাড়িতে ঢুকতেই আবার সেই সুখাদ্যের সুগন্ধ ! দেখলাম মামা মার জন্যে একটা শাড়ি, আমার আর সলিলার জন্যে দুটো প্যাকেট টেবিলে সাজিয়ে রেখেছেন । শুনলাম মামার উন্নতি হয়েছে । এত তাড়াতাড়ি উন্নতি হওয়াতে একটু আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না । কিন্তু কী করা যাবে ! মামার বসকে প্রফুল্লবাবু তিন থেকে চারবার অফিসের টেবিলে মাথা রেখে ঘুমাতে দেখেছেন । ফলে, ভদ্রলোকের ট্রান্সফার হয়েছে এবং মামা তাঁর জায়গায় বসেছেন । আমার হঠাৎ মনে হল এর মধ্যে চায়ে ফোলার কোন অবদান নেই তো ? সলিলাকে ডেকে এনে দুজনে প্যাকেট খুললাম । আমার জন্যে একটা সোয়েটার আর সলিলার জন্যে একটা দামী সেন্ট । আমার একটু ঈর্ষার উদ্রেক হল । যাইহোক, মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখলাম ।

পরীক্ষায় পাশ করে আমি আর সলিলা দুই ভিন্ন কলেজে ভর্তি হলাম । মামা আমাদের রেষ্টুরেন্টে খাওয়াতে নিয়ে গেলেন । এরপর আমি বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়লাম । হস্টেলে থেকে পড়ি । উইকএন্ডে বাড়ি আসি তাই বন্ধুদের সাথে আর দেখা হয় না । শুনি মামা মাঝেমাঝে সলিলাদের বাড়ি যান । ও বাড়ি থেকেই কলেজে যায় তাই ।

পরীক্ষার শেষে বাড়ি এসেছি । এবার অখন্ড অবসর । কিন্তু মামার আর পাত্তা পাওয়া যায় না । সন্ধ্যেবেলায় খাওয়ার সময়ে আসেন আর কোনমতে খেয়েই চলে যান ।

বলেন যে অফিসে ভীষণ কাজ। ওঁর বস বুড়ো মানুষ, তাই মামা তাঁকে তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে নিজে অনেকক্ষণ অফিসে থাকেন। যাক, এইভাবে কাজ করে ওপর ওয়ালার নজরে পড়লে উন্নতি অনিবার্য ! হলও তাই। এক্সপ্যানসনের সময়ে বড়কর্তা বললেন, 'ইয়ং আর এনারজেটিক লোককে ম্যানেজমেন্টে নেওয়া হোক।' ফলে, বয়স্ক ওপরওয়ালাকে টপ্‌কে মামার প্রমোশন হল।

এবার কলেজের পড়া শেষ হল, ইউনিভার্সিটিতে যাব। হঠাৎ মার এস্ ও এস্ — এক্ষুনি বাড়ি চলে এস। শুনলাম মামা বিয়ে করেছেন। বিরাট সারপ্রাইজ। তাই সবাইমিলে একটা সারপ্রাইজ পার্টি দেওয়া হচ্ছে। মামীকে দেখতে পেলাম না। একপ্লেট খাবার নিয়ে বসে খাচ্ছি এমন সময়ে একজন ঘোমটা পরা মহিলা পাশ দিয়ে চলে গেলেন। মনে হল যেন আমার কাঁধে একটা ঠেলা দিয়ে গেলেন। নিশ্চয়ই চেনা কেউ হবে তাই উঠে ভদ্রমহিলার পিছু নিলাম। হাওয়ায় মাথার ঘোমটা একটু সরে গেল। মনে হল যেন একে চিনি। এবার ঘুরে মুখোমুখি দাঁড়ালাম। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাতেই প্রবল হাসিতে ফেটে পড়লাম। আরে, এ যে সলিলা !

মামাকে জেরা করলাম, 'হঠাৎ ওকে বিয়ে করলে কেন ?' মামা বললেন, 'হঠাৎ কোথায় ? এ তো গ্র্যাজুয়াল ! বলি, সিনেমার টিকিট, রেষ্টুরেন্টে খাওয়ানো, প্যাকেটে প্যাকেটে জিনিষ দেওয়া সে কি ওমনি, ওমনি ? এ দাদন, বুঝলি ?'

— গল্প —

অবস্থান

চুমকি চ্যাটার্জী

অফিস থেকে ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরছে অরুময়। আজই শেষ এই রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া। ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে। প্রকৃতিও কী কষ্ট পাচ্ছে অরুময়ের এই চরম সংকটে ? অদ্ভুত হাসি খেলে যায় অরুময়ের ঠোঁটে। বয়েই গেছে প্রকৃতির ওর দুঃখে মাতাল হতে।

একটা নামজাদা নিউজ চ্যানেলে ব্যুরো চিফ হিসেবে দু'বছরের কাছাকাছি কাজ করছে অরুময়। তার আগে এদিক ওদিক দুচারটে নিউজ পেপার বা নিউজ চ্যানেলে কাজ করলেও এমন কলার-তোলা চাকরি এটাই। পজিশন, মাইনে সবই বেশ ঈর্ষনীয়। আর তাতেই অরুময় বিয়ে করবে রাজি হয়ে যায়। বৌ-এর কাছে নিজের মান সম্মান, ঠাঁট বাট বজায় রাখতে হবে তো !

করবীকে মা আর বোনই দেখে পছন্দ করেছে প্রথমে। অরুময়ের অত সুন্দরী বাতিক নেই। মানিয়ে গুনিয়ে থাকতে পারলেই হল। মেলামেশা হয়েছে এই মাস ছয়েকের মধ্যে। একটা নামজাদা নিউজ চ্যানেলের ব্যুরো চিফের বৌ হতে চলেছে বলে করবীর মধ্যেও কোথাও একটা অহংকার কাজ করতে শুরু করেছে। আশেপাশের সবাই বলছে, 'বেড়ে জামাই পাচ্ছ কিন্তু'।

বিয়ের আর দুমাস দশদিন বাকি। আজ অফিস ছুটির আগে চ্যানেলের অন্যতম মালিক রজতাভ সেন ডেকে পাঠিয়েছিল অরুময়কে। চ্যানেল লোকসানে চলছে কেন তার হাজার কাহিনী শুনিয়ে হাতে একটা সাদা খাম ধরিয়ে 'সরি' বলে শেষ করেছিল।

কিছুই না বুঝে বাইরে এসে খাম খুলে চিঠিটা পড়ে অরুময় বুঝল কাল থেকে ওর চাকরীটা আর নেই। ও ছাঁটাই হয়ে গেছে।

প্রায় সাতশট্টি জনের ছাঁটাই হয়েছে কানে এল। কেমন যেন ঘোর ঘোর লাগছিল অরুময়ের। মনে হচ্ছিল অঘটনটা ওর জীবনে নয়, অন্য কারোর জীবনে ঘটেছে। কোনমতে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরেছে ও। করবী আর বোনটি দাঁড়িয়ে থাকবে জুয়েলারী শপে। ফুলশয্যার রাতে যে হিরের আংটি অরুময় দেবে করবীকে, সেটা আজ কেনার কথা।

— গল্প —

জোড়া হেলিক্সের সিঁড়ি

রুমী ভট্টাচার্য্য

কোনো অবুঝ বেড়ালিনী পাড়া বেড়াতে বেড়াতে কারো লনের ড্যান্ডিলায়ন খেয়েছে কিনা — এইটুকু গল্পই পাওয়ার আশা । তারজন্য এপাড়ার আইবুড়ি ন্যানসি বা বেকার নরম্যান কত ব্যর্থ দুপুরই না কাটায় । কারণ গ্রামের সমনামী পাড়ার আসল কোনো গল্প থাকে না । বা থাকেও ।

ভিলেজ অফ গ্রীনভিউতে সেই রকমই একটা দুপুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যর্থ হচ্ছিল । কিন্তু হঠাৎ শেষ বিকেলের দিকে Tumbleweed-এর মতন কিছু শোরগোল উড়ে এল । যারা জানলার তাকে বেড়াল বসিয়ে রাখে, নিজেরা দূরে বসে নিস্পৃহতার ভান করে, আজ তাদের নাক আর ঠোঁটের বাষ্পে আবছা হয়ে আসতে লাগল জানালার শার্সি । অনূঢ়া দুটি সিঁথির মতন পায়ের রাস্তা গোল হয়ে মিলেছে যেখানে, সেই সিঁথির মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে এরিন । সঙ্গে আরো কিছু পড়শী ।

অবাধ্য হাওয়ার কাছে হেরে গেছে এরিনের তিসিগাছের আঁশের মত চুল । এমনটাই হচ্ছে আজকাল । সারাদিনের হাল্কা হাওয়াগুলো কখন যে পালিয়ে যায় অন্য কোথাও । সন্ধ্যার মুখে লেক মিশিগান ছুঁয়ে গাঢ় বাতাস শিন্‌শিন্‌ করে ছুটে আসে এই শূন্য জায়গা জমি দখলের জন্য ।

এরিনের গোলাপী ঠোঁটে একটা মার্লবোরো ও অনেকগুলো অভিযোগ একসাথে জ্বলছে । ঢিলে ঢালা টি-শার্ট আর আকাশটা থেকে যতটা নীলরঙ ধার করা উচিৎ, তার থেকেও বেশী নীল দেখাচ্ছে তার চোখ দুটো । আমাকে ডেকে এনেছে এরিন । কেননা তার আটবছরের ছেলে জর্ডন আর আমার ছেলে একই সাথে খেলা করে । আমার জানা দরকার, গত সন্ধ্যা থেকে এপাড়ায় এক ছেলেধরা পা ছড়িয়ে বসে আছে ।

তালু মাঠের ধারে যে একটা বুড়ি কটন উড গাছ আছে, সারা বসন্তভর সে ছোট লাল লাল বীজ বিয়োতে থাকে । তারপর তার বীজের কাপাসে ছেয়ে যায় চরাচর । লোকের শ্বাসকষ্টের অভিযোগ প্রতিবারই ওঠে, আবার নেমে যায় । গতকাল সন্ধ্যের দিকে জর্ডনের বেসবলটা এক ছুট লাগালো সেই অন্ধকার গাছের নীচে । তখনই জর্ডন দেখেছে তাকে । একটা খুব কালো মানুষ আর খুব লাল তার চোখ । হয়তো মঙ্গলপ্রাণীর মত জ্বলছিল, না হলে জর্ডন ওই অন্ধকারে বুঝলো কি করে । ছেলেধরার চোখ বলে কথা । দৈত্যের মতন লোকটা তাকে বলটা কুড়িয়ে দিয়েছে ! আর ফেরত দেওয়ার সময় হাতটা বাড়িয়ে বলেছে কি একটা যেন ভাষা । শুনতে অনেকটা মনে হয় ‘ওয়া গুয়ান, মন’ ।

রোঁয়া ওঠা পিকাচুটাকে নিয়ে বিছানায় ভয় জ্বরে কেঁপেছে জর্ডন । মাকে তো কিছুই জানায়নি । অনেক রাতে দরজা ঠেলে বিউফোর্ড এসেছে । তার দাঁতের চাপে আরো বেশ কিছু রোঁয়া উঠেছে পিকাচুর । বিউফোর্ডের ঠান্ডা নাক আর তার গরম শ্বাস খুব কাছাকাছিই ছিল । প্যাঁচানো নরম লোমে কিছুটা নিরাপত্তা খুঁজেছিল জর্ডন । সাতবছরের জন্মদিনে মার কাছে Puppy চেয়েছিল সে । মা যখন জানতে চেয়েছিল আইরিশ ডুড্‌লই কেন, জর্ডন বোঝাতে পারেনি ঠিক কেন । হয়তো বিউফোর্ডের কোঁকড়ানো লোম আর তার চুল অনেকটা একই রকম বলে । কিন্তু ওই গাছের নীচে কেমন যেন অন্যরকম একটা চুল দেখেছে জর্ডন । এরকমও হয় ?

মা তো কোন সকালে বেরিয়ে যায় । মার ঘরে লিয়ন শুয়ে ছিল । লিয়ন অনেক রাতে ফেরে । দেরীতে ওঠে । বিকেলে মা ফিরলে ওরা একসাথে বারবিকিউ করে । সে আঠারো চাকার ট্রাক চালাতে পারে । তার প্রতিটা বলই বাস্কেটে । জর্ডন চাইলে সে মাইন্ডক্রাফট-এর সব সামগ্রী তাকে কিনে দিতে প্রস্তুত । কিন্তু তবুও জর্ডন লিয়নকে কিছু জানালো না । সারাটা দিন সোফাটার মধ্যে ধনুক হয়ে শুয়ে থাকলো । এরিন ফিরলে আর সে থাকতে পারলো না । নাইন ওয়ান ওয়ান বোতাম গুলোয় চাপ দেওয়ার আগে এরিনের মনে হল, নিজে একবার দেখে নিলে বোধহয় ভালো হত ।

সবাই মিলে এগোনো গেল । পাঁচ রাস্তার মধ্যিখানে হাতের তালুর মত যে চারকোনা জমিটুকু, তাতেই একটু ঘাসবীজ ফেলে মাঠ বানানো হয়েছে । তার নাম তালুমাঠ । খুব কাছেই আমাদের ধরা দেওয়ার জন্য বসেছিল ছেলেধরাটা । বেশ গুছিয়ে বুমবাসকোটাসকো নিয়ে । বটগাছের ঝুরিগুলো মাথা থেকে এদিক ওদিক বেরিয়ে এসেছে ঠিকই তবু তার জটাজুটোকে সে এক ঢাউস টুপি দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করেছে । সে টুপিকে 'rasta' টুপি বলে । মানুষের মুখে একটা বাগান থাকে, তার সেই বাগানে একটা শিশুর মত সারল্য ছিল । লোকটা সেটা আড়াল করতে পারেনি । আমাদের কাছে এগিয়ে এসে সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিল ''Hi wah a guh on?'' ততক্ষণে বাড়ির মধ্যে থেকে এক মহিলা এসে দাঁড়ালো । তার নাম নোরা । নোরা ফ্রেগাসো । এ পাড়ায় নতুন । এরিনের কাছে সবকিছু খুব ঠান্ডাভাবে শুনলো নোরা । তার মুখটা দেখে মনে হচ্ছিল একটা বৃষ্টি নিমবাস মেঘকে সে জোর করে ঢেকে রেখেছে । নোরা তার fiancé সাথে আলাপ করিয়ে দিল । তার নাম যশোয়া ব্রাউন । ''গতকাল যশোয়া ল্যান্ড করল । Air Jamaica তো শুধু নিউইয়র্ক পর্যন্ত । তারপর অন্য ফ্লাইট । বড্ড ধকল গেছে মানুষটার'' । এক নিশ্বাঃসে কথাগুলো বলে নোরা । তাদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে বহুদিন ধরেই চ্যাট চলছে । কাগজ পত্র তৈরী হতে বছরখানেক লেগে গেল । এবার কোনো শনি রবিবার করে ওরা চার্চে বিয়ে করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত খবর দিল নোরা ।

এরই মধ্যে একটা ডাগর চোখের বাচ্চা এসে দাঁড়ালো যশোয়ার গা ঘেঁষে । ''পুপা'' ''পুপা'' বলে সে যশোয়ার কাঁধে ওঠার চেষ্টা করলো । এবার ইস্পাতের ঢাকের মত বেজে উঠল লোকটা ''meet my son Daniel ।''

সেদিন ফেরার পথে কিছু একটা লুকানোর চেষ্টা করেছিল এরিন । আমার দিকে না তাকিয়েই বলল ''যে ছেলেটার বাবা কালো সে কি করে আর একটা ওইরকম মানুষ দেখে এত ভয় পায় ?'' — তবে বাবা তো শুধু তার অমাবস্যার । 'Jazz Saxophone' এ 'ষ্ট্রবেরী মুন' বাজাতো লোকটা । পাগল হয়ে বিয়ে করলো এরিন । বিচ্ছেদের পর সন্তানভাগের সময় এল । অদ্ভুত প্রতিশোধ নিল এরিন । কোনো ষ্ট্রবেরী চাঁদের দিনে জর্ডনকে সে বাবার কাছে যেতে দেয় না । এমন কি কাস্তে চাঁদেও নয় । শুধু একটা দিন বরাদ্দ । সেদিন আকাশে কোনো চাঁদ থাকে না ।

এসবদিনে কাউকে না জানিয়ে ঝুপ করে আঁধার নেমে আসে । প্রতিবেশী জানলায় ভারী পর্দা পড়েছে । শুধু তার থেকে কিভাবে একফালি খরমুজের মত আলো এসে পড়ে ফুল ঝোপে । শৌখিন ফুল আর কি বেঁচে আছে । শুধু ওই বুনো ব্ল্যাক আইড সুজান-এর ঝাড় জানলার নীচটা করে রোজ ফুটে থাকে, ওরা কোনো চাঁদ ভাগাভাগি বোঝে না ।

আমার সাথে তার দেখা হয় বৃষ্টিরাতের পরের দিনগুলোয় । তালুমাঠের ধারে একটা গিঙ্কো বিলবা গাছও আছে । বাদলের দিনে তার জাপানী পাখায় সারা মাঠ থই থই । সেই বাহারী পাতার লোভে আমিও পথে হাঁটি । মনে মনে ওই rastafari যশোয়ার একটা নাম দিয়ে ফেলেছি, 'জামাইকার জামাই' ।

যশোয়া আমার সাথে 'পাটোয়া'য় কথা বলে । ইংরেজী আর পশ্চিম আফ্রিকার শব্দ মেশানো একটা ক্রিয়ল ভাষা । বুঝতে কষ্ট হয় । তার থেকেও কষ্ট করে ও আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করে ।

কখনো অনন্ত 'পীচে' একটা লম্বা মত 'প্যাটারসন' মেঘ পা ঘষে ঘষে সারা আকাশটা চষে ফেলে । সেই দিনগুলোতে আমি আর সে স্মৃতি ভাগাভাগি করে নি । 'রেগে' সঙ্গীতের শিখরের মত প্রতিবাদী বৃষ্টি নামে । ক্যারিবিয়ান সাগরের থেকে উঠে আসে ছাঁট । আমরা ভিজতে থাকি, কোনো এক টানে । যার কোনো নাম নেই । যা কাউকে বোঝানো যাবে না । অন্তত এ পাড়ায় বেড়ালবাড়ির কাউকে তো নয়ই ।

ভালো বেড়া নাকি ভালো পড়শি বানায় । কিন্তু আমাদের পাড়ায় কোনো বাড়িতে বেড়া নেই । দেশে যশোয়া বেড়া রঙের কাজ করত । এখন সে বেকার । সারাদিন সে মা বিনা খোকাটা সামলায় । হঠাৎ একদিন সে তার বউ এর দেওয়া গাড়িটাকে সংগ্রামী মানুষের মত কালো রঙ করে ফেলে । সে গাড়ির একটা দরজা সূর্য, অন্যটা শস্যক্ষেত - ঠিক তার দেশের পতাকার রঙ ।

এইভাবে সুগার মেপল গাছের হেলিকপ্টার বীজগুঁটি গুলোর শেষ একটা ঘুরে ঘুরে কোথাও একটা পড়লো । দলে দলে উদ্বাস্তু হেমন্তের লালপাতা আশ্রয় নিল বৃষ্টি

পাইপে, নালার মুখে । কেউ জানতে পারবে না, কখন ঝোপে ঝাড়ের ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলো সবাই ঘরে যাবে । আর ঠান্ডা মাটির ভেতর রয়ে যাবে তাদের ডিমগুলো । অ্যাশগাছের বাকলের মধ্যে একরকম সবুজ পোকা আশ্রয় নেয় । তাদের লার্ভাগুলো গাছের শিরার রক্ত চলাচল বন্ধ করে দেয় । আমরাও এইসব দিনগুলোয় সেই পোকাটার মতন বাঁচি । রক্তশূন্য পাড়াটায় কোনো মানুষের চলাচল থাকে না । সেই হিম মাসগুলোয় আমার আর যশোয়ার সাথে কথা হয় না । এখানে কোকিল নেই । কিন্তু ঘাসযন্ত্রের শব্দ আছে, সেঁকা মাংসের গন্ধ আছে আর তার সাথে তালু মাঠের থেকে উড়ে আসা কিছু গানও আছে । মুক্তি, মোচন পুনঃপ্রাপ্তি Redumption নিয়ে বব মার্লো ভেসে এল একদিন ।

আবার তার সাথে দেখা । কিন্তু সে আমাকে দেখলো ঝুটা Rayban-এর ওপার থেকে । তার মাথার অসমান জমি এখন পরিপাটি পীচের রাস্তা । হেমন্তের সমুদ্রগল পাখি বৃদ্ধ পালক ফেলে দিয়ে নবীন হয় জানি । কিন্তু যশোয়ার একি নির্মোচন ! তার মুখটা যতটুকু দেখা যায় মনে হল মরুভূমিতে দিনরাত জ্বলে যাওয়া করোটির মত ফ্যাকাশে । আমার চোখের প্রশ্নটার উত্তর সে নিজেই দিন, ''mi wa cola sista'' হ্যাঁ ঠিকই । সে রঙ চেয়েছে । তাই ও দেশে গিয়ে বেশ খানিকটা বিষ ক্রিম দিয়ে তার মেলানিনটা পুড়িয়ে এসেছে । পোড়া লোক এমনিতেই সাদা লোকের থেকেও ফর্সা হয় । কি করবে এদেশে তো ফর্সা হওয়ার ক্রিম পাওয়া যায় না । আমি জানি সে কথাটা কতটা সত্যি । বাধ্য হয়ে নিজের রঙের তিনপোঁচ চড়া পাউডার কিনে আনতে হয় ।

এবার যশোয়া প্রমাণ করতে পারবে, তার কোনো এক প্রপিতামহী ছিল মালিকের ঘরের সোহাগী । শ্বেত মনিব তাঁর পিঠে চাবুকের আলপনা আঁকেনি । আখের ক্ষেতে জ্বলন্ত সূর্যের সামনে তাঁকে বারবার ধর্ষিতা হতে হয়নি । বরং মনিব দিয়েছে তাকে আদরের সন্তান । আর তার সাথে মোমের মত একটা রঙ । সেই রঙ গলে গলে তৈরী হয় তাঁর সন্ততি । আজ যশোয়া তাই আর তত কালো নয় । এইসব সর্বনাশা রঙের নাটকে ড্যানিয়েল কি করছে ? আমাকে কিছুটা স্বস্তি দিল যশোয়া । ড্যানিয়েলকে রসায়নে ধোওয়ার আগে দুদন্ড ভেবেছে সে, ''Him carring dis coil from Fi wi for fatha, mi nuh wa Fi mash up it ।'' যশোয়া বলল ''বাপ পিতামোর কাছ থেকে যে দুই তারের পাকানো দড়িটা পেয়েছে ছেলেটা, তাকে ছিঁড়ে ফেলতে চাইনা আমি . . . . ।''

এবার যদি যশোয়া ঢঙের কোনো একটা কাজ পায় । তার rastafari মন আর ঘরের সাধনায় টিকতে পারছে না ।

আকাশের পিঁড়িতে একটা বৃদ্ধা মেঘ বসেছিল । ঠিক আমার ছেলেবেলার টুনির মা মাসির মত । উবু হয়ে । সে কয়লা ভাঙতো । আর তাঁর পিঠ থেকে ডিম হাড় গুলো বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইতো । সে নিজে না জানলেও তাঁর একটা কানাঘুষো ছিল যে তার টি বি ছিল । প্রায়ই বিকেলের দিকে ঠাকুমা তার হাতে কিছু পয়সা দিয়ে বলতেন, ''একটু দুধ খেও ।''

ঠাকুমা জানতেন কিনা জানিনা, আমি জানি । মাসি ওই টাকা নিয়ে মাঝে মাঝেই পাড়ার রাশমনের দোকানে যায় । একপাতা টিপ, পাউরুটি এটা ওটা আর মাসকাবারি একটা ''ফেয়ার এ্যান্ড লাভলী'' লুকিয়ে নেয় নাইলনের থলিতে । টুনির দিদির তখনো বিয়ে হয়নি ।

তারপর মাসি একটা পিঁপড়ের মত তার ক্লান্ত কঙ্কালটা শরীরের বাইরে নিয়ে হেঁটে চলে যেত বাজারের দিকে । রাতে আলুপটল রঙ করার কাজ করত মাসি । টুনির দিদির কোনো দিনই আর বিয়ে হল না । কিন্তু ও জানতো কি ভাবে কেরোসিন আর দেশলাই দিয়ে সহজেই ফর্সা হওয়া যায় ।

সদ্য বরফ নেমে গেছে । গত হেমন্তের পায়ের ছাপ রয়ে গেছে এদিক ওদিক । যত পাতা ডাল নুড়ি ছড়িয়ে আছে ঘাসে । এগুলো কি পুরনো লজ্জা ভয় দাসত্বের ডাল নুড়ি সব ? কবেকার তুলো তামাক চিনির গন্ধ উঠে আসে তার থেকে ।

পেছনে যশোয়া রোদ চশমায় তার নকল অস্তিত্ব বাঁচাচ্ছে আর মাথার ওপর সূর্যটা 'ইউসেইন বোল্ট' হয়েছে যেন । মেঘের সাথে পাল্লা দিয়ে দৌড়চ্ছে । এই সব ঘটনার দায়ভার কি তাকেও নিতে হবে না ?

— গল্প —

মৃগদাব

ইন্দ্রাণী দত্ত

সুখ বলতে সুপর্ণার চোখে একটা ছবি ভাসত – সে ছবির কতখানি সত্য কতখানি মনগড়া না কি পুরোটাই স্বপ্ন – সুপর্ণা জানে না । সুখ ভাবলে কোথাও যেন কিরকির শব্দ করে প্রজেক্টর চালু হয়ে যেত আর সুপর্ণা একটা সাদা কালো ভিডিও ক্লিপ দেখতে পেত – চোখের একদম সামনে; দেখত একটা চওড়া রাস্তা – নতুন সব ঘরদোর তৈরি হচ্ছে একদিকে – পাঁজা পাঁজা ইঁট, সিমেন্ট, বালি, স্টোনচিপসের ঢিপি, ভারা বেঁধে কাজ, অন্যদিকে অজস্র কাশফুল আর মহালয়ার আগের দিন বেলা দশটা নাগাদ মা বাবা আর সুপর্ণা রিকশা করে যাচ্ছে । সে ছবিতে রোদ চড়া নয় – নীল আকাশ; আর সেই আকাশের নিচে পিচঢালা নতুন রাস্তা ধরে যেন এক গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন যাচ্ছে সুপর্ণা, যেন ফিরবে সন্ধ্যায়, যেন বিকেলে আর পড়াশোনা নেই তার । তারপর যেন শেষরাতে মহালয়া শুনবে, আর তার পরদিন রবিবার । সোমবারে যেন কোনো ক্লাস টেস্ট নেই বরং পুজোর ছুটি পড়ে যাবে দুপুরে । এ ব্যতীত গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্নের মেনুতে ফিসফ্রাই একথাও যেন জানা গেছে আগেই । একটার পর একটা সুখবোধ, আনন্দ, ভালো লাগা যেন মুক্তোর মালার মত পরপর গাঁথা – যেন কোথাও কোনো ফাঁক নেই, যেন বিষাদ কিংবা দুঃখ ঢোকার কোনো পথই খোলা নেই । ঘটমান বর্তমান আর অপুর ভবিষ্যত মিলিয়ে সেই ভিডিও ক্লিপকেই সুপর্ণা সুখ বলে জেনেছে এতকাল । সেই মালার মত নিরবচ্ছিন্ন সুখ পেতে হ'লে দাম ধরে দিতে হয় – এই কথাটা অবশ্য সুপর্ণা ধীরে ধীরে জেনেছে । কোনো কোনো রাতে ব্যালকনিতে বসে থাকতে থাকতে করোগেটেড ফাইবারের শেডের ভেতর দিয়ে চাঁদের মালা দেখত সুপর্ণা । অখণ্ড ও একটানা । এই দেখার পিছনে কোনো এক শারীরবৃত্তীয় বা নিছক ভৌত কারণ আছে যেটা সুপর্ণা জানত না অথচ এই চাঁদের মালা যে চোখের আড়াল হতে দেওয়া চলবে না এই রকম তার মনে হ'ত । এইভাবে নিরবচ্ছিন্ন সুখবোধে সে মজতে থাকে, সেইমত নিজেকে ট্রেইন করে তারপর অভ্যস্ত হয়ে যায় । অখণ্ড সুখবোধের মূল্য সে চুকিয়ে আসছে আজ চল্লিশ বছর । কারোর কোনো কথায় কোনোদিন না বলেনি সুপর্ণা ।

এই যেমন আজ এই রিসর্টে সে আর অতনু বিয়ের কুড়ি বছর উদযাপন করতে এসেছে, সেও অতনুর ইচ্ছায়, অতনুর পছন্দে । কোথায় যাবে, হোটেলে থাকবে না রিসর্টে না সরকারী ট্যুরিস্ট লজে, কি খাবে সবই অতনুর ছকে দেওয়া । অখণ্ড সুখবোধের চাঁদমালা সুপর্ণার হস্তধৃত এতদিনে, সে তা হাতছাড়া করতে চায় নি, বলাই বাহুল্য । অতনুর সঙ্গে ওর বিয়েটাও এভাবেই । মায়ের প্রতিটি কথায় সে হ্যাঁ বলেছিল – পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ায়, পাত্রপক্ষের মেয়ে দেখতে আসায়, অতনুকে কেমন লাগল প্রশ্নের উত্তরে সে হ্যাঁ বলেছে, ঘাড় কাত করে মাথা নেড়েছে । রোম্যান্সের সামান্য একটা সুতো ছিল অবশ্য – যেদিন অতনু ওকে দেখতে আসে সেই আশ্বিনের সকালে আকাশবাণী কলকাতা 'ক'র সাতটা চল্লিশে 'শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে' বেজেছিল, সন্ধ্যায় অতনু সহ পাত্রপক্ষ সুপর্ণাদের বাড়ি থেকে ফিরে যাওয়ার এক ঘন্টার মধ্যেই ফোন এলে, ফোনের ওধারের হবু জা, ফোনের এধারের বাবা, মা, জেঠু জেঠিমা সুপর্ণার উত্তরের প্রত্যাশী হয় । সুপর্ণার কানে শরতে আজ কোন অতিথি বাজতে থাকে এবং সে এক সেকেন্ডের কম সময়ে হ্যাঁ বলে । এ বিষয়ে গিনেস রেকর্ড বুকে কোনো রেকর্ড আছে কি না জানা ছিল না কারোরই, তবু সুপর্ণার মা অবাক হয়ে বলতে থাকে – 'আরেকটু সময় নিয়ে ভাবতে পারতি,' বাবা বলেছিল, 'স্বচ্ছন্দে না বলতেই পারিস' । এখন 'না' বললে, আবার কবে এই রকম পরিস্থিতি আসবে এবং আজকের আর সেই ভবিষ্যত পরিস্থিতির মাঝে ফারাক কতদিনের এবং সর্বোপরি সেই ফারাকে অখণ্ড সুখবোধের মডেলটি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে কি না সে বিষয়ে কোনো অদৃশ্য অঙ্ক কষা সুপর্ণার মনে চলতে থাকে এবং ফলশ্রুতি 'হ্যাঁ তে দাঁড়ায়' ।

এই সব ছিল পুরোনো কথা । আজ ওরা অন্য শহরে । এই শহরে সবাই হরিণ দেখতে আসে । রিসর্টের ঘরে ঘরে বিছানার চাদরে হরিণের মোটিফ, বিলবোর্ডে হরিণের ছবি, বাজারে হরিণ আঁকা টি শার্ট, হরিণের সফট টয়, রাস্তায় তীরচিহ্ন দিয়ে, একাধিক ভাষায় 'ডিয়ার পার্ক

এই দিকে' লেখা। আজ সকালে রিসর্টে পৌঁছনোর পরেই অতনু দরজা বন্ধ করেছে, দুপুরে 'চলো তোমাকে এখানকার ফেমাস বিরিয়ানি খাওয়াই' বলেছে – এসবই সুপর্ণার হস্তধৃত সুখের মালায় একদম খাপে খাপে ফিট করে গেছে। রোদ পড়লে বিকেলে ওরা ডিয়ার পার্কে হরিণ দেখতে যাবে – এরকমই কথা হয়ে আছে। সুপর্ণা অতনুর পাশে শুয়ে, বালিশে মাথা, এ সি মেশিনের মৃদু আওয়াজ আসছে, ভারী পর্দার বাইরে দুপুরের রোদ, পাশের ঘরে বড় গোছের একটা গ্রুপ সদ্য চেক ইন করল। হাল্কা কথা শোনা যাচ্ছে করিডোরে, একটা বাচ্চা একটানা গাইছে, হুড় হুড় হুড় দাবাং দাবাং। এক কথায়, ঘটমান বর্তমান বা অদূর ভবিষ্যতে কোনো বেদনাবোধের স্থান নেই।

ওদের রিসর্ট থেকে ডিয়ার পার্ক মিনিট পঁয়তাল্লিশ, সূর্য ডোবার সময়ে হরিণরা দল বেঁধে জল খেতে আসে। ট্যুরিস্টরা সানসেট, জলস্রোত আর হরিণের পালকে এক ফ্রেমে ধরে নিয়ে বাড়ি যায়। বেরোনোর আগে অতনু ক্যামেরার ব্যাটারি চেক করল। রিসর্টের বাসে করল। রিসর্টের বাসে আরো দুটি দল, সানগ্লাস, টুপি, জলের বোতল। বাচ্চা ছেলেটা একই গান গেয়ে চলেছে – হুড় হুড় হুড় দাবাং দাবাং। হুড় হুড় হুড় দাবাং দাবাং।

যদিও বিকেল, রোদ এখনও চড়া, উল্টো দিক থেকে হু হু ট্রাক, বাস, অ্যাম্বাসাডর, মারুতি, দুপাশে ধানক্ষেত, কাশের গোছা, রাস্তায় কোথাও ধান শুকোতে দেওয়া আছে। ড্রাইভারের পাশের সিটে অতনু যাত্রাপথের টানা ভিডিও তুলছে, পরে এডিট ক'রে ফেসবুকে আপলোড করে দেবে। দাবাং দাবাং-এর দল আর অন্য দলটি সূর্যাস্তের সময়ে জলের কাছে পৌঁছোনো নিয়ে সামান্য চিন্তিত। বাসের ড্রাইভার 'বালম পিচকারি' চালিয়ে দিয়েছে। এই সময়, সামনে রাস্তার ওপরে একটা ভীড় দেখতে পেলো সুপর্ণা। অতনুও দেখেছে। ড্রাইভার গান বন্ধ করে বাসের গতি কমালো। যে ভীড়টা দূর থেকে ছোটো মনে হচ্ছিল, কাছ থেকে তাকে আর ছোটো লাগছিল না সুপর্ণার। উপরন্তু রাস্তার এদিকের ধানক্ষেত, ওদিকের ইঁটভাটা পেরিয়ে আরো কিছু মানুষ রাস্তায় এসে উঠতে লাগল। কিছু লোকের হাতে বাঁশ লাঠি আর টাঙ্গি দেখল সুপর্ণা। ভীড়ের মধ্যে থেকে দুজন হাতে গামছা নাড়তে নাড়তে বাসের দিকে এগিয়ে এলে, ড্রাইভার বাস থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাবাং-এর দল চেঁচিয়ে বলল, 'কেউ নামবেন না বাস থেকে, প্লীজ, প্লীজ'; অতনু 'কি হ'ল' বলতে না বলতেই, বাসের গায়ে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কেউ বলল, 'এই রাস্তা বন্ধ, বলছি না ব্যাক করতে'। ড্রাইভারের পাশের জানলার কাচ নামানো ছিল, সেখানে মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে কেউ বলল – 'বলছি না, ব্যাক করতে। কানে কথা যায় না ?' অতনু মুখ বাড়িয়ে বলল, 'কি হয়েছে, কি হয়েছে ভাই' ? ঐ ভীড়কে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করতে পারছিল সুপর্ণা – একটা দল যাদের হাতে লাঠি, বাঁশ, অন্য ভাগটা স্রেফ দর্শক। অতনুর দিকের ভীড়টা মূলতঃ দর্শকের। সেখান থেকেই কেউ বলল – 'মোষ চুরির ধোলাই চলতেসে।' সুপর্ণা এই বার দেখতে পায় ভীড়ের ভেতরে আরেকটা ছোটো ভীড়, সেই ছোটো ভীড়ের ভেতরে আরেকটা ছোটো ভীড়, সেই ছোটো ভীড়ের মাঝখানে কেউ শুয়ে – বিকেলের রোদে শুধু শুষ্ক দুটি পায়ের পাতা; লাঠি হাতে লোকদুটি বাসের জানলা ছেড়ে আবার ভীড়ের দিকে দৌড়ে যায়।

অতনু কপাল মুছে বলে, 'যত্তো সব ঝামেলা, ব্যাক করে ডানদিকের মাটির রাস্তায় চলো, ওখানে থেকে হাইওয়ে ধরলে এখনও সানসেট দেখা যাবে।'

বাকি পথ একদম ঝামেলা রহিত ছিল। শেষ বিকেলে ওরা জলের কাছে, হরিণের কাছে, সূর্যাস্তের কাছে ঠিকই পৌঁছতে পেরেছিল, ছবি উঠেছিল অনেক, সেল্ফিও। সে রাতে রিসর্টের ডাইনিং হলের ৩৯ ইঞ্চি স্ক্রীনে সংবাদপাঠক মোষ চোর সন্দেহে এক কলেজ ছাত্র হত্যার খবর দেয়; জানা যায় দুষ্কৃতীরা অসনাক্ত – পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে। বুমের সামনে শীর্ণা বৃদ্ধাকে বিলাপ করতে দেখে সুপর্ণা, একটি কিশোরীকেও। মৃত ছাত্রর মা আর বোন যথাক্রমে। সুপর্ণার হস্তধৃত মালাটির জপ বন্ধ হয়ে যায় এই খানে।

সুপর্ণা জিগ্যেস করে – 'তোমার ক্যামেরা অন ছিল না অতনু ? ছবি ওঠে নি একজনেরও ?'

– 'তো ?'

– 'লোকাল থানায় গেলে হয় না ?'

– 'পাগল না কি তুমি ? এই সব ঝামেলায় যেচে যায় কেউ ? তার ওপর শিওর পোলিটিকাল পার্টি ইনভলবড। তিন আঠারোয় পুরো চুয়ান্ন ঘা হয়ে যাবে। দুদিনের জন্য বেড়াতে এসে এই সব কেউ করে ?'

সুপর্ণা খিদে নেই বলে উঠে যায়। অতনুও ওঠে।

– 'মাথা ধরেছে তোমার ? একটা স্যারিডন খেয়ে শুয়ে থাকো বরং। কাল ভোরে উঠতে হবে। গাড়ি বলা আছে।'

সমস্ত রাত গুম মেরে থাকে সুপর্ণা। বারে বারে জল খায়, বাথরুমে যেতে থাকে। ভারি পর্দার ফাঁক দিয়ে রিসর্টের বাগানের আলোর একফালি ওদের বিছানায়, অতনু ঘুমোচ্ছে। আলো জ্বালিয়ে ক্যামেরা খোঁজা সম্ভব নয়, জেগে যাবে। অন্ধকারে সুপর্ণা ভাবতে থাকে, 'ক্যামেরা কোথায় রেখেছে অতনু' ?

পর্দার যে ফাঁক দিয়ে বাগানের আলো ঢুকছিল রাতে, সেই ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকলে, অতনুর দিকের সাইড টেবিলে ওর ক্যামেরা দেখতে পায় সুপর্ণা। এই সময় অতনু ঘুম ভেঙে সুপর্ণার চোখের দিকে তাকায় তারপর ক্যামেরার দিকে।

– 'কি ভাবছটা কি ? এই সব কি পাগলামি ? কি হয়েছে কে তোমার ?'

– ক্যামেরাটা নিয়ে থানায় চলো অতনু, প্লীজ।'

– 'ও ভিডিও এক্ষুনি ডিলিট করে দেব – পুলিশকে দেখানোর কিছু থাকবে না।'

এক লাফে বিছানা ছেড়ে ওঠে অতনু। পর্দা সরিয়ে, চোখ কুঁচকে ক্যামেরা অন করে।

পর্দা সরাতেই সূর্যের আলো হু হু করে ঢুকতে থাকে, বিছানায় থৈ থৈ করে রোদ, চাদরে হরিণের মোটিফে আলো – সবুজ ঘাস পরিস্ফুট হয় প্রথমে তারপর হরিণেরা জাগে। জেগে ওঠে, জ্যান্ত হয়, মাথা তুলে সুপর্ণার দিকে তাকায়। সেই চাহনিতে সুপর্ণার হস্তধৃত এতকালের সুখমালাটি ছিঁড়ে ঝরঝর করে মুক্তোগুলি মেঝেতে গড়িয়ে যেতে থাকে। ঠিক তখনই মিনিটের ভগ্নাংশ সময়ে, এত বছরের অনুচ্চারিত সমস্ত 'না' গুলিকে সংহত করে বিছানার অন্য প্রান্তে পৌঁছতে সুপর্ণা ভল্ট খায় – যেন দীপা কর্মকারের প্রাদুনোভা ভল্ট – যে ভল্ট না দিলে নতুন করে কিছু শুরু করা যায় না। হতবাক অতনুর হাত থেকে ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে দরজা খোলে সুপর্ণা। উস্কোচুল, লাল চোখ আর রাতপোশাকেই রাস্তা দিয়ে ছুটতে থাকে। চল্লিশ বছরের সুপর্ণা স্প্রিন্ট টানে খালি পায়ে। সঙ্গে হরিণগুলি। সুপর্ণা যখন করিডোর দিয়ে দৌড়োচ্ছিল, পাশের ঘর, তার পাশের ঘর থেকে আরো হরিণ বেরিয়ে আসে। নিচের লবি, ডাইনিং হল, রিসেপশন থেকে আরো আরো হরিণ।

কথিত আছে, সন চোদ্দোশো বাইশ বঙ্গাব্দে আশ্বিনের সকালে বড় রাস্তা ধরে এক দল হরিণকে দৌড়তে দেখা গিয়েছিল। যানবাহন রুদ্ধগতি, এবং পথচারীরা থমকে দাঁড়িয়েছিল। অজস্র টুরিস্ট আর স্থানীয় বাসিন্দা সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিল। সেল্ফি তোলার সাহস করে নি কেউই। তীব্র গতিতে ছুটে যাওয়া সমস্ত হরিণের চোখ রক্তবর্ণ, গ্রীবাভঙ্গী গর্বিত, এবং উন্নত ছিল।

সন চোদ্দোশো বাইশের আশ্বিনের সকালে হরিণের বন শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

— গল্প —

বেটু

শুভ্র দত্ত

বেটুর জন্য আমাকে হয়তো একদিন সুইসাইড করতে হবে।

হয়তো কেন, বোধহয় করতেই হবে। না না, বোধহয়-ই বা বলছি কেন, নিশ্চয়ই করতে হবে। খবরের কাগজের ভিতরের কোনো পাতায় হয়তো কয়েক লাইন খবর ছাপা হবে, 'বালকের অত্যাচারে অসহায় পিতা আত্মঘাতী — পলাশবাগান অঞ্চলের নীলকমল সাহা (৮) ওরফে বেটুর অত্যাচারে ও প্ররোচনায় - - -' ইত্যাদি ইত্যাদি।

অথচ আমাদের বেটুকে দেখলে যে কোনো লোক 'চমৎকার ছেলে' বলে প্রশংসা করবে। বেটু খাওয়াদাওয়ার ঝামেলা করে না। তেতো উচ্ছে খেতে দিলে উচ্ছেখাওয়া মুখ না করেই দিব্যি সব শেষ করে ফেলে। আবার যে সব বাচ্চাদের পড়তে বসলেই ঘুম পেয়ে যায়, বেটু তাদের দলেও পড়ে না। অংক টংক যা হোমওয়ার্ক থাকে বেশ চটপট করে ফেলে। বেটু রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময়তে বসে টিভি দেখতে থাকে না; সকালে ঘুম থেকে উঠতে গাঁইগুঁই করে না; শপিং সেন্টারে গেলে এটা চাই ওটা চাই বায়নাও ধরে না।

বেটুর বয়সী অনেক ছেলেই ভয়ানক দুর্দান্ত হয়। এই যেমন আমার পিসতুতো দিদির ছেলে ভুটু নাকি এক রবিবারে ওর বাবা অতনুর দিবানিদ্রার সুযোগে তার গোঁফে ক্রেজি গ্লু মাখিয়ে দিয়েছিলো। ভুটুর পিসতুতো ভাই বাপী আরো কীর্তিমান; সে মায়ের সেলাইয়ের বাক্সের কাঁচি যোগাড় করে বাবার টেবিলে রাখা কিছু শেয়ারের কাগজপত্রের ওপর চালিয়ে দুফাঁক করে দিয়েছিলো। বোধহয় শেয়ারের স্প্লিট করার কথা শুনে আইডিয়াটা পেয়েছিলো।

বেটু কিন্তু মোটেই ওদের মতো নয়। বেটু সত্যিই ভাবে, যে তার বাবা পারে না এমন কাজ নেই; তার বাবার নেই এমন জিনিস নেই; তার বাবা জানে না এমন কিছুই নেই।

হায়, বেটুর বাবা যে নেহাৎই মাঝারি মাপের লোক; স্কুলে-কলেজে কোনোদিন ফাস্ট ডিভিশন জোটেনি। খেলাধুলোর দৌড় পাড়ার মাঠের ক্রিকেট-ফুটবল পর্যন্তই। না জানে মিউজিক, না কোনো আর্ট। এ হিরো সবেতেই প্রায় জিরো।

বছর তিনেক আগে একবার বেটুকে নিয়ে তৃণা আর আমি শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা দেখতে যাচ্ছিলাম। ট্রেনে আমাদের পরিচিত এক মাসি-মেসোর সঙ্গে দেখা হলো। ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর গানের ভারি ভক্ত। নিজেও গান করেন। ট্রেন ছাড়ার পর গান ধরলেন, 'পথে চলে যেতে যেতে'। একসময় কথায় কথায় মেসো বললেন — কবিগুরু ঐরকম অসাধারণ রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখেছেন অন্তত হাজার তিনেক। ভাবা যায়?

বেটু অমনি পাশ থেকে বলে বসলো — আমার বাবাও পারে।

— কি পারে? — মেসো জানতে কৌতুহলী হলেন।

— ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে পারে।

সবাই হেসে উঠেছিলো মজা পেয়ে। কিন্তু সেই সবে শুরু।

কিছুদিন আগের কথা। একদিন বেটু বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে খেলাধুলো করে ফিরে এসে আমাকে জানালো — জানো বাবা, তীর্থের পৈতে হয়েছে; ও একটা গীটার পেয়েছে। বলছিলো ওর গীটারে নাকি ছ'টা তার আছে, আর সেগুলো খুব ঠিকঠাক করে টিউন করতে হয়।

তীর্থ বেটুর বন্ধু, ওর চেয়ে একটু বড়; আমাদের হাউসিং-এই থাকে। আমি বললাম — তাই নাকি? বেশ ভালো কথা।

বেটু বললো — আমি তীর্থকে বলেছি আমার বাবারও একটা গীটার আছে, তাতে আরো অনেক তার আছে, ছ'টা ছ'টা বারোটা। তীর্থ বলেছে রবিবারে আসবে গীটারটা দেখতে।

শুনে আমার মাথায় হাত । বললাম — তুই আবার মিথ্যে কথা বললি ? এক তো আমার কোনো গীটার নেই, কোনোদিন ছিলোও না । আমি গীটার বাজিয়েছি কখনো ?

বেটু কাঁচুমাচু মুখ করে বলে — অ্যাক্সিডেন্টালি বলে ফেলেছি বাবা ।

— অ্যাক্সিডেন্টালি উলটোপালটা কথা বলার আগে এটাও ভেবে দেখবি তো যে গীটারে বারোটা তার হয়না, ছ'টা তারই হয় । — আমি বলি — ঐ তো পাশের ফ্ল্যাটে পাপুনদার ঘরের দরজায় জিমি হেনড্রিক্সের পোস্টার লাগানো আছে, দেখে আয় না ।

বেটু কেটে পড়ার উপক্রম করে । আমি ওকে ধরে বলি — পালাচ্ছিস কোথায় ? যা এক্ষুণি বসে একপাতা হাতের লেখা লেখ, 'সদা সত্য কথা বলিব'; আর এরপরে যখন তোর বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে তখন বলে দিবি যে বাবার গীটারটা চুরি হয়ে গেছে ।

বেটু একটু ভেবে বলে — তাহলে বাবা, হাতের লেখাটা এখন না লিখে তীর্থকে কথাটা বলার পর লেখা উচিত ।

আমি বলি — না না এখনই লেখ । আচ্ছা দাঁড়া; বরং একটু অন্যরকম করে লেখ, 'অকারণে মিথ্যা কথা বলিব না' ।

বেটু মোটেই খুশি হলো না, খাটনি আরো বেড়ে গেল বলে । যাক্ গে, পরে বুঝবে, বাবা যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন ।

ঘটনাচক্রে তার পরের দিনই মেট্রোতে আমার পুরোনো বন্ধু পরিমলের সঙ্গে দেখা । ও এখন চিৎপুরে ওদের পৈত্রিক ব্যবসা 'চৌধুরি মিউজিক হাউস' চালাচ্ছে ।

কথায় কথায় বেটুর ব্যাপারটা পরিমলকে জানাতেই ও বলল — টুয়েলফ্-স্ট্রিং গীটার সত্যি হয় রে । ওতে ছ'টা নয় ছ'জোড়া তার থাকে । আমাদের দোকানেই ওরকম একপিস অ্যাকুস্টিক গীটার পড়ে আছে ।

তাই নাকি রে ? — আমি উৎসাহিত হয়ে উঠি ।

— আমাকে একসপ্তাহের জন্য ওটা ধার দে না । না না, বরং এক সপ্তাহের জন্য ওটা আমাকে বিক্রি কর । ঠিক সাতদিন বাদে নিখুঁত অবস্থায় ফেরৎ দিয়ে যাবো কথা দিচ্ছি ।

নো প্রবলেম — পরিমল বলে । — যতদিন খুশি রাখতে পারিস তোর কাছে । আজকাল অ্যাকুস্টিক গীটার আর কেউ কেনে না রে । সবাই ইলেকট্রিক নিয়ে ওস্তাদি দেখাতে চায় । আর টুয়েলফ্-স্ট্রিং এর বাজার তো আরোই খারাপ । আমার দোকানে পড়ে ছিলো, এখন না হয় তোর ঘরে পড়ে থাক । সে যাত্রা ফাঁড়া কেটে গেল । রবিবারে বেটুর বন্ধু তীর্থকে সেই কুমির ছানা দেখিয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে দিয়ে এলাম ।

কিন্তু বেশীদিন নিশ্চিন্ত থাকায় সুখ ভাগ্যে নেই ।

পরের ঘটনাটা ঘটলো তার মাসখানেক বাদে । সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সবে গ্রিলের কারখানা থেকে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হচ্ছি; তৃণা এসে বললো — এবারে তুমি ম্যাজিশিয়ান ।

— অ্যাঁ ! তার মানে !

— তার মানে বেটুর ক্লাসের দীপ ওকে গল্প করেছে যে গত রবিবারে ও মহানগর-মঞ্চে দারুণ ম্যাজিক দেখেছে । তখন সঙ্গে সঙ্গে তোমার ছেলে বলে দিয়েছে যে তার বাবাও দুর্দান্ত ম্যাজিক দেখাতে পারে ।

— খেয়েছে । কোথায় আমি আর কোথায় ম্যাজিক ! ওর এইসব আজেবাজে গল্পগুলো বন্ধ করা দরকার । ডাকোতো ছেলাটাকে ।

— বেটু পড়তে বসেছে এখন । — তৃণা বলে । — মারধোর কোরোনা যেন । এই সপ্তাহে ওর জন্মদিন মনে আছে তো ?

— মারবো কি ! মরছি আমি নিজেই । একদিন হয়ত বলে বসবে আমার বাবা দারুণ ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের অঙ্ক করতে পারে, বা দারুণ ভরতনাট্যম নাচতে পারে, কিংবা দারুণ মিগ বিমান চালাতে পারে । — বলতে বলতে আমার মনে পড়ে — বেটুর জন্মদিনে ওর যে বন্ধুদেরকে কেক খেতে ডাকছো সেই বাচ্চাগুলোর মধ্যে দীপও আছে না ?

— হ্যাঁ আছে তো ।

— এই মরেছে । বাড়িতে এসে আবার ম্যাজিক দেখতে না চায় ! — আমি ভয়ে ভয়ে বলি ।

— দেখতে চাইলে দেখাবে । — তৃণা বেশ অকুতোভয়ে বলে ।

— কিভাবে দেখাবো ? বন্ধ সিন্দুক খুলে পি. সি. সরকারকে বার করবো ?

— আহা, তা কেন ? আচ্ছা, এই ধরো তুমি একটা গ্লাসের নীল রঙ্গের জল অন্য একটা ফাঁকা গ্লাসে ঢাললে; তক্ষুনি সেটা লাল হয়ে গেল । ম্যাজিক না ? খুব সোজা ব্যাপার; কিচ্ছু ভেবো না । আমি তোমাকে দেখিয়ে দেবো । সারাদিন ল্যাবে ঐসবই তো করছি ।

তাই তো ! মনেই ছিলো না যে বউ আমার কেমিস্ট । আমি বলি — জানো তো, আমার বাবার তাসের আড্ডার বন্ধু পরেশকাকু হাজারো রকমের তাসের যাদু জানতো । খুব সহজ দেখে দুতিনটে হাতসাফাই আমাকেও শিখিয়েছিলো । এখনো বোধহয় ভুলিনি । চেষ্টা করলে মনে পড়বে হয়তো । শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা ভালোই উৎরে গেল । বাচ্চাগুলোর দারুণ মজা । গোটাদুয়েক তাসের খেলা দেখাবার পরে আমি একটা নীল কালির পেন দিয়ে কাগজে লিখলাম 'নীলকমল'; তারপরে অন্য একটা কাগজে (সেটাতে তৃণা হালকা করে পাতিলেবুর রস মাখিয়ে রেখেছিল) ঐ একই পেন দিয়ে লিখলাম 'লালকমল', তখন লেখাটা লাল রঙের হয়ে গেল । কালিতে লিটমাস না কি যেন ছিল । এরকম আরো কয়েকটা খেলা দেখিয়ে সবশেষে আমি জিজ্ঞেস করলাম — কোন ম্যাজিকটা তোদের সবচেয়ে ভালো লাগলো ?

দীপ বললো — ঐ যে কাকু যখন তুমি বেদানার রস গ্লাসে ঢাললে আর সেটা অরেঞ্জজুস হয়ে গেল । ভাগ্যিস খেয়ে দেখেনি ।

আরেকটা ফাঁড়া তো কাটলো, কিন্তু সর্বদাই ভয়ে ভয়ে আছি, বেটুর উর্বর মস্তিষ্ক থেকে আবার কি বেরোয় । হয়তো কোনোদিন বলে বসলো — আমার বাবা দশতলা বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে পারে । ব্যাস, তাহলেই আমি শেষ ।

তবুও তাকে থামানো গেল না । বাড়ি ঢুকতেই তৃণা বললো — আজ ছেলেটা কি বলে এসেছে জানো ?

— কি বলেছে । বলেছে আমি একই সঙ্গে দুহাতে দুরকম ছবি আঁকতে পারি ? — আন্দাজ করার চেষ্টা করি আমি ।

— না ।

আমি জল থেকে পেট্রোলিয়াম বানাতে পারি ?

— তাও না ।

— আমি হিব্রুভাষায় সনেট লিখতে পারি ?

তৃণা হেসে ফেলে বলে - তুমি তো কিছুই পারো না । কি পারো তুমি বলোতো ?

কেন, লোহার গ্রিল বানাতে পারি । — আমি বলি — ছোট বড়ো মাঝারি, যেরকম যেরকম ডিজাইন চাও, বারান্দার বা জালনার সাইজ দিলে নিখুঁত ফিটিং করে দেবো ।

— সরি, গ্রিল বানানোর কথাও বেটু বলেনি ।

— তাহলে ?

— সোনম ওকে বলেছে, গতকাল সার্কাসে ও জাগলিং দেখেছে; পাঁচটা ধারালো ছোরা নিয়ে সে নাকি ভয়ানক জাগলিং -এর খেলা । ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে বেটু বলে দিয়েছে ওর বাবাও পারে ।

আমি হাত-পা ছড়িয়ে সোফায় বসি । বলি — ওকে বললে ?

— বললাম, দেখ গতবার তুই মিথ্যেকথা বলেছিলি বলে তোর বাবাকে কত কষ্ট করে ম্যাজিক শিখতে হলো । এবারে তো ধারালো ছুরি নিয়ে জাগলিং করতে গেলে মহাবিপদ হবে, সারা গায়ে কেটেকুটে যাবে । বেকায়দায় শরীরে ছুরি বসে গেলে মরেও যেতে পারে ।

— তারপরে ?

— তারপরে বেটু কাঁদতে লাগলো । এবারে ভয় পেয়েছে খুব । আসবে এখন ড্রয়িং ক্লাস থেকে । তখন তুমি কথা বলো ।

কিছুক্ষণ বাদে বেটুবাবু ফিরলেন ।

আমি ডাকলাম — বেটু ।

বেটু কাছে এসে দাঁড়ালো ।

আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম — বেটু জানিস তো তোর বাবা খুব সাধারণ একটা খেটে খাওয়া লোক। মিথ্যে বলে কাউকে বড় করা যায় না রে বাবা; বরং নিজেকে ছোট করা হয়। আমরা যে আশা করে আছি তুই একদিন অনেক বড় হবি।

— আর আমি ওরকম মিথ্যেকথা বলবোনা বাবা। — বেটু ধরা গলায় বলে।

এখন বলছিস; পরে আবার ভুলে যাবি।

না বাবা। প্রমিস করছি।

— মনে থাকবে তো কথাটা ? তাহলে তোকে একটা জিনিস দেখাবো।

— কি জিনিস বাবা ?

আমি খাটের তলা থেকে ধুলোভর্তি লম্বাটে ব্যাগটা টেনে বার করি। আমার জাগলিং এর ব্যাগ। তার ভিতর থেকে আরো কিছু টুকিটাকি সরঞ্জামের সঙ্গে বেরোলো কয়েকটা ধারালো ড্যাগার, লম্বায় একহাতের বেশি, কাঠের হাতল, ছুঁচোলো মাথা। একটু ধুলো ঝেড়ে নিতেই ইস্পাতের ফলাগুলো আলোয় ঝকঝক করে উঠলো।

— এবার ওই কোণের চেয়ারটায় গিয়ে চুপটি করে বোস্ বেটু।

বলে একসঙ্গে তিনটে ড্যাগারকে আকাশে ওড়ালাম। কয়েক সেকেন্ড বাদে সে দলে নিয়ে নিলাম চারনম্বর তারপরে পাঁচনম্বরকেও।

আলোর ঝিলিক মেরে পাঁচটা ড্যাগার পাঁচটা পাখি হয়ে উড়ে বেড়াতে লাগলো। আবার একটু বাদে ক্লান্ত হয়ে একে একে তারা নেমে এলো মাটিতে।

বেটু এতক্ষণ হাঁ করে দেখছিলো। অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে বললো — তোমার গায়ে কেটে গেলো না তো বাবা !

আমি বলি — দূর বোকা, সাঁতার জানলে কি কেউ জলে ডোবে ? দাঁড়া, তোকে একদিন আগুনমুখো ড্যাগারের খেলা দেখাবো। কিছুটা কেরোসিন লাগবে, আর লাগবে নরম কাপড়ের টুকরো।

— আমাকে জাগলিং শেখাবে বাবা ? ওইরকম ছুরির খেলা।

— শিখবি তুই ? তবে প্রথমেই ছুরি ছোরা নয়, তোকে চালের খুদ দিয়ে কয়েকটা ছোট ছোট বীনব্যাগ তৈরী করে দেব প্র্যাকটিস করার জন্য। আর হ্যাঁ, প্রমিসটা ভুলিস না যেন।

এই ভাবে বেটু বড় হয়ে ওঠে।

'তরঙ্গ যায়, তরঙ্গ ফিরে আসে
গান বেঁধে দাও নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
ঘা খুঁজে এনে কী উপায়ে মরুভূমি
ঢেকে দিতে হয় তাই শিখিয়েছ তুমি'

তোমার সুরের ধারা / জয় গোস্বামী

— গল্প —

উড়ো কাগজের টুকরো

রমা জোয়ারদার

পূর্ব দিল্লীতে নবোদয় এনক্লেভের পুজোর এবার পঁচিশ বছর হল । এলাকার বাসিন্দারা সবাই হাত খুলে চাঁদা দিয়েছে । বিজ্ঞাপন আর স্পন্সরশিপ মিলিয়ে টাকা বেশ ভালো উঠেছে । সান্ধ্য অনুষ্ঠানের জন্য কলকাতা থেকে নামী-দামী শিল্পীদের আনা হচ্ছে । স্থানীয় শিল্পীরাও নাচ, গান, নাটক ইত্যাদির জন্য অনেকদিন ধরে রিহার্সাল্ দিয়ে তৈরী হয়েছে । পঁচিশ বছর উপলক্ষে চার দিনে ভোগ-প্রসাদের মধ্যে রোজ একটি করে বিশেষ পদ রাখা হয়েছে । বাচ্চাদের জন্য নানা রকম প্রতিযোগিতা প্রতি বছরই হয়, এবারেও হচ্ছে; কিন্তু তাতেও পুরস্কারগুলো একটু ভালো দেওয়া হচ্ছে ।

শিবতোষ ভট্টাচার্য একজন শিল্পী — অকৃতদার ভবঘুরে মানুষ । দিল্লীতে নবোদয় এনক্লেভে একটা ফ্ল্যাট রেখে দিয়েছেন, কিন্তু বছরের মধ্যে সাত-আট মাসই তিনি — এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ান । তবে পুজোর সময়টা তিনি দিল্লীতেই থাকেন — আর প্রতি বছর ছবি আঁকার প্রতিযোগীতার প্রধান বিচারক তিনিই হন । এ বছরে তিনি জানিয়েছেন যার আঁকা ছবি ওনার সবচেয়ে ভালো মনে হবে, তাকে তিনি পাঁচ হাজার টাকার একটি বিশেষ পুরস্কার দেবেন । আর শুধু তাই নয়, উপযুক্ত মনে হলে সেই প্রতিযোগীকে তিনি নিজে আঁকা শেখাবেন । এই খবরটি প্রচার হওয়াতে এবারের 'বসে আঁকো' প্রতিযোগীতায় ছেলেমেয়েদের সংখ্যা অন্য বারের চেয়ে অনেক বেশী ।

প্রতি বছরের মতো এবারও পুজো হচ্ছে এখানকার বড় পার্কে — যার নামই হয়ে গেছে দূর্গা পার্ক । পুজোর দুসপ্তাহ আগে থেকেই পার্কে মন্ডপ তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে । পার্কের মাঝখানে পূজামন্ডপ । তার পাশে কিছুটা জায়গা খালি রেখে বানানো হয়েছে একটা বিরাট বড় প্যান্ডেল যার এক প্রান্তে রয়েছে একটা বড় স্টেজ্ । আলো, নানা রঙের পর্দা, হাতে আঁকা ছবি, শোলার কাজ ইত্যাদি দিয়ে স্টেজ্টা সুন্দর করে সাজানো হয়েছে । প্যান্ডেলের বাকী অংশে অনেক চেয়ার সাজিয়ে দর্শকদের বসার জায়গা করা হয়েছে ।

সপ্তমীর দিন সকাল বেলা পুজো মন্ডপে ভীষণ ভীড় । খনিক আগে সপ্তমী পুজোর প্রথম বারের অঞ্জলি হয়ে গেছে । দ্বিতীয় বারের অঞ্জলির প্রস্তুতি চলছে । ঝলমলে সজ্জায় মা-দূর্গার মূর্তি থেকে যেন তেজ রাশি বিচ্ছুরিত হচ্ছে । তার চোখে অভয় বাণী । কত লোক আসছে — শুধু বাঙালী নয়, অবাঙালীরা অনেক আসছে । কেউ ঠাকুর দেখতে, কেউ অঞ্জলি দিতে কেউ বা ডালি সাজিয়ে পুজো দিতে । ওরই মধ্যে একটা বাচ্চা ছেলে — দেখলে মনে হয় বছর আষ্টেক বয়স — গুটি গুটি পায়ে পুজো মন্ডপে ঢুকল । আধ ময়লা সার্ট-প্যান্ট, পায়ে একটা সস্তা জুতো, এলোমেলো চুল, কাঁধে একটা ঝোলা যা থেকে দু-একটা বই-খাতা উঁকি মারছে । হয় তো স্কুল থেকে ফিরছে, নয় তো স্কুল পালিয়েছে । বাচ্চাটা প্রতিমা দেখবার জন্য এদিক-ওদিক দিয়ে গুঁতোগুতি করে সামনে যাবার অনেক চেষ্টা করল — কিন্তু অত লোকের ভীড়ে সুবিধা করতে পারল না । ভীড়ের মধ্যে দু-একটা ধাক্কাধুক্কি খেল, খুচরো দু চারটে বকুনি শুনলো, শেষে প্রতিমা দেখার আশা ছেড়ে দিয়ে সে পুজোমন্ডপের বাইরে চলে এল । ঘুরে ফিরে মন্ডপের সাজ সজ্জা দেখতে দেখতে তার নজরে পড়ল যে বড় প্যান্ডেলের সামনে একটা টেবিলের উপর প্রসাদের টুক্রি নিয়ে দুটো ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে । টেবিলের সামনে লোকেদের লম্বা লাইনে বাচ্চাটাও দাঁড়িয়ে গেল । দোনাটা হাতে পেতেই কাছেই ঘাসের উপর বসে সে চট্পট্ প্রসাদটা খেয়ে ফেলল, আর খালি দোনাটা কাছে রাখা নোংরা ফেলার ঝুড়িতে ফেলে দিল । স্বচ্ছতার অভিযানের কথা সেও জানে বই কি — স্কুলে শিখিয়েছে, আর রমেশদের বাড়িতে টিভিতেও দেখেছে !

হাতটা প্যান্টে মুছতে মুছতে সে এবার বড় প্যান্ডেলের ভিতরে ঢুকে পড়ল । প্যান্ডেলের শেষ প্রান্তে একটা স্টেজের উপর অনেক বাচ্চারা বসে আছে । তাদের সবার কাছে বোর্ড, গোটা গোটা রঙ পেন্সিলের বাক্স, কারও কাছে আবার জল রঙ, তুলি এসবও আছে । বোর্ডের উপর সাদা কাগজ এঁটে বেশীরভাগ বাচ্চাই আঁকা শুরু করে দিয়েছে । কেউ কেউ তখনও ব্যাগ কাঁধে দৌড়ে

দৌড়ে আসছিল । ভলান্টিয়ার অলকেশের হাতে অনেকগুলো সাদা কাগজ — নতুন কেউ এলেই সে তার হাতে কাগজ ধরিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিচ্ছিল — 'কাগজের ডান দিকে নিজের নাম, ঠিকানা আর ক্লাস গোটা গোটা করে লিখবে !'

বাচ্চাটা স্টেজের নিচে থেকেই উঁকি ঝুঁকি মারছিল । হঠাৎ অলকেশের হাতের গোছাভরা কাগজ থেকে একটা উড়ে ছেলেটার ঠিক পায়ের কাছে এসে পড়ল ! এদিক ওদিক তাকিয়ে সে ওই কাগজটা তুলে নিয়ে পিছনের একটা চেয়ারের কাছে গিয়ে ঝোলা থেকে একটা পেন্সিল বার করল, আর তারপর একটা চেয়ারে কাগজটা রেখে আপন মনে আঁকি-বুকি করতে লাগল । ক্রমশঃ সে আঁকি-বুকি থেকে একটা ছবি স্পষ্ট হতে থাকল — একটা ছোট মাটির বাড়ি, সামনে একটা সরু রাস্তা, এপাশে ওপাশে কিছু গাছ-পালা, দূরে একটা পাহাড়, সেই পাহাড়ের মাথায় একটা মন্দির, আর এই সবের উপরে রয়েছে এক নারী ! কোন সুন্দরী রমণী বা স্নিগ্ধ মাতৃমূর্তি নয় — রোগা, রুক্ষ এলোচুলের এক খেটে খাওয়া নারীর চেহারা । মনে হচ্ছে যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত চলেছে সে ! ছেলেটা মন দিয়ে ছবি আঁকছিল । হঠাৎ তার আঁকা ছবির নারীটি জীবন্ত হয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে তার কাছে এসে দাঁড়াল । এসেই ধাই ধাই করে ছেলেটার পিঠে কয়েকটা কিল বসিয়ে দিয়ে দেহাতি ভাষায় বলে উঠল — 'আমি কখন থেকে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুই এখানে বসে আছিস ? ভেবে মরছি — গাড়ির তলায় পড়ে আপদ গেল নাকি বদ্ লোকে উঠিয়ে নিয়ে গেল ? আর দেখ — এখানে কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে ! চল্ চল্ এখনি . . .'। প্রথম চমকানিটার পর ছেলেটার হতভম্ব ভাবটাও কাটতে সময় পেলনা, তার মা তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল । অর্দ্ধেক আঁকা ছবিটা চেয়ারের উপর তেমনিই পড়ে রইল ।

ঘটনার শেষটুকু স্টেজের উপর থেকে অলকেশের চোখে পড়েছিল । কৌতুহল বশতঃ সে এগিয়ে এসে চেয়ারের উপর থেকে ছবিটা তুলে নিল । অলকেশ শিল্পী নয় — তবুও পেন্সিলে আঁকা সেই ছবিটা দেখে তার মনে হল খুদে শিল্পীটি এঁকেছে ভাল । সে ছবিটা নিয়ে গিয়ে মন্ডপের একধারে বসে থাকা শিবতোষকে দেখাল । শিবতোষ ছবিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন, তারপর বলে উঠলেন — 'অপূর্ব, অসাধারণ ! এ তো একেবারে জাত শিল্পী ! কত বড় বাচ্চাটা ? এবারের পুরস্কারটা এই পাবে !' আমতা আমতা করে অলকেশ বলল — 'কিন্তু পুরস্কার দেবেন কাকে ? কাগজে তো নাম-ধাম কিছুই নেই !' ঘটনাটা যতটুকু যেরকম দেখেছে সেটা সে শিবতোষকে জানাল । শিবতোষ কাঁচা পাকা চুলে ভরা মাথাটা একটু একটু দোলালেন — মুখে মৃদু হাসি, বললেন — 'এই ছবিই একদিন ওকে নাম-ধাম সব দেবে । রেখে দাও স্কেচ্‌টা; আমি ঠিক খুঁজে পাব ওকে ! প্যান্ডেলে যখন অন্য ছবিগুলো টাঙ্গাবে, তখন সবার উপরে এই ছবিটা রেখো ! ও আসবে, ঠিক আসবে !'

আঁকা জায়গায় অলকেশ ছাড়া আরও দুজন ভলান্টিয়ার ছিল — তনুশ্রী বাচ্চাদের আঁকা ছবিগুলো সংগ্রহ করে টেবিলের উপরে থাকে থাকে গুছিয়ে রাখছিল । অলকেশ পেন্সিলে আঁকা অনামী ছবিটা তনুশ্রীর হাতে দিয়ে বলল — 'শিবতোষদা এই ছবিটা অন্য ছবিগুলোর সাথে রাখতে বলেছেন । এটাকে যত্ন করে রেখে দাও !' ইতিমধ্যেই কেউ একজন তনুশ্রীকে স্টেজের অন্য দিকটায় ডাকল । একটা থাকের সব চেয়ে উপরে নামধামহীন ছবিটা রেখে দিয়ে তনুশ্রী অন্যদিকে চলে গেল । পিন্টু এবার ছবিগুলো বিচারকদের কাছে জমা করার জন্য এগিয়ে এলো । সবার উপরে রাখা পেন্সিল স্কেচ্‌টা উল্টে-পাল্টে দেখে সে ভাবল — 'এতে তো নাম-ঠিকানা কিছুই নেই; এটা এখানে কে রাখলো !' ছবিটা সে অপ্রয়োজনীয় কাগজের টুক্‌রো মনে করে নীচে ফেলে দিলো ! কাগজটা উড়ে গিয়ে দু-সারি চেয়ারের মাঝের ধুলোমাটি ভরা যাতায়াতের পথটার উপর পড়ল ! স্টেজের অন্য দিক থেকে দেখতে পেয়ে তনুশ্রী চেঁচিয়ে উঠল — 'পিন্টু, ওই কাগজটা ফেলিস্ না !' কিন্তু মাইকে তখন ঘোষণা শুরু হয়েছে — 'একটু পরেই রিলে রেস্ শুরু হবে, বাচ্চারা তাড়াতাড়ি খেলার জায়গায় চলে এস !' পিন্টু তনুশ্রীর কথা ঠিক মতো শুনতে না পেয়ে কানের কাছে হাত নিয়ে জিজ্ঞাসা করল — 'কি রে, কি বলছিস্ ?' কিন্তু রিলে রেসের ঘোষনা শেষ হতে না হতেই পুজোমন্ডপে দুম্-দুমা-দুম্ ঢাকের বাদ্যি বেজে উঠল, আর সেই আওয়াজে তনুশ্রীর উত্তর চাপা পড়ে গেল ! ছবিটা বাঁচাতে সে তড়ি-ঘড়ি পিন্টুর দিকে আসছিল, কিন্তু তার আগেই সেই ছবিটার উপর দিয়ে অনেকগুলো জুতো-চটি পরা ছোট-ছোট পা ছুটে চলে গেল । ছেঁড়া ফাটা নোংরা কাগজের মধ্যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন উদ্‌ভ্রান্ত রমণী মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল !

— গল্প —

আজকের শ্যামা

সুজয় দত্ত

[আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ যদি একবিংশ শতাব্দীর মানুষ হতেন, তাহলে কি 'শেষের কবিতার' প্রথম লাইনটি ''অমিত রায় ব্যারিস্টার'' না হয়ে হতো ''অমিত রায় সফ্‌ট্‌ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার''? তাঁর ''মাধুরীলতার চিঠি'' কি হয়ে যেত ''মাধুরীলতার ইমেল''? চন্ডালিকা কি সোশ্যাল মিডিয়াতে জাতভেদ আর শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের ডাক দিত ? আর চিত্রাঙ্গদা কি ফেস্‌বুক বা ইন্‌স্টাগ্রামে অর্জুনের ছবি পোস্ট করে বিউটি পার্লারে ছুটত 'কুরূপা' থেকে 'সুরূপা' হবার জন্য ? রবীন্দ্রসাহিত্যের এই অতি-পরিচিত মণিমাণিক্যগুলিকে আধুনিকতার আলোয় নতুন করে দেখতে কেমন লাগে, তারই একটি নমুনা এই গীতিনাট্য — আজকের শ্যামা।]

কলকাতা মহানগরী । কবির মানসপটে কল্লোলিনী, তিলোত্তমা । এই শহরের আনাচে কানাচে যত হাসি আর যত গান আছে, আশাভঙ্গের আর সব-হারানোর বিয়োগান্ত চিত্রনাট্যও তার চেয়ে কম কিছু নেই । কত স্বপ্নের রোদ ওঠে এই বুড়ো শহরে, কত স্বপ্ন মেঘে ঢেকে যায় — কে তার হিসেব রাখে আর ?

(গান) গড়িয়াহাটার মোড়, মিনি মিনি বাস বাস,
বাসের টার্মিনাসে মনমরা সারি সারি মুখ-চোখ-নাক-হাত
রোগা-রোগা চেহারার কন্ডাক্টার সব আমাদের জন্য — সব আমাদের জন্য ।
চৌরঙ্গীর আলো এবং লোডশেডিং, পার্কস্ট্রীট্ জমকালো, কাগজে হেডিং —
আমাদের জন্য — সব আমাদের জন্য ।
বেদম ট্রাফিক জ্যাম, ঠান্ডা সালামী, হ্যাম্, চকোলেট, ক্যাড্‌বেরি, মাদার ডেয়ারী —
আমাদের জন্য — সব আমাদের জন্য ।
বাজারের দরাদরি, রুটি-ভাত-তরকারি, সা-নি-ধা-পা-মা-গা-রে-সা, মাদার টেরেসা —
আমাদের জন্য — সব আমাদের জন্য ।

এই কাহিনীর মূল প্রেক্ষাপট কলকাতা, কিন্তু আসল গল্পের শুরু সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে — বিলেতে । খ্যাতনামা শিল্পপতি ও উদ্যোগপতি বজ্রমণি সেন তাঁর দীর্ঘদিনের লন্ডন-বাসে হঠাৎ ইতি টেনে ঠিক করলেন কলকাতায় ফিরে আসবেন । সবাই জানলো ব্রেক্সিট-পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা আর ব্রিটেন-সহ সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে অভিবাসন-বিরোধী হাওয়াই এর কারণ । আসলে কিন্তু এই সিদ্ধান্তের পিছনে গভীরতর, গূঢ়তর কারণটি একান্তই ব্যক্তিগত । সম্প্রতি তাঁর বহু বছরের জীবনসঙ্গিনী এলিজাবেথ স্পেন্সারের সঙ্গে তিক্ত বিচ্ছেদের পর যে গভীর শূন্যতাবোধ তাঁকে গ্রাস করেছে, তা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় দূরে, অনেক দূরে কোথাও চলে গিয়ে সবকিছু নতুন করে শুরু করা । নিজের অতীত থেকে পালিয়ে বাঁচতে চান তিনি — জীবনের চাওয়া-পাওয়ার হিসেবগুলো আবার নতুন করে কষতে চান ।

(গান) যা পেয়েছি আমি তা চাই না । যা চেয়েছি কেন তা পাই না ?
ছেঁড়া ছেঁড়া ফুলে গাঁথা মালা খুলে পুরোনোকে কেন ভুলে যাই না ?
পথের বাঁকে এসে মনে হলো, অতীতটা হয়ে যাক দূর —
চলবো এগিয়ে তবু বুকের বাঁশীটাতে বাঁধবো নতুন এক সুর ।

ভালোবাসা যায়, আলো-আশা পায় — সেই গান কেন গাই না ?

আজকে যা ভালো লাগে, হয়তো আবার বদলে যেতেও পারে কাল —
ঝরিয়ে মরা পাতা ফোটাবে নতুন কুঁড়ি শুকনো গাছের কোনো ডাল।
সুখস্বপ্নের, সুরছন্দের কেন ময়ূরপঙ্খী বাই না ?
যা পেয়েছি আমি তা চাই না। যা চেয়েছি কেন তা পাই না ?

কলকাতার আধুনিক তরুণ সমাজের একজন হয়েও চালচলনে, ভাবভঙ্গীতে আর জীবনযাত্রায় তাদের থেকে একটু আলাদা লেক্ গার্ডেন্সের শ্যামলিকা রায়। চোখ-ঝলসানো না হলেও যথেষ্ট রূপসী আর গানের গলাটা সত্যিই অসাধারণ। ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্ কমিউনিকেশনে ডিগ্রী করার পর জার্নালিজম্ নিয়ে ক্যারিয়ার তৈরী করার ইচ্ছেটা অপূর্ণ রয়ে গেছে। তার বদলে ওর এখন এক ব্যস্ত কণ্ঠশিল্পীর জীবন। রাতদিন এখানে প্রোগ্রাম, ওখানে অডিশন, সেখানে রিহার্সাল। এতো কিছুর মধ্যে আর কতকগুলো জিনিস নিয়ে তেমন ভাবার সময় নেই। যেমন প্রেম-ভালবাসা, বিয়ে, সংসার। তবু মাঝে মাঝে একাকী নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলোতে মনে হয়, কবে একরাশ টাটকা হাওয়ার মতো কেউ এসে ওর জীবনে ছড়িয়ে দেবে ফুলের সৌরভ — ওর হাতদুটো ধরে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে রূপকথার স্বপ্নরাজ্যে ? কতদিন, আর কতদিন অপেক্ষায় থাকতে হবে সেই বিশেষ মানুষটির জন্য ?

(গান) আরো কত দিন আমি খুঁজেছি তোমাকে
জানিনা যদি ভুল হয়ে থাকে
খুঁজেছি তোমাকে, আঁধারে আলোকে
স্বপ্নমুখর রাতে, তন্দ্রাহারা প্রাতে
জীবনেরই সংঘাতে, শূন্যতারই ফাঁকে।
তোমারি প্রতীক্ষায়
কখনো ঝায়, মৌন সন্ধ্যায় রয়েছি অন্ধ আশায়।
অন্তহীন এই পথে চলেছি কোনোমতে
জানিনা ভবিষ্যতে ডাকবে কি আমাকে ?

শ্যামলিকার ঠিক নজরে পড়েনি, কিংবা পড়লেও গুরুত্ব দেবার মতো মনে করেনি, কিন্তু কলেজ জীবন থেকেই ওর এক নীরব গুণমুগ্ধ ছিল। ইতিহাস অনার্সের ছাত্র উত্তীয় মুখার্জী। স্বভাবলাজুক, মিতবাক, পরোপকারী ছেলেটি একসময় প্রগতিশীল ছাত্র-রাজনীতি করত, এখন কলকাতা শহরের অসংখ্য শিক্ষিত বেকারের একজন। রোজগার বলতে সামান্য কটা ট্যুইশন। অনেকবার ভেবেছে প্রেয়সীকে সাহস করে মনের কথাটা বলে দেবে — মুখোমুখি না হোক, চিঠিতে। কিন্তু — কিন্তু তার প্রত্যুত্তর যদি হয় তাচ্ছিল্য বা রূঢ় প্রত্যাখ্যান ? সহ্য করতে পারবে ? না না, তার চেয়ে বরং দূর থেকেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে যাবে ওকে আর করে যাবে অনন্ত প্রতীক্ষা।

(গান) আমি দূর হতে তোমারেই দেখেছি
আর মুগ্ধ এ-চোখে চেয়ে থেকেছি।
বাজে কিঙ্কিণী রিনিঝিনি, তোমারে যে চিনি-চিনি
মনে মনে কত ছবি এঁকেছি।
ছিল ভাবে ভরা দুটি আঁখি চঞ্চল,
তুমি বাতাসে উড়ালে ভীরু অঞ্চল,
ওই রূপের মাধুরী মোর সঞ্চয়ে রেখেছি।

বৈশাখের এক তপ্ত বিকেলে এক বিরল অবসরের মুহূর্তে শ্যামলিকা গেল তার বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে। বন্ধু উচ্চবিত্ত পরিবারের অতি-আধুনিক মেয়ে, অতএব তার পার্টিতে হ্যালো-হাই, স্যুট-বুট-টাই আর দামী বিদেশী অ্যাল্‌কোহলের ছড়াছড়ি — সে আর আশ্চর্য কী ? নিয়মমাফিক শুভেচ্ছা বিনিময়পর্ব সেরে চায়ের পেয়ালা হাতে শ্যামলিকা সেই বিরাট হলঘরের এক নিরালা কোণ খুঁজে নিয়ে দাঁড়ায়। আর ঠিক তখনি নজরে পড়ে জানলার ধারে সোফায় হেলান দিয়ে একা বসে থাকা দীর্ঘকায়, সুদর্শন মানুষটির ওপর। হাতে সোনালি পানীয়ের গ্লাস, দৃষ্টি জানলার বাইরে আকাশের দিকে, চারপাশের উচ্চকিত কোলাহল যেন স্পর্শ করছে না তাকে। কী যেন একটা আছে সেই সৌম্যকান্তি চেহারার মধ্যে — চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েও পারেনা শ্যামলিকা। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে —

'অ্যাই, ওটা কে রে ?'

'ওমা, তুই জানিস না ? বজ্রমণি সেন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট অ্যান্ড অন্ত্রপ্রেনিওর। সবে কয়েক মাস হল লন্ডন থেকে এসেছেন কলকাতায়, এর মধ্যেই কলকাতার বিজ্‌নেস সার্কলে রাইজিং স্টার। চল, আলাপ করবি ?' 'সো, মিস্টার সেন, এন্‌জয়িং ইয়োরসেল্‌ফ্‌ ? কেয়ার ফর অ্যানাদার ড্রিংক ?'

'নো, থ্যাংক ইউ।'

'আলাপ করিয়ে দি। ইনি মিস্টার বজ্রমণি সেন, স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। এঁর কথা তো তোকে আগেই বলেছি। মিস্টার সেন, এ আমার কলেজের বন্ধু শ্যামলিকা রায়। কলকাতার টপ্‌ ভোকাল আর্টিস্ট-দের একজন। ফোক্‌, আধুনিক, জীবনমুখী, লাইট্‌ ক্লাসিকাল — সবেতেই অসাধারণ।'

'ধ্যাৎ, বাড়াবাড়ি করিস না তো !'

'হোয়াট্‌ ডু ইউ মীন বাই বাড়াবাড়ি ? একটুও এক্সাজারেট করিনি। জানেন মিস্টার সেন, ও টলিউড্‌-এ প্লেব্যাকের অফার পেয়েছে। ওর লেটেস্ট সিডিটা বেস্ট্‌সেলার লিস্টে উঠেছে।'

'দ্যাট্‌স্‌ গ্রেট ! বিদেশে থাকলেও বাংলা গানের নেশাটা কিন্তু আমি ছাড়িনি। ভালোই হল আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে।'

'থ্যাংক্‌ ইউ সো মাচ্‌। সামনের মাসেই উত্তম মঞ্চে আমার একটা সোলো পার্ফর্মেন্স আছে। আসুন না — মানে যদি সময় পান আর কি। খুব খুশি হব এলে —'

'থ্যাংক্‌স্‌। চেষ্টা করব।'

সেদিন পার্টি থেকে ফেরার পথে শ্যামলিকার শরীর-মন জুড়ে এক অদ্ভুত শিরশিরে অনুভূতি। আচমকা এক বৈশাখী সন্ধ্যায় এই যে এক ঝলকের একটু দেখা — এর পর কী আছে চিত্রনাট্যে ?

(গান) এক বৈশাখে দেখা হলো দুজনায়,
জষ্ঠিতে হলো পরিচয়,
আসছে আষাঢ় মাস, মন তাই ভাবছে
কী হয় কী হয়। কী জানি কী হয় !
তখনি তো হলো দেখা, যেই না নয়ন কিছু চেয়েছে।
জানাজানি হয়ে গেছে অধর যখনি কথা পেয়েছে।
জানিনা তো কী যে হবে এরপরে কিছু পেলে এ-হৃদয়।
আসছে আষাঢ় মাস, মন তাই ভাবছে
কী হয় কী হয়। কী জানি কী হয় !

আষাঢ় মাসে যেটা হল, তার জন্য শ্যামলিকা মোটেই তৈরী ছিল না । কলকাতার বাণিজ্যমহলও হতবাক ! জাঁদরেল শিল্পসংস্থা কুপার, সেন অ্যান্ড্ অ্যাসোসিয়েট্স্-এর মধ্যকলকাতার অফিসে হঠাৎ সি বি আই হানা । জনৈক কর্মচারীর রহস্যজনক মৃত্যু ও সেই সংক্রান্ত নথিপত্র লোপের অভিযোগে সংস্থার কর্ণধার বজ্রমণি সেন সহ বেশ কয়েকজন রাঘববোয়াল গ্রেফতার এবং জামিনে মুক্ত । সংবাদ মাধ্যমের কাছে শ্রী সেনের যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার । তাঁর দাবী, এসব তাঁর চরিত্রহননের এবং সংস্থার নামে কালিমালেপনের এক গভীর চক্রান্ত । বুদ্ধিজীবী মহলে কানাঘুষো, রাজ্যে শিল্পস্থাপনের ব্যাপারে ক্ষমতাসীন দলের অন্যায় দাবীদাওয়া মেনে না নিয়ে তাদের সঙ্গে সংঘাতে যাওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন বলেই তিনি আজ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার । শ্যামলিকা শোনে আর ভেতরে ভেতরে অসহায়ভাবে ছটফট করে । এ অন্যায়, এ মিথ্যে, এ ভুল, এ হতে পারে না । গত দুমাস ধরে যে মানুষটাকে সে কাছ থেকে দেখেছে, ভালোবেসেছে, সে কিছুতেই এরকম করতে পারে না — কিছুতেই না । এই বিশ্রী বিপদটা থেকে এখন কী করে উদ্ধার পাওয়া যায় ? কে বাঁচাতে পারে এই পরিস্থিতিতে ? কে ? ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই তার হাত চলে যায় ফোনে । আঙুলগুলো ডায়াল করতে থাকে উত্তীয়ের নম্বর ।

'আরে, শ্যামলী, তুই ! হঠাৎ ! আমি তো ভাবতেও পারছি না'

'দিন কুড়ি আগে তোর একটা চিঠি পেলাম । বেশ লিখেছিস তো ! অবশ্য লেখার হাত তোর বরাবরই ছিল ।'

'ব্যস্, এই ? এ তো চরৈবেতি আর একুশ শতক ম্যাগাজিনের এডিটর্রাও বলে ।'

'আর কী শুনবি এক্সপেক্ট করেছিলি ?'

'কেন, চিঠিটা তুই — চিঠিটা তুই শেষ অবধি পড়িসনি ? দোজ্ আর মাই রিয়েল ফিলিংস্, শ্যামলী ।'

'ওসব ছেঁদো কথা বলা খুব সোজা রে । কাউকে সত্যিকারের ভালোবাসতে গেলে সাহস লাগে, স্যাক্রিফাইস্ করতে হয়। ভালোবাসা তো আর ফ্রী লা' নয় ।'

'ঠিক আছে, মেনে নিলাম সাহস আমার কম । তোর সেই — কী যেন নাম — সম্রাট আর শৌনকের মতো ক্যাম্পাস লনে বা রাস্তাঘাটে গলা জড়িয়ে ধরে চুমু-টুমু আমি খাইনি কখনো । কিন্তু স্যাক্রিফাইস্ ? পরীক্ষা নিতে চাস ? খাঁটি, নিখাদ ভালবাসার শক্তিকে তুই কিন্তু আন্ডার্এস্টিমেট্ করছিস শ্যামলী ।'

'তাই ? কী স্যাক্রিফাইস্ করতে পারিস তুই আমার জন্য ?'

'সব, সব, আমার যেটুকু যা আছে সব । তোকে একটা দিন, একটুক্ষণ নিজের করে পাওয়ার জন্য আমি নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে পারি —'

'হুঁঃ, এ কি সেই তোর পার্টির স্লোগান — জনগণ, তোমাদের স্বর্গের পারিজাত আর সমুদ্রমন্থনের অমৃত দেব, শুধু একবার আমায় ভোটটা দাও ?'

'আমাকে নিয়ে ছেলেখেলাটা তোর আর নতুন কি ? শুধু এটুকু বলতে পারি, তোকে খালি হাতে ফেরাবার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনা ।'

'(হেসে) ও কে, ও কে, দেখা যাবে । আপাততঃ একটা সমস্যায় পড়েছি, বলছি তোকে শোন ।'

শ্যামলিকা বলতে থাকে আর উত্তীয়র শরীর, মন, সমস্ত সত্তা জুড়ে যেন বাজতে থাকে একটি গান

(গান) শুধু একদিন ভালোবাসা, মৃত্যু যে তারপর, তাও যদি পাই —
আমি তাই চাই ।

চাইনা বাঁচতে আমি প্রেমহীন হাজার বছর।
যদি ও-চোখে রোশনি জ্বালো শুধু একবার,
আমি তাতেই পোড়াতে রাজি যা কিছু আমার,
আমি চাইনা দেখতে ওই প্রাণহীন চোখের পাথর।
চাইনা বাঁচতে আমি প্রেমহীন হাজার বছর।

কাগজে কাগজে, টিভির চ্যানেলে-চ্যানেলে নিউজ্ ফ্ল্যাশ — কুপার, সেন অ্যান্ড্ অ্যাসোসিয়েট্স্-এর অধিকর্তা বজ্রমণি সেন বেকসুর খালাস। পুলিশ খুনীকে ধরতে পেরেছে। অথবা বলা ভালো, খুনী নিজেই আত্মসমর্পণ করেছে। বছর তিরিশের যুবকটি আর পাঁচটা ক্রিমিনালের মতো নয়, যথেষ্ট শিক্ষিত। পুলিশ এখন তাকে লক্-আপে রেখে জেরা করছে। সে পুলিশের কাছে কবুল করেছে, বছরের পর বছর বেকারিত্বের জ্বালায় জেরবার হয়ে কুপার, সেন অ্যান্ড্ অ্যাসোসিয়েট্সের সেই উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছে গিয়েছিল যাহোক একটা চাকরির আর্জি নিয়ে। কিন্তু যখন দেখল তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে সেই ব্যক্তি তাকে প্রতারণা করল, তীব্র ঘৃণা আর আক্রোশ সামলে রাখতে পারেনি। তাই এই খুন। লালবাজার থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বাড়ি যাওয়ার পথে বেজে উঠল বজ্রমণি সেনের মোবাইল। ওপ্রান্তে শ্যামলিকা।

'কন্গ্র্যাচুলেশন্স্! খবরটা শুনে অবধি এতো খুশী-খুশী লাগছে যে কী করবো ভেবে পাচ্ছিনা। তুমি আজ কীভাবে সেলিব্রেট্ করছো, বজ্র?'

'সেলিব্রেট্? ডোন্ট ফিল্ লাইক ইট অ্যাট অল্। পুরো জীবনটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল আবার। তুমি ঠিক বুঝবে না। তোমার তো সাজানো-গোছানো, সুন্দর জীবন।'

'তাই? বেশ তো, তোমার জীবনটাও সুন্দর করে সাজিয়ে দিচ্ছি।'

'আই সী! থ্যাংক্স্ ফর্ দি অফার। ইট্ মীন্স্ এ লট্ টু মি। কিন্তু নাঃ, আমার জীবন সাজিয়ে আর সময় নষ্ট কোরো না। বরং যার সঙ্গে জীবন কাটাবে, reserve all your senses of beauty and aesthetics for that lucky guy.`

'লাকি গাই বলছো? তাকে অবশ্য তুমি ভালো করেই চেনো।'

'রিয়েলি? কে সে?'

'জানোনা? বুঝতে পারোনা তুমি? পড়তে পারোনা আমার মনের ভাষা?'

(গান) আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাবো,
হারিয়ে যাবো আমি তোমার সাথে।
সেই অঙ্গীকারের রাখী পরিয়ে দিতে
কিছু সময় রেখো তোমার হাতে।
কিছু স্বপ্নে দেখা, কিছু গল্পে শোনা,
ছিল কল্পনাজাল এই প্রাণে বোনা,
তার অনুরাগের রাঙা তুলির ছোঁয়া
নাও বুলিয়ে নয়নপাতে।

এর বেশ কিছুদিন পরে এক অলস সন্ধ্যায় নিজের ফ্ল্যাটে নতুন শেখা হানি-গ্লেজড্ চিকেনের রেসিপিটা ঝালিয়ে নিচ্ছিল শ্যামলিকা। সামনেই বজ্রর জন্মদিন, ওকে খাইয়ে তাক লাগিয়ে দেবে। এমন সময় বেজে উঠল ফোন।

'আরেঃ, বজ্র ! একেই বলে টেলিপ্যাথি। এক্ষুণি তোমার কথা ভাবছিলাম। সেদিন তোমার নতুন বাড়ীর ড্রয়িং রুম আর বেড্রুমের জন্য যে পর্দার ডিজাইন্টা বেছেছিলাম, on second thoughts, সেটা একটু —'

'ওসব কথা থাক। লেট্স্ গেট্ টু দ্য পয়েন্ট। আচ্ছা, তুমি উত্তীয় মুখার্জী বলে কাউকে চেনো ? বা চিনতে ?'

'ন্-না তো, ওরকম নামের কাউকে তো কখনো —'

'চেনো না ? স্ট্রেঞ্জ ! ফার্স্ট অফ্ অল্, কিছুদিন আগেই ওর নাম মিডিয়ায় চালাচালি হচ্ছিল, when he surrendered to the police confesing to the murder of our employee. Secondly, কাল আমার অফিসে ওর মা এসেছিলেন ওর ভাইয়ের চাকরির জন্য তদ্বির করতে। She said that you were close to him? In fact, ও পুলিশের কাছে যাওয়ার আগে ওর রাইটিং প্যাডে যে unfinished letter টা রেখে গেছে, তাতে পরিষ্কার লেখা আছে — শ্যামলী আমার, আমি তোকে দেওয়া কথা রাখতে যাচ্ছি, ভালো থাকিস।'

'বজ্র, বজ্র, ওয়েট্ আ মিনিট্, আই ক্যান্ এক্সপ্লেন —'

'এক্সপ্লেন হোয়াট ?'

'বজ্র, বজ্র, বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি — তোমাকে আমি —'

'হা হা, একটা জিনিস আমি খুব ভালো করে শিখেছি, জানো, থ্রুআউট্ মাই লাইফ্। যারা এই ''বিশ্বাস করো'' কথাটা বলে, তাদের বিশ্বাস করলেই ঠকতে হয়। এনিওয়ে, গুড্ নাইট।'

ওপ্রান্তে ফোন রেখে দেওয়ার শব্দ হয়। শ্যামলিকার বিধ্বস্ত হৃদয় তখন হাহাকার করে শুধু একটা কথাই বলছে —

(গান) না, যেও না।
রজনী এখনো বাকি, আরো কিছু দিতে বাকি,
বলে রাতজাগা পাখি — না, যেও না।
আমি যে তোমারি শুধু জীবনে মরণে
ধরিয়া রাখিতে চাহি নয়নে নয়নে।
না, যেও না।

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, ক্যালেন্ডারে মাসের পাতা উল্টে উল্টে যায়। শ্যামলিকা উথালপাথাল মন নিয়ে একের পর এক ফোন করে যায় বজ্রর মোবাইলে, ল্যান্ডলাইনে। অপরপ্রান্তে কেউ তোলে না সে ফোন। ইমেল্গুলো বাউন্স্ ব্যাক্ করা শুরু করল আনডেলিভারেব্ল্ হয়ে। বজ্রর নতুন বাড়ীতে ওর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করবে বলে যতবার গেছে, গেটে মোতায়েন করা নিরাপত্তা-রক্ষী ''সাহেব কলকাতায় নেই'' বলে ফিরিয়ে দিয়েছে। অবশেষে একদিন হঠাৎ শ্যামলিকার ঠিকানায় এলো একটা রেজিস্ট্রি করা চিঠি। From-এর জায়গায় লেখা বজ্রমণি সেন। সংক্ষিপ্ত সে-চিঠি, বক্তব্য খুব সহজ — Don't bother me. Leave me alone.

(গান) আমাকে আমার মতো থাকতে দাও
আমি নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিয়েছি
যেটা ছিলোনা ছিলোনা — সেটা না-পাওয়াই থাক

সব পেলে নষ্ট জীবন।
তোমার এই দুনিয়ার ঝাপ্‌সা আলোয়
কিছু সন্ধ্যের গুঁড়ো হওয়া কাঁচের মতো
যদি উড়ে যেতে চাও, তবে গা ভাসিয়ে দাও —
দূরবীনে চোখ রাখব না, না, না।
এই জাহাজ-মাস্তুল ছারখার, তবু গল্প লিখছি বাঁচবার।
আমি রাখতে চাইনা আর তার কোনো রাতদুপুরের আব্দার।
তাই চেষ্টা করছি বারবার সাঁতরে পার খোঁজার।

এমনি করেই এসে গেলো আরেক বৈশাখ। বজ্রর সঙ্গে শ্যামলিকার প্রথম আলাপের বর্ষপূর্তি। ব্যস্ত কর্মসূচী থেকে দিনটা অফ্ নিয়ে নিভৃতে আত্মমগ্ন হয়ে স্মৃতিতে ডুব দেয় শ্যামলিকা। এই এতো মাস ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে বজ্রর স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে — দিনে আঠেরো ঘন্টা কাজে ডুবিয়ে রেখেছে নিজেকে, তাতে ফল না হওয়ায় অ্যাল্‌কোহলে ডুবে গেছে কখনো কখনো। কিন্তু ঐ নিষ্ঠুর লোকটা — যে ওর জীবনে মুহূর্তের রোশনাই জ্বেলে এক ফুৎকারে সবকিছু নিভিয়ে অন্ধকার করে দিল — তাকে ভুলতে পারে নি। কতদিন, আরো কতদিন এই দুঃসহ স্মৃতির বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে তাকে ?

(গান) তুমি চলে গেলে, আমার বলার কিছু ছিল না।
না গো, আমার বলার কিছু ছিল না।
চেয়ে চেয়ে দেখলাম তুমি চলে গেলে,
তুমি চলে গেলে, চেয়ে চেয়ে দেখলাম —
আমার বলার কিছু ছিলনা।
সবকিছু নিয়ে গেলে যা দিয়েছিলে —
আনন্দ-হাসি-গান — সব তুমি নিলে।
যাবার বেলায় শুধু নিজেরই অজান্তে
স্মৃতিটাই গেলে তুমি ফেলে।
তুমি চলে গেলে — আমার বলার কিছু ছিলনা।

কাগজে আবার হেড্‌লাইন — কুপার, সেন অ্যান্ড্ অ্যাসোসিয়েট্‌স্ কলকাতার পাততাড়ি গুটিয়ে ঘাঁটি গাড়ছে সিঙ্গাপুরে। রংচঙে সিনেমা-পত্রিকার এক কোণে ছোট করে খবর — সাড়াজাগানো নতুন পরিচালক ঋদ্ধিমান বসুর প্রথম হিন্দী ছবির প্লেব্যাক্ করতে মুম্বাই যাচ্ছেন শ্যামলিকা রায়। না, এর পর আর কোনো নাটকীয় মিলনান্তক মোড় নেই এই গল্পে। কিছুটা একশো বছর আগের সেই গীতিনাট্যের মতোই দুটো ট্রেন দুটো বিপরীতমুখে ছুটল। মিলিয়ে গেল নিজ-নিজ আলোকবৃত্তে। আর শেষ হল আমাদের এই কাহিনী।

— অনুবাদ —

মীরের শের থেকে

ধীমান চক্রবর্তী

উর্দূ ভাষার শায়েরদের মধ্যে অষ্টাদশ শতকে মীর তকী মীর, উনবিংশ শতকে মির্জা গালিব, ও বিংশ শতকে ইকবাল-এর শ্রেষ্ঠত্ব মোটামুটি সর্বজনস্বীকৃত । সর্বকালের সেরাদের মধ্যে মীরের আসন সম্ভবত গালিবের পরেই (মতান্তরে, পাশে) । জন্ম আগ্রায় ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে । কৈশোরে পিতৃবিয়োগ । অধ্যাত্মজ্ঞানপিপাসু সুফি দরবেশ পিতার ঈশ্বর-চিন্তার প্রভাব মীরের রচনায় স্পষ্ট । কবিজীবনের প্রথমটা কাটে মোগল সাম্রাজ্যের পড়ন্ত বেলায় টালমাটাল দিল্লিতে ও আগ্রায়, পরে লখনউ-তে । মীরের (এবং পরে গালিবেরও) প্রাণের শহর দিল্লি প্রথমে পারস্যসম্রাট নাদের শাহ্-এর আক্রমণে (১৭৩৯), তারপর আহমদ শাহ আবদালি এবং জাঠ দস্যুদের বারংবার নৃশংস হানায় — নির্বিচার হত্যায়, ব্যাপক লুটপাটে — শ্মশানে পরিণত হ'ল । তৎকালীন দুনিয়ার অন্যতম সেরা রাজধানীর এই করুণ পরিণতি কবির মনে গভীর রেখাপাত করে । মীরের জীবনে তৃতীয় উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখে দিল্লির তবায়েফরা, যাদের তুলনা করা চলে সমসাময়িক ইয়োরোপের courtesan দের সঙ্গে; এবং আরও কিছু অপূর্ণ নারীপ্রেম । চতুর্থ, একাধিক প্রিয়জনবিয়োগ । এসবের দরুণ যৌবনের কিছুটা কাটে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় । পরবর্তী জীবনেও তার, এবং শারীরিক-মানসিক-আর্থিক দুর্ভোগ ও নিরাপত্তার অভাবের ছাপ পাওয়া যায় কবির খিটখিটে মেজাজে ও লেখায় । অথচ মীরের রচনার ভাবসমৃদ্ধির মূলেও এইসব নিপীড়নের অবদান অনস্বীকার্য । তাঁর শের-এ দর্শন, প্রশ্ন, নালিশ, স্তুতি, আবেদন, শলা-সমালোচনার লক্ষ্য কখনও ঈশ্বর, কখনও কাঙ্খিতা নারী, কখনও ভাগ্য, কখনও সমাজ, কখনও রসিকজন, কখনও তিনি নিজেই । কখন কোনটা, তা কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট ।

মীর শের রচনা করেছেন সাড়ে তেরো হাজারেরও বেশি । কৃতী সাহিত্যিক স্বর্গত শ্রী আবু সয়ীদ আইয়ুব তা থেকে ১৩৮টির মূল (বাংলা হরফে) এবং স্বকৃত বাংলা অনুবাদ তাঁর ''মীরের গজল থেকে'' বইটিকে দিয়েছেন । আমি আবার সেগুলি মূল থেকে নিজের মতো পুনরনুবাদ করে, তার কয়েকটি বেছেছি ''বাতায়ন'' এর এই সংখ্যার জন্য । পুনরনুবাদ কেন ? শ্রী আইয়ুবের মাতৃভাষা উর্দূ, আবার বাংলা সাহিত্যেও তিনি অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী । মীরের শের অনুবাদের কাজটি তিনি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গেই করেছেন । কিন্তু, উর্দূ শের-এর পরিবেশনরীতি বাংলায় অপ্রচলিত । ফলে, মূল রচনার মেজাজ ও আবেদন অনুবাদে ধরা অসম্ভব । এই ক্ষতি অন্যভাবে পুষিয়ে নেবার চেষ্টায় আমি অনেক ক্ষেত্রে বাংলায় প্রচলিত অন্তমিল, ছন্দ ও মাত্রা ব্যবহার করেছি, যেটা শ্রী আইয়ুব করেননি । যেমন ১ নম্বর শেরটি মূল উর্দূতে :

উসসে ঘবরাকে যো কুছ কহনে পে আজ আতা হুঁ // দিলকি ফির দিলমে লিয়ে চুপকে চলা যাতা হুঁ ।।

শ্রী আইয়ুব এর বঙ্গানুবাদ :

বড় ব্যাকুল হয়ে তার কাছে যাই কিছু বলবার জন্য // কিন্তু মনের কথা মনে নিয়েই চুপি চুপি ফিরে আসি ।

২২ নম্বরের মূল :

হোতা হ্যা শওক ওয়স্ল কা ইনকার সে জ্যাদা // কব তুঝসে দিল উঠাতে হ্যাঁ তেরী নহী সে হম ?

শ্রী আইয়ুব :

প্রত্যাখ্যান তো মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়েই তোলে । // তোমার ''না'' শুনে কবেই বা আমার হৃদয়কে ফিরিয়ে নিই ?

২৮ নম্বরের মূল :

দিলকে উলঝাওকো ক্যা তুঝতে কহুঁ অ্যায় নাসেহ, // তু কিসি জুলফকে ফন্দেমে গিরফতার নহী ।।

শ্রী আইয়ুব :

হায় উপদেষ্টা বন্ধু, আমার হৃদয়ের সমস্যা তোমাকে আর কি বলব ? // তুমি তো কারুর কেশজালের কুন্ডলীতে ধরা পড়নি ।।

সব কটি শের-এর মূল উর্দূ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, তাই উল্লেখ হিসাবে শ্রী আইয়ুব-এর বইটি ব্যবহার করলাম । সেটি সংগ্রহ করতে অসমর্থ কোন পাঠক যদি মূল জানতে আগ্রহী হন, তবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ।

স্বরচিত একটি শের দিয়ে অবতরণিকা শেষ করি :

ভিখারি মীরের দৈন্যের কথা জানে দুনিয়ার লোক;
প্রেম যাচনায় লজ্জিত হ'তে হ'লে আর কেউ হোক ।

ক্রমিক সংখ্যা (আইয়ুব : পর্ব-ক্রমিক সংখ্যা, মূল / অনুবাদ পৃষ্ঠা)

১ (১-৫,৭৪/৩৬)
যা কিছু বলব ভেবে আজ তার নিকটে এসেছি ছুটে,
মনের সে কথা মনে র'য়ে গেল, বেরুল না মুখ ফুটে ।
[''কিছু বলব ব'লে এসেছিলেম, রইনু চেয়ে না ব'লে'' — রবীন্দ্রনাথ]

২ (১-৭, ৭৪/৩৬)
কোথায় রাখি হৃদয় আমার বেদনাবিধুর ?
মাটিতে নেই কোমলতা, আকাশ বহু দূর ।

৩ (১-৮, ৭৪/৩৬)
একটি স্বপ্ন গেল বুক থেকে ঝরে —
এমনি কি আর জলে ওঠে চোখ ভ'রে ?

৪ (১-১২, ৭৫/৩৭)
প্রেমকে নিছক ছেলেখেলা ভেবে জড়িয়েছিলাম আমি,
হাসি পায় আজ মনে পড়ে গেলে সেদিনের মূর্খামি ।

৫ (১-৩৮, ৮২/৪৪)
এ পোড়া বুকের ইতিহাস, সখা শুনে কি বা হবে আর ?
লুটেরার হাতে ধুলোয় মিশেছে এ নগরী বারবার ।

৬ (১-১৩, ৭৬/৩৮)
ভগবানের সামনেও নিয়ন্ত্রণ হারাই নি যে হৃদয়ের ওপর,
আজ তাকে হেলায় কেড়ে নিল এক অবলা নারী ।

৭ (১-৩০, ৮০/৪২)
নিজের ভিতরে চোখ মেলে দেখা পেলাম ঈশ্বরের
আগে বুঝিনি কত দূরে ছিলাম আমি ।

৮ (১-৩৬, ৮১/৪৩)
এ পোড়া বুক দেখে আজ আর কে বলতে পারবে
যে এ কোনদিন উর্বর সবুজ ছিল, না চিরদিনই এমন খাঁ খাঁ মরুভূমি ?

৯ (১-৪১, ৮৩/৪৫)
কলজেটাকে বিরহের দাবানলের হাত থেকে বাঁচাতে পারলাম না ।
ঘর পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল চোখের সামনে, আমি অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম ।

১০ (১-৪৩, ৮৩/৪৫)
চরম নৈরাশ্যও নাগাল পায় না অন্ধকার পাতালের সে গভীরতার
যেখানে আজ মীরকে এনে দাঁড় করিয়েছে তার ভাগ্য ।

১১ (১-৫২, ৮৫/ ৪৭)
তুই খুঁজতে জানিস না, মীর,
নইলে এই জগৎ-জোড়া সুহৃদ-মেলায় একজন বন্ধুও জুটলো না তোর ?

১২ (১-৫২, ৮৫/৪৭)
সে তোর সাথে ছিল প্রতি পদেই,
তবু তাকে খোঁজার নেশাটা ছাড়তে পারলি না তুই !

১৩ (১-২১, ৭৮/৪০)
হৃদয়েশ্বরি, বলো তুমি শুধু আমার হৃদয়ে রবে —
মনোরমতর প্রাসাদ এর চেয়ে তৈরি হয় নি ভবে ।

১৪ (১-২৭, ৭৯/৪১)
আমার সামনে যেই কেউ তোর নাম নেয়, সে আঘাতে
বেদনা-আতর কলজেটা আমি চেপে ধরি দুই হাতে ।

১৫ (১-৪০, ৮২/৪৪)
মাথা থেকে মেধা গত আজ, বুক হারিয়েছে অনুভূতি,
তেল নিঃশেষ, আঁধার জীবনে নেই প্রদীপের দ্যুতি ।

১৬ (১-৫৬, ৮৬/৪৮)
কত বিরহের রাতে সাথী ছিল কেবল প্রতীক্ষাই —
আজ বহু যুগ যাবৎ, হায় রে, তারও আর দেখা নাই ।

১৭ (১-৫৪, ৮৬/৪৮)
হেলাফেলার জিনিস নই হে আমরা — মাথার ওপর আকাশটাকে বহু বছর ঘুরতে হয়
পৃথিবীর মাটিতে একটা মানুষের মতো মানুষ জন্মাবার জন্য ।

১৮ (১-৫৮, ৮৭/৮৯)
আপাদমস্তক আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তৈরি, তাই আমি মানুষ —
এ পোড়া বুকের কাঙালপনা ছাড়া আমার আর ঈশ্বরের মধ্যে তফাৎটা কোথায় ?

১৯ (২-৪, ৮৮/৫০)
গন্তব্যে একবার পৌঁছে গেলে দেখবে সব পথই ঈশ্বরমুখী —
রাস্তা অনেক, কিন্তু লক্ষ্য সকলেরই এক ।
[''যতমত, তত পথ'' — শ্রী রামকৃষ্ণ]

২০ (২-৫, ৮৯/৫১)
আকাঙ্খার প্রাবল্য আমার খোলসটাকে এনে দাঁড় করিয়েছে হাটের মধ্যিখানে,
আসল আমি টা কিন্তু বাস করে লোকচক্ষুর আড়ালে তার নিজস্ব জগতে ।

২১ (২-১০, ৯০/৫২)
প্রতিদিন তোর সন্ধানে ফিরি বাতাস যেমন ভোরে —
ঘর থেকে ঘর, গলি থেকে গলি, এ শহরে — সে শহরে ।

২২ (২-১৪, ৯১/৫৩)
প্রত্যাখ্যানে দৃঢ়তর হয় আকাঙ্খাময় চিত্ত —
তোর ''না'' আমায় কবে করে তোকে চাওয়া থেকে নিবৃত্ত ?

২৩ (২-১৬, ৯১/৫৩)
বাঁধভাঙা ছিল হাসি, কানাকানি; আজ সবকিছু চাপা ।
সে ছিল জমানা সীমারেখাহীন; এ যুগে আমরা মাপা ।

২৪ (২-১৭, ৯২/৫৪)
কত আশা করে কাঙাল হৃদয় প্রেমাস্পদের কাছে ।
ভিক্ষা চাওয়ার প্রেমিকের মনে ক্লান্তি কখনও আছে ?

২৫ (২-১১, ৯০/৫২)
প্রিয়ে, তুমি-আমি আজীবন রব একে অপরেতে মগ্ন —
চির উৎসুক, চির দরদিয়া, বক্ষ বক্ষ লগ্ন ।

২৬ (২-২৯, ৯৫/৫৭)
বিবশ মনটা দরদীয়া দেখা না পেয়ে মরেছে দুখে —
এই অনুযোগ নিয়ে হাজির হব বিধাতার সম্মুখে ।

২৭ (২-৫১, ১০০/৬২)
তোমার দুয়ারে এসেছি তোমায় পাবার নেশার ভরে —
এখন শক্তি কোথা পাই বলো, ফিরতে নিজের ঘরে ?

২৮ (২-৩৬, ৯৬/৫৮)
তোলপাড় এবুকের তোমায় কি ভাবে বোঝাই, চাঁদ ?
তোমায় তো আর বাঁধেনি কখনও প্রিয়ার চুলের ফাঁদ !

২৯ (২-২৭, ৯৪/৫৬)
দাঁড়াবার ঠাঁই কোনখানে তুই খুঁজে পেলি না রে, মীর,
দুনিয়া-কাননে তুই যে শুধু চির-বহমান নীর ।

৩০ (২-৪৫, ৯৯/৬১)
বিফল তাবৎ ওষুধ-নিদান, ব্যর্থ যত প্রচেষ্টা,
কলজের রোগই দফা তোর, মীর, রফা ক'রে দিল শেষটা ।

৩১ (২-৪৮, ৯৯/৬১)
দুনিয়ার হাটে বিকিয়ে যাচ্ছে হরেক রকম পণ্য,
একটিও ক্রেতা মিলল না শুধু আমার প্রেমের জন্য ।

৩২ (২-৫৮, ১০২/৬৪)
চোখ কান বুজে হেঁটেছ বন্ধু, জীবনের পথ সারা —
প্রতি মোড় ছিল নতুন জগৎ বিস্ময় ধনে ভরা ।

৩৩ (২-৫৪, ১০১/৬৩)
নিজেকে শেষ ক'রে দেবার পক্ষে এত অজস্র যুক্তির ভিড়ে
বেঁচে থাকার জন্য একটা অজুহাতও কি লুকিয়ে নেই কোথাও ?

৩৪ (২-৭৬, ১০৬/৬৮)
ঈশ্বরের বন্দনা ও তাঁতে আত্মসমর্পণের উপায় যে যার নিজের মতো বেছে নেবার জিনিস ।
আমার উপাসনার বস্তু এই একমুঠো ধুলোই ।

৩৫ (২-৭৭, ১০৭/৬৯)
প্রেমধর্মে পথপ্রদর্শক হৃদয়,
হৃদয় পথ, হৃদয়পথিক, হৃদয়েই পথের শেষ ।

৩৬ (২-৭৮, ১০৭/৬৯)
বেঁধে রেখে আষ্টেপৃষ্ঠে মিথ্যা রটাচ্ছ আমরা স্বাধীন —
যা করছি, সবই তোমার ইচ্ছায়, অথচ দোষ কিছু হ'লে তা আমাদের !

৩৭ (২-৫৯, ১০২/৬৪)
ওড়ার সাধ তো প্রবল দেখছি, বৃদ্ধ বালক, তোর,
কিন্তু পালক কোথায় ডানায়, আকাশে ওঠার জোর ?

৩৮ (২-৬৮, ১০৪/ ৬৬)
যেমন মীরের চলনটি বাঁকা, বলন তেমনই রুক্ষ,
কম লোকই তাকে বুঝতে পেরেছে — এটা তার বড় দুঃখ ।

৩৯ (২-৭০, ১০৫/৬৭)
বাতুলের মতো প্রলাপ যখন বকেছি, সবাই চাইত;
বুদ্ধির কথা বলতে যাওয়াই বোকামি হয়েছে তাই তো !

৪০ (২-৭৩, ১০৬/৬৮)
দরিয়ার মতো দরাজ সে প্রেম কোথা পাবে এই যুগে ?
সম্ভ্রম, রীতি — সবই ঘুচে গেছে দৈন্যের রোগে ভুগে ।

— অনুবাদ —

ভারততীর্থ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ।।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন –
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে –
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ।।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান –
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে –
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ।।

The Pilgrimage

Transliterated by Atithi

O Mind awake! Tarry awhile on these
Sacred shores of Bharat's teeming masses.
With arms upraised, bow down and sing,
A paean to the Divinity of Man!
These solemn peaks lost in thought,
This river-rosary girded plain --
Behold, this timeless hallowed earth
By the shores of shores of Bharat's teeming masses!
Who knows at whose welcoming call
Did such legion races descend
Like puissant streams from springs diverse
To join this billowing deep?
Here Aryan, non-Aryan, Dravidian, Chinaman,
Shaka, Hun, Mogul, and Pathan,
Have converged in a single confluence.
And now the West too has opened its doors, sending forth its gifts,
To give and to take, to mingle and to meld, never to return
From these shores of Bharat's teeming masses.
Come O Aryan! Come non-Aryan! Come Hindu, Mussalman!
Come and join us Englishman! Come, O come Christian!
Come Brahmin, with unsullied mind, come join hands with all!
Come, be delivered, O Fallen, from all accumulated indignities!
Come forthwith to enthrone the Mother!
The holy vessel of sacrament let us fill
With the water consecrated by us all --
From these shores of Bharat's teeming masses.

— অনুবাদ —

যদি ভুলে যাও

আনন্দ সেন

তোমাকে কিছু কথা দিতে চাই বলে
হয়তো তোমার জানা এসব
হয়তো করেছ অনুভব
যখন আকাশ মাটিতে নামে পড়ন্ত বিকেলে

আমি দেখি
কাঁচঘরে মোড়া চাঁদ
পৃথিবীর বুকে আলো জ্বালে
অলস হেমন্তের রঙ
উঁকি মারে
জানলায় ঝুঁকে থাকা ডালে

আমি ছুঁয়ে ফেলি
আগুনের পায়ে শুয়ে থাকা ছাই
কুঞ্চিত পোড়াকাঠে লেগে থাকা
কালকের আশনাই

এসব আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যায়
যেন এ সব অস্তিত্ব, এ শব্দ, গন্ধ, আলো,
এ ধাতব স্পর্শগুলো

এরা সব তরী বায়
তোমার ও দ্বীপের সন্ধানে
যে দ্বীপ আমার প্রতীক্ষায়
সারারাত মুহূর্তদের গোনে ।

কিন্তু,
হঠাৎ, তোমার ভালবাসা যদি
হয় বয়ে যাওয়া নদী
দূরে যায় সরে
এক পা এক পা করে

তখন
আমার ভালবাসা অভিমানী
পিছু হেঁটে সেও যাবে জানি
চৌকাঠের ওপারে ।

যদি হঠাৎ ভোলো আমায়
চেয়ো না পিছন ফিরে আর
জেনো আমিও নিজের মত
ভুলেছি ভোলার ক্ষত
ভুলেছি যা ছিল তোমার আমার ।

যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ো
হারাও আমায়
উন্মত্ত অন্তহীন মিছিলের ভিড়ে
যদি খুলে নাও মুঠি
ফেলে আসো আমায় হৃদয়ের তীরে
যে হৃদয়ে পুঁতেছি শিকড়

তবে জেনে রেখো ঠিক
সেই দিনে, সেই ক্ষণে
আমিও নোঙর তুলে
বাতাসের সাথে মিলে
চলে যাব অন্য অন্তরীপ
অন্য জমিতে আমি ফেলব আঁকড় ।

কিন্তু যদি প্রতিদিন, প্রতি পলে
থাকো এ বিশ্বাসে
আমারই নিশ্বাস তোমার বারোমাসে ।
যদি প্রতিদিন তোমার ওষ্ঠবাহী গোলাপ
খোঁজে আমার মুখ
খোঁজে ভালবাসা, আমার গভীর সুখ ।
তবে জেনো
সে আগুন নেভেনি এখনও ।

প্রিয়তমা,
আমার ভালবাসা যদি থাকে মিশে
তোমার ভালবাসার আশে পাশে
ভুলে যাবে সে সকল ক্ষরণ
আমার আমিকে নিয়ে
তোমার বাহুলগ্ন হয়ে
কাটাবে সে আনখ জীবন ।

পাবলো নেরুদার জন্ম হয় চিলির ছোট্ট গ্রাম প্যারালে ১৯০৪ সালের ১২ই জুলাই । আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই কবিকে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ দেওয়া হয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার । ১৯৭৩ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের সমাপ্তি ঘটে । ''Poetry is song and fertility'' – তাঁর বহু কবিতায় তাঁর নিজের এই দর্শনের প্রকাশ । উপরের কবিতাটি তাঁর বিখ্যাত ''love poems'' এর একটির অনুবাদ । মূল কবিতাটি হল ''If You Forget Me''.

— প্রবন্ধ —

কবি প্রণাম

সুনয়না ইয়াং

রবীন্দ্র প্রতিভা বহুমুখী। তাঁর সাথে আমার পরিচিতি মূলত তাঁর লেখা এবং গানের মাধ্যমে। তাঁর লেখায় যে দিকে তাকাই, সর্বত্রই মণিমুক্তার সম্ভার ছড়ানো। তাঁর ভাব, ভাষা এবং প্রকাশ অনন্য। তাঁর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনো লেখকের লেখনী আমার অন্তঃকরণকে সে ভাবে স্পর্শ করতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের জীবনমুখী লেখা এবং ঈশ্বরমুখী রচনায় আমি একই মাধুরিমা দেখি। তাঁর ঈশ্বরমুখী লেখায় যে মীড়, যে মোচড় পাই পরম সত্যের সন্ধানে, সেই একই চেতনা বা উপলব্ধির প্রকাশ ফুল, মাটি, আকাশ বা মানুষের সত্তাতেও।

কবিগুরুকে প্রণাম জানাতে গিয়ে, তাঁর দুএকটা পূজা পর্যায়ের গান মনে আসছে। যেমন,

''আমার বেলা যে যায়, সাঁঝ বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।
একতারাটির একটি তারে, গানের বেদন বইতে নারে
তোমার সাথে বারে বারে
হার মেনেছি এই খেলাতে।''

এই সুর মেলাবার চেষ্টায় রিক্ততা নেই, ব্যর্থতা নেই। শুধু চেষ্টা টুকুই আছে আর যাঁর সাথে সুর মেলাবার এই প্রচেষ্টা, তিনি যে আমার বহু উর্দ্ধে এই সত্যের স্বীকার আছে। সন্ধ্যেবেলায় স্তিমিত আলো প্রাঙ্গনে কারু সুরে সুর মেলাবার এই ভাবটি এত ধরা ছোঁয়ার মধ্যে যে ছেলেবেলা থেকে এই ভাব মনের গভীরে ভিত কেটেছে। ভিতরের গুহ্য বিষয় সম্যক করে বোঝবার বহু আগে তা ঘটেছে।

আমার ছেলেবেলার আর একটি প্রিয় গান,

''যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ, দিয়েছ তারি পরিচয়
সবারে আমি নমি
যে কেহ মোরে দিয়েছ দুখ, দিয়েছ তার পরিচয়
সবারে আমি নমি।''

কি অপূর্ব স্নিগ্ধতা এই গানের মধ্যে। সুন্দর সোজা ভাষা কিন্তু অসাধারণ তার বক্তব্য। সহজ, কঠিন, ভাল মন্দ, কান্না হাসি জীবনের চলার পথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে একথা বহুবার বহুভাবে শুনেছি। তথাপি এই গানে দুই বিপরীতের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে সুরের মাধুর্য্যে, ও কথার গভীরতায় তার কোন বিকল্প আমি খুঁজে পাই নি।

আরো একটি গান মনে ভেসে আসছে,

''আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে, সাধ যায় তব কবি
আমার শ্রবণে বসিয়া নীরব তাই
শুনিয়া লইতে চাই আপনার গান।''

যিনি আমার ঈশ্বর, আমার বিধাতা, তিনি আমারই মাধ্যমে প্রকাশিত। তিনি যে এক কবি আর এই জগৎ যেন তাঁর সৃষ্টি এক কবিতা, ঈশ্বরের এই সত্তা কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের লেখাতেই আমি পেয়েছি। আমরা যেন তাঁর হাতের যন্ত্র। কবির লেখায় বার বার শুনতে পাই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, এই যন্ত্র তোমার মনঃপূত হয়েছে কি ? ঠিক সুরে বাঁধা হয়েছে তো ?

এই সুর কি তোমার কানে লেগেছে ভাল ? তাঁর এই প্রশ্ন আর নিজেকে উত্তরণের এই প্রচেষ্টা আমার মনকেও এই ভাবে আন্দোলিত করে।

আমার ভারী সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ আমার ঘরের কবি। তাঁর অপূর্ব ভাষা আমার মাতৃভাষা। তাঁর প্রকৃতির সাথে একাত্মতা, প্রেমের প্রতি অপাপবিদ্ধ সৌন্দর্য্যবোধ, আর সর্বোপরি তাঁর ঈশ্বরানুভূতি যেন আমার চেতনাকে সমৃদ্ধ করে, এই আমার প্রার্থনা।

— প্রবন্ধ —

ঠাকুরের কাছ হতে ঠাকুরকে পাওয়া

দেবীপ্রিয়া রায়

মানসীদিদির সাথে আমার কুটোকুটি ঝগড়া হয়ে গেল । এ ওর চুল ছিঁড়ে আঁচড়ে কামড়ে কেঁদেকেটে আমরা দুই জনে যখন থামলাম, ততক্ষণে মা আর বড়মাসী, মানে আমাদের দুইজনের মায়েদের মধ্যে হাতাহাতি লেগে গিয়েছে । ঝগড়াটা শুরু হয়েছিল, মানসীদি আমার ঠাকুর (আমার মতে) কেড়ে নেওয়ায় । এতক্ষণ সেই নিয়েই চেঁচামেঁচি চলেছে । এখন দুই মায়ে ন্যায্য বিচার করতে গিয়ে একে অন্যকে সেই ঠাকুর ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তাঁদের চেঁচামেঁচিতেও কান পাতা দায় । শেষে দিদিমার সালিশিতে ব্যাপারটার একটা মীমাংসা হল । যে ঠাকুরকে নিয়ে এত মারামারি, ভক্তদের এত ব্যাকুলতায় তাঁর বিন্দুমাত্র চিত্তচাঞ্চল্য ঘটল বলে মনে হলো না — দিব্যি তীর ধনুক কাঁধে, মুকুট মাথায় ছোট ভাই আর গিন্নিটিকে নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন । অবশ্য দারুভূত মুর্ত্তি হিসাবে এর বেশী তিনি সেই মুহূর্ত্তে আর এর বেশী কিইবা করতে পারতেন ? পাঠকমাত্রেই এতক্ষণে বুঝে ফেলেছেন যে যাঁকে নিয়ে দুটি বালিকা ভক্ত (আমাদের বয়েস তখন ক্রমান্বয়ে ৪ ১/২ আর ৬ বছর), এত ব্যাকুল, তিনি হলেন কৌশল্যানন্দন, জানকীবল্লভ অযোধ্যাপতি রাম, যাঁকে নিয়ে আজও ঝগড়া কাজিয়া লেগেই আছে । সেই সব কাজিয়ায় গিয়ে কাজ নেই; আমাদের কথাই বলি । দিদিমা সেদিন ঝগড়া থামাতে তক্ষুণি গাড়ি হাঁকিয়ে বিশ্বনাথের গলিতে গিয়ে একদম একই রকম আরেকটি কাঠের মূর্ত্তি সংগ্রহ করে এনেছিলেন । ব্যাপারটা নতুন ছিল না । দিদিমার শ্বেতপাথরের ঠাকুরঘরে বেদীর উপর নানান দেবী দেবতা সুন্দর সুন্দর ঝলমলে সাজপোশাকে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতেন । সকালে বিকালে তাঁদের জন্য ভারী ভালো ভোগ প্রসাদ দেওয়া হতো, ধূপ ধুনোর গন্ধে ঘরটিতে সবসময় কেমন একটা মন ভাল লাগা পরিবেশ । আরতির পরে দিদিমা শাদা একটি চামর ঢুলিয়ে তাঁদের বাতাস করতেন, যে কাজটির উপর আমাদের দুই বোনেরই নজর । সব মিলিয়ে ঐ সব ঠাকুরদের আমাদেরও পেতে ইচ্ছা করতো । সুযোগ পেলেই দিদিমার কাছ হতে আব্দার করে নতুন নতুন মূর্ত্তি আদায় করতাম, তা তাঁরা রাধাকৃষ্ণ, বাল গোপাল, রামসীতা, দূর্গা, শিব, যেই হোন্ না কেন । বাড়ী এনে অবশ্য তাঁদের সেবা যত্ন করার উৎসাহ খুব বেশীক্ষণ বজায় থাকতো না । এদিকে মা'র ঠাকুর ঘরের তাকে জায়গা অকুলান, কারণ সেই সব ঠাকুরদের ফেলে আর তো রাখা যায় না ! মা বেচারা গজ্‌গজ্ করতে করতে লাল লাল শালু কেটে তাঁদের কাপড় বানাতেন, ছোট ছোট থালা, গেলাস কিনে কিনে নকুলদানা বা বাতাসা খাওয়াতেন আর সকালবেলা অজস্র কাজের চাপে হিমসিম খেতে খেতেও তাঁদের স্নান করাতে করাতে রেগে অস্থির হয়ে যেতেন । তাতে আমার ভক্তিতে কোন রকম ব্যাঘাত ঘটতো না, কারণ রামের সেবা যত্ন যে মা'ই করবেন, এতে আর আশ্চর্য্য কি ?

আরো যখন ছোট ছিলাম, তখন মা'ই তো আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে ঠাকুরের নাম 'রামজী', গলার হারে রামজীর ছবি আঁকা লকেট ঝুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে ভয় পেলেই রামজীকে জোরে জোরে ডাকতে । সেই ডাকাডাকির ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র অবহেলা ছিল না । গভীর রাত্রে যখন ছাদের উপর শুয়ে চার পাশে ইউক্যালিপ্টাস গাছের ডালগুলি কেঁপে কেঁপে উঠত, কিম্বা সন্ধ্যেবেলা শেয়ালের দল সদর দরজার সামনে বকুল গাছের ঝরে পড়া পাকা ফল খেতে এসে হুক্কা হুয়া বলে ডাক পাড়ত, তখন তারস্বরে রামজীকে ডাকা ছাড়া উপায় খুঁজে পেতাম না । সেই শিশুকালে চারিদিকটা একটা রহস্যের জালে ঢাকা, কখনো আনন্দ, কখনো ভয়ের আলোছায়া তাতে কেঁপে কেঁপে ওঠে, সেই সব মুহূর্ত্তে রামজী হাসি হাসি মুখে সাথে থাকেন । মা বলে দিয়েছেন, যে রামজী আমাদের সক্কলকার বাবা হন্ । সেই সকাল থেকে আমাদের সবাইকে নাওয়ানো, খাওয়ানো, চোখে চোখে রাখা, সব কিছু তিনি একা করে যান্ । সবই ঠিক ছিল; এমন কি রোজ সকালে যে ভগত নামে এক বুড়ো ফল ওয়ালা ফল বেচতে আসত, সে পর্যন্ত রাম নাম না করে রাধেশ্যাম বললে লাঠি তুলে তেড়ে বলত, 'রাম নাম ভজা মনমাঁহি, ঐসন্ মৌকা পৈঁবা নাহিঁ ।' বোঝাই যেত রাধেশ্যামের চেয়ে রাম রাজত্বে প্রজা বেশী । তবে শ্যাম-এর মহিমা যে কিছুমাত্র কম নয় সেটা টের পেলাম যেদিন

মধুসূদন দাদার গল্প শুনলাম। কেমন সুন্দর বনের মধ্যে ভয় পাওয়া ছোট্ট ছেলের সাথে থেকে তাকে বাড়ী পৌঁছে দেন, গুরুমশায়ের জন্মদিনে অফুরন্ত দৈয়ের হাঁড়ির জোগান দেন্ ! বড় হলাম, রামায়ণ মহাভারত, পুরাণ উপপুরাণের গল্পে গল্পে নানান্ দেবী দেবতার সাথে পরিচয় হতে থাকল। মাসে বছরে কত পূজা হয়, তার নিয়ম কানুন কত। কিছু বেশ বুঝি, কিছু বুঝি না। অঞ্জলির আগে উপোস করি, শান্তিজলের জন্য মাথা পাতি, পূজোর জন্য দূর্বা বেছে আনি। দূর্গা, সরস্বতী, মা ষষ্ঠী — কত কত ভাল ভাল ঠাকুর — বাড়ীতে নিত্য তাঁদের নিয়ে উৎসব লেগেই আছে। তাছাড়া মা কি ঠাকুমা'র হাত ধরে মন্দিরে যাই, প্রসাদের ঠোঙা পুরোহিতের হাতে তুলে দিয়ে ভক্তি গদ্‌গদ চিত্তে প্রণাম সারি, লাফিয়ে লাফিয়ে ঘন্টা বাজাই। এক একবার এক একজন ঠাকুরকে খুশী করি, কিন্তু কার মহিমা বেশী ঠিক করতে পারি না। আমার বয়েস তখন সাত। ছোটদের মহাভারত গোটা পড়ে ফেলে নিজেকে বিশেষ বোদ্ধা বলে মনে হচ্ছে। সেই জ্ঞানের বহর দেখিয়ে দাদামশায়ের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার প্রবল ইচ্ছায় তাঁকে চিঠি লিখলাম, পার্থসারথি কে ? চমক লাগল দাদামশাইয়ের উত্তর যখন এল। লিখেছেন, 'আমাদের হৃদয় হল পার্থের রথ তাকে যিনি চালিয়ে নিয়ে চলেছেন, তিনি হলেন পার্থসারথি।' ভারী চিন্তায় পড়া গেল। তাহলে ঠাকুরের বাসা কই ? এতদিন তো জানতাম যে নীল আকাশের উপরে স্বর্গ নামে সুন্দর এক জায়গায় তাঁরা বসবাস করেন। মাঝে মাঝে সেখান হতে কি জানি কি করে নেমে এসে আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে যান। আমরা ভালো কাজ টাজ করলে কিছুদিনের জন্য তাঁদের কাছে যাওয়ার অধিকার জোটে। এই বুকের মধ্যে থেকে চালানোর ব্যাপারটা কি, বোঝা গেল না যে ! তাহলে কি আমার ভালো কাজ, খারাপ কাজ সব কাজেরই নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে ? আবার রথটা চালিয়েছিলেন কৃষ্ণ, তা তিনি কি সবার উপরে, তাহলে অন্যরা ? স্বর্গটা কি তাহলে আমার বুকের মধ্যে ? আর দিদিমার আর মা'র তাকের সেই সব মূর্ত্তিরা ? সবাই মিলে যদি বুকের মাঝে যদি রয়েছেন, তাহলে আমরা তাঁদের খাওয়াই নাকি তাঁরাই আমাদের খাওয়ান ? ভেবে ভেবে কূল কিনারা পাই না। রবীন্দ্রনাথ তখনও বইয়ের পাতায় রয়েছেন, মাঝে মাঝে মুখস্থ করে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যাই, পরীক্ষার প্রবন্ধ তাঁর বাছা বাছা উক্তি দিয়ে শুরু করি, মাঝে মাঝে ভাব সম্প্রসারণ করতে হয় — সেটাও দুলে দুলে মুখস্থ করে ফেলি। রেডিওতে তাঁর গান হয়, বড্ড টেনে গাওয়া হয় বলে অনেকে বিরক্তি প্রকাশ করেন বলে দেখি। চেনাশোনা অনেকে তাঁর গান গাইতে ভালবাসেন, তার অর্থ সবসময় বুঝিনা।

এরই মাঝে হঠাৎ একদিন একটি গানে চারিদিক আলো হয়ে উঠল — হৃদয়ে দুরু দুরু মন্দ্রে ডমরু বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথ নেমে এলেন আমার সকল সংশয় দূর করে দিয়ে। খুব ভোরের বেলায় সূর্য্য তখন প্রথম সোনালী আলো ছড়াচ্ছে, আমার সুকণ্ঠ ঠাকুরদা প্রাত্যহিক ধ্যান পূজা সেরে গান ধরলেন, 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, দিন রজনী কত অমৃত রস উছলি যায় অনন্ত গগনে' — গাইতে গাইতে দাদুর চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। সদ্য কিশোরী আমার সারা গায়ে কাঁটা দিল। প্রথম ভোরের সেই আলোর দিকে চেয়ে আমি বুঝতে পারলাম কি এক অমৃত ধারা রবি শশী অঞ্জলি ভরে পান করেছে। চকিতে বুঝতে পারলাম অনেকবার শোনা সেই গানটির অর্থ 'আকাশ ভরা সূর্য্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।' প্রাত্যহিকতার দ্বিধা দ্বন্দের বাঁধন খসে পড়ে আলোভরা আকাশের এক অনন্ত মুক্তির মাঝে আজ আমার মন ডানা মেলল। রবীন্দ্রনাথ আমায় বলে দিলেন যে আজ থেকে ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে যেখানে পা ফেলব সেই বাঁধন হারা মুক্তি থাকবে আমার সাথে সাথে। এই মুক্তি, এই আলোই কি তবে সেই হৃদয়চারী পার্থসারথি ? মন বলল সেই তো তাঁর রূপ। তাঁকে খুঁজে পাইনি এতদিন কিন্তু সে তো আমার বোঝার ভুল, এই জন্যই তো সেই গান —

'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাই নি।
তোমায় দেখতে আমি পাই নি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি,
আমার হৃদয়-পানে চাই নি।।
আমার সকল ভালোবাসায় সকল আঘাত
সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে, তোমার কাছে যাই নি।।
তুমি মোর আনন্দ হয়ে ছিলে আমার খেলায় —
আনন্দে তাই ভুলেছিলেম, কেটেছে দিন হেলায়।
গোপন রহি গভীর প্রাণে আমার দু:খসুখের গানে
সুর দিয়েছ তুমি, আমি তোমার গান তো গাই নি।।'

কিন্তু সংশয় যে কাটে না ! সেই বিশ্বভুবন ব্যাপী আলোই যদি তাঁর রূপ তবে আমার মা, দিদিমা, ঠাকুমা'র সেই সব ঠাকুরেরা ? তাঁরা কি সব মিথ্যা ? আমার ছেলেবেলা হতে দেখে আসা এত ব্রত উপবাস সব কি কেবল এক গোলকধাঁধায় ঘুরে মরা ? এত বড় তাঁর সৃষ্টিতে তিনি এত ছলনার জাল বিছিয়ে রেখেছেন ? এ কেমন তাঁর ভালবাসা ? রবীন্দ্রনাথ নিজে কি এই সংশয় কখনও অনুভব করেন নি ? উত্তর খুঁজে ফিরি তাঁর কাছে আর দেখতে পাই যে তিনি বলছেন

আঁধারে আবৃত ঘন সংশয়
বিশ্ব করিছে গ্রাস,
তারি মাঝখানে সংশয়াতীত
প্রত্যয় করে বাস ।
বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি
অন্ধবুদ্ধি ফিরিছে আকুলি;
প্রত্যয় আছে আপনার মাঝে —
নাহি তার কোনো ত্রাস ।

সংশয়ের পরপারে এই প্রত্যয় খুঁজে পেতে তিনি রূপকে এড়িয়ে যেতে বলেন না, বরং রূপসাগরে ডুব দিয়ে দেখতে পান অরূপ রতন, শুনতে পান সীমিত সত্যের মাঝে অসীমের সুর । তাঁর সাথে পথ হাঁটি আর বুঝতে পারি যে তিনি অনুভব করেছেন খন্ডের মাঝে অখন্ডের প্রকাশ, মূর্ত্তি পূজার মাঝে বিমূর্ত্ত আনন্দময় চির সুন্দর-এর উপস্থিতি । পূজার মাঝে সেই অরূপের সন্ধান না করে যতদিন তাঁর রথটিকে, রথারূঢ় মূর্ত্তিটির মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ ভেবে তার সামনে লুটিয়ে থাকব, ততদিন, অন্তর্যামী আমার বিফল প্রয়াস দেখে হাসবেন । আর যেদিন সেই ভুল ভাঙবে, সেদিনের জন্য হৃদয়ের নন্দনবনে নিভৃত নিকেতনে তাঁর পরমপ্রেম সান্নিধ্য অপেক্ষায় থাকবে । মন বলে উঠল, এই তো হয়েছে মূর্ত্ত ও বিমূর্ত্তের সমাধান । সীমাকে সত্য মেনে নিয়ে যতদিন রাম বড় না কৃষ্ণ বড়, পূজার বিধিনিষেধ নিয়মের গন্ডীতে থাকব আবদ্ধ, ততদিন সেই হৃদয়বিহারী সত্যের দেখা মিলবে না ।

গোঁড়ামি সত্যেরে চায়
মুঠায় রক্ষিতে —
যত জোর করে,
সত্য মরে অলক্ষিতে ।
স্ফূলিঙ্গ

কিন্তু নিয়মের নিগড় পেরুব কি করে ? আমার যে শতেক মোহ, শতেক ছোট ছোট ভয়, ভ্রান্তি ভালবাসা । নিয়ম না মানলে পরিশুদ্ধ হব কি করে ? কবি আবার পথ দেখান, ঠাকুরের হয়ে বলেন যে ভুল ভ্রান্তি মোহ, সেও তো সেই বিশ্বময়ের দান । তাঁকে ছাড়িয়ে যাই সে আমার সাধ্য কি ? মা'র শেখান সেই কথা — তিনি আমাদের বাবা, সারা দিন সব সময় তিনি আমাদের দেখছেন — সেটিকেই যেন ঠাকুরের ভাষায় কবি বলেন,

ওরে মত্ত ওরে মুগ্ধ, ওরে আত্মভোলা,
রেখেছিলি আপনার সব দ্বার খোলা;
চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক,
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখশোক,
যত ভালোমন্দ, যত গীতগন্ধ লয়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে ।
সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্য বার এসেছিনু নামি ।
দ্বার রুধি জপিতিস যদি মোর নাম
কোন পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম ।

ভয় ভেঙে যায়-কবির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গাই- 'পথ আমারে সেই দেখাবে যে আমারে চায়, আমি অভয় নামে ছাড়ব তরী সেই শুধু মোর দায় ।' আমি জগত মন্দিরে দেখি তাঁকে, হৃদয়ের অন্তস্থল হতে বলি

তোমার ভুবন-মাঝে ফিরি মুগ্ধসম
হে বিশ্বমোহন নাথ । চক্ষে লাগে মম
প্রশান্ত আনন্দঘন অনন্ত আকাশ;
শরৎমাধ্যাহ্নে পূর্ণ সুবর্ণ উচ্ছ্বাস
আমার শিরার মাঝে করিয়া প্রবেশ
মিশায় রক্তের সাথে আতপ্ত আবেশ ।

এই বোধ পেতে দেরী হয়ে গেল কি ? যদি দেরী হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি ? আমি আমার নায়ের হালটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে শুধু বলব, 'তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ লহ — কত বেদন কত ফাঁকি, এখন ও যে আছে বাকী মনের মন্দিরে, তুমি তার লাগি আর ফিরো না হে — তারে আগুন হয়ে দহ — আমার হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহ' ।

— প্রবন্ধ —

মাতৃভাষার আসল সংজ্ঞা

নন্দিনী ঋদ্ধান্‌শ

১৯৯২ সাল, আমরা সবে পাহাড় থেকে সমতলে এসে বাসা বেঁধেছি । আমাকে নতুন স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে । সেখানে আমার নিজেকে সবার থেকে আলাদা মনে হত । কারণ আমার ছোট জীবনের ব্যক্তিগত ইতিহাস ওদের থেকে একটু আলাদা । ওপার বাংলা থেকে আমার পরিবার সোজা কলকাতায় আসেনি । আমরা উত্তরপূর্ব রাজ্যের অবাঞ্ছিত বাসিন্দা যারা শান্তির আশ্রয় খুঁজতে কলকাতায় এসেছি । অন্তত আমার তাই পরিচয় । কারণ আমার জন্ম শিলং-এ । ''শিলং কী আসাম-এ ?'' এই প্রশ্ন জীবনে আমাকে বহুবার শুনতে হয়েছে ।

এখনও মনে আছে, স্কুলে আমি খুব কম কথা বলতাম, কারণ আমার ভাষা ছিল অন্য সবার থেকে আলাদা । একদিন ''পেটে ব্যথা'' বলতে গিয়ে বলেছিলাম ''প্যাটে ব্যথা'' । উচ্চারণের ব্যবধানেই ধরা পড়েছিল আমার ভিন্নতা । যতদূর মনে পড়ে কয়েকজন আমার ভুল উচ্চারণের জন্য হেসেছিল । ওদের মধ্যে কেউ একজন বলেছিল - ''তোরা কী অসমিয়া ?'' আমি তো নিজেকে বাঙালী বলেই জানতাম । খুব মন খারাপ নিয়ে বাড়ি ফিরে সবাইকে একবার করে ''পেট'' উচ্চারণ করতে বলেছিলাম । আমাদের বাড়িতে ''পেট'' কে ''প্যাট'' বলাটাই তো স্বাভাবিক ।

''তাহলে কলকাতায় কি বলে ?''

উত্তর পেলাম ''ওরা পেট বলে'' ।

''সেটাই তো, আমি তো ''প'' বলেছি, ''ফ'' না । তবুও কেন ওরা হাসলো ?''

এর কোন উত্তর ছিল না বড়দের কাছে ।

কি অদ্ভুত, এই বাংলা ভাষার সামান্য রকমফের । হঠাৎ করে নিজের ভাষাগত পরিচয় হারিয়ে গেল । তারপর থেকে আমি নিজের বাংলা উচ্চারণ নিয়ে খুবই সচেতন হয়ে পড়ি । বাংলায় যতটা সম্ভব কম কথা বলতাম । নিজের ভাষার পরিবর্তে আমি অন্য ভাষায় ভাবতে আর নিজেকে ব্যক্ত করতে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম । সেই এক ভয় - যদি আবার কেউ হেসে আমার বাঙ্গালিয়ানা নিয়ে প্রশ্ন তোলে ।

বয়েস বাড়ার সাথে সাথে সচেতনতা হয়ত কমে গিয়েছে । বা এটাও হতে পারে যে নিজের অদ্ভুত উচ্চারণ নিয়ে লজ্জাবোধ কমে গিয়েছে । আমাকে হিন্দিতে কথা বলতে যাঁরা শোনেন তাঁরা অনেকেই অবাক হয়ে যান যখন বলি আমি বাঙালি । তখন সড়গড় বাংলায় কথা বলি, যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে আমার প্রথম ভাষা বাংলা । ওই ভাষার হাত ধরেই নিজের শিশু মনের ভাব ব্যক্ত করতে শিখেছিলাম । যদিও এখনও ''পেট'' কে মাঝে মধ্যেই ''প্যাট'' বলে ফেলি । হলই বা গণ্ডগোলে, তবুও আমার মজ্জাগত ভাষা তো বাংলাই । ছেলেকে আদর করার সময় তাই ''ডার্লিং'' বা ''বেবি'' বেরোয় না মুখ দিয়ে, ''ময়না পাখী'', ''সোনা বাবা'', এগুলোই মাতৃ মনের সাবলীল আন্তরিকতা প্রকাশ করে ।

এটাই বোধহয় মাতৃভাষার আসল সংজ্ঞা ।

— প্রবন্ধ —

বাংলা কবিতা ও পাঠক

স্বরভানু সান্যাল

এক দিদির সাথে কথা হচ্ছিল কবিতা নিয়ে। আমি বললাম শিল্পের মধ্যে একটা সিরিয়াসনেস আছে আর তার কাছে পৌঁছনর পাঠকের একটা দায় আছে সেটা আজকে অনেক পাঠকই মনে করেন না। আসলে আমাদের এই নগর জীবন আমাদের প্রতিনিয়ত এতটাই ক্লান্ত করে দেয় যে, সাধারণ মানুষ তখন খোঁজে সস্তা বিনোদন। কবিতা পড়তে হলে অথবা বুঝতে হলে নিজের সাথে একটা আত্মিক যোগ লাগে। কিন্তু নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে আজ অনেকেই নারাজ। মাথাটা জলের ওপরে ভাসিয়ে সাঁতার কেটে নদীটা পেরিয়ে যেতে পারলেই বেঁচে যায়। দু হাতে নাক টিপে জলের নিচে ডুব দিতে মোটেই চায় না আজকের মানুষ।

গল্পের তাও কিছু পাঠক আছে। তার একটি কারণ গল্পে-পাঠককে নিজের মন-সরসীতে ডুব দেওয়ার দরকার পড়ে না। মানুষের স্বাভাবিক একটা কাহিনী ক্ষুধা থাকে। সেটাই তাকে কাহিনীর খোঁজে কখনো কখনো গল্প-নদের ধারে নিয়ে যায়। দিব্যি সেই ক্ষুধা চরিতার্থ করে গল্পের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া যায়। এ কথা বলছি না যে গল্পের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন গভীর অর্থ থাকে না, কিন্তু সেই অর্থটাকে না খুঁজে পেলেও গল্পের স্বাদটা অনেকটাই পাওয়া যায়। আর অর্থটা খুঁজে পেলে সেটা হল উপরি পাওনা। সাহিত্যের খোঁজে কবিতা-নদীর পাড়ে কেউ যায় না তেমন। কবিতার মধ্যে সুললিত ভাব আর কবির মগ্ন চিন্তা ছাড়া আর কিছু নেই। বিশেষ কোন সুর না বাজিয়ে বীণার ছড় কেটে যাওয়ার মত বিমূর্ত তার প্রকাশ। কবিতার সেই ছন্দবদ্ধ বিমূর্ততার প্রয়োজন আজ আর বিশেষ নেই। যে কজন কবিতার কাছে আজও যায় তাদের মধ্যে আবার অধিকাংশই হল যারা নিজেরা অল্পবিস্তর কবিতা রচনা করে। নিজের লেখা অন্যকে পড়ানোর জন্য এক ধরনের পারস্পরিক সহযোগিতায় অন্যের লেখাও কিছু কিছু পড়ে তারা। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। কিন্তু আমি সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠকের কথা বলছি। এই পর্যন্ত পড়ে আপনি হয়তো বলছেন কবিতার সমঝদার লোকের সংখ্যা চিরকালই কম ছিল। যেকোন ধ্রূপদী আর্ট ফর্মই অল্প কিছু সংখ্যক মানুষই উপভোগ করতে পারে। ''মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান'' বললে অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই একটা অদৃশ্য বিরহ তন্ত্রী বেজে ওঠে না। কবির মনের মৃত্যুচেতনা, সমাজ বা ইতিহাস চেতনা অধিকাংশ মানুষকেই আকৃষ্ট করে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মুখে ড্যাফোডিলের রূপ বর্ণনা শুনে বেশিরভাগ মানুষেরই মনে কোন নৈসর্গিক সৌন্দর্যের ছবি চিত্রিত হয় না। এই কবিতা প্রেমীর সংখ্যা কেন কমে যাচ্ছে সেটা বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যায় গানের মধ্যে যেমন ধ্রুপদী সঙ্গীত, চিত্রকলার মধ্যে যেমন Impressionistic art, তেমনি সাহিত্যের মধ্যে কবিতা। সোজা কথায় ডুব দিতে হয় মনের গহীনে। কিন্তু আজকের পাঠক সেই নিষ্ঠাটুকু দেখাতে নারাজ। রেডিমেড প্রসেসড ফুড পাওয়া গেলে কষ্ট করে রান্না করে কে ? জাঙ্ক ফুড খেয়ে মনের খিদে মেটাতে পারলে বাড়ি ফিরে স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিকর খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কোথায় ? আসলে রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বাড়িটা কোথায় সেইটাই ভুলে গেছি। বিশ্বায়ণ এসে রাস্তার পরিসর এত বাড়িয়ে দিয়েছে আর বাড়ির পরিসর এত সঙ্কীর্ণ যে বাড়ি ফেরার তাগিদ বোধ করে না বোধ করি কেউই। ময়শচারাইজার দিয়ে কৃত্রিম পেলবতা আনা যায় যখন ত্বকে, তখন স্নানজ স্নিগ্ধতার প্রয়োজন কি ? মনটাকে স্নান করানোর প্রয়োজন আজ আর তেমন পড়ে না। তাই আজকের শ্রোতা-পাঠক গলা উঁচিয়ে বুক দাপিয়ে বলতে পারে,

''কবিতা-টবিতা বুঝি না মশাই। কোন সোজা সাপটা ছড়া থাকলে শোনাতে পারেন। আপত্তি করব না।''

লঘু আর অশ্লীল এই দুই ধরণের আর্ট ফর্মের বিপণন ক্ষমতা চিরকালই বেশি ছিল। কিন্তু এখন আমাদের প্রযুক্তিগত উন্নতি আজ যেটা দিয়েছে সেটা হল সেই সব আর্টফর্মের লার্জ স্কেল কমার্সিয়ালাইজেশান বা বাণিজ্যকরণ। যেমন ধরুন আগেকার দিনে লোকজন শুনতে যেত অশ্লীল কবির লড়াই। অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি দেখে কিন্তু কবির লড়াই কেমন ছিল তাই নিয়ে ধারণা তৈরী

করবেন না । মূলতঃ গালাগালি কেন্দ্রিক ছিল তর্জা, খেউর ইত্যাদি । আর আজকের যেটা পর্ণ আর্ট আর আইটেম নাম্বারের নামে নগ্নতা তার তখনকার দিনের সংস্করণ ছিল বাঈজি নাচ । কিন্তু যদি ইতিহাস ঘেঁটে দেখেন, এই সব কটি আর্ট ফর্মের সাথেই একটি নিম্নরুচির তকমা ছিল । জমিদার ও বাবু প্রজাতির লোকেদের এবং তাদের তাঁবেদার গোষ্ঠী ছাড়া বাকিদের কাছে এই ধরণের মনোরঞ্জন কিছুটা হলেও লজ্জাকর ছিল । বিবেকবোধ জাগ্রত করার জন্য বা নৈতিক অবমূল্যায়ণ নিয়ে লেকচার দেওয়ার জন্য আমি এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিনি । যার যা ইচ্ছে হয়, সে সেটা অবশ্যই দেখতে পারেন । আমার তাতে কিচ্ছু বলার নেই । সেই ধরণের কনটেন্ট যারা নির্মাণ করছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও আমার কোন জেহাদ নেই । আমি শুধু একটি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে চেষ্টা করছি কবিতার থেকে পাঠকের এই দূরে চলে যাওয়ার কারণ কি ? এই বিমুখতা কিসের জন্য ?

অর্থের আস্ফালন তৈরী করেছে এক নব্য স্বাভাবিক ।

এ তো গেল পাঠকদের কথা । কবিতার প্রতি এই প্রবল অনীহার জন্য আজকের কবিরাও দায় এড়াতে পারে না । কবিদের ভিড়ে বেনো জলের মত ঢুকছে অজস্র অকবি । আর তারা উঁচু গলায় নিজের অস্তিত্বের জানান দিয়ে কবিতার ক্ষেত্রে এনেছে ভীষণ একটা সুরহীন কোলাহল । নতুন কোন ধারা গড়বার মত সৃজনশীলতা না নিয়েই এরা প্রতিষ্ঠিত সমসাময়িক কবিতার ধারাকে ভেঙ্গেছে । প্রথম যখন রাবীন্দ্রিক কবিতার ধারা ভেঙ্গে চুরে তাকে আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন সমর সেন, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাসের মত কবিরা তাঁরা কিন্তু ভাঙবেন বলে ভাঙ্গেন নি । সকলের নাম করতে না পারলেও যে তিনজনের নাম করলাম একটু ওনাদের লেখা পড়লেই বুঝবেন তাঁদের ছন্দ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ছিল । তাঁরা ফরাসি, ইংরেজি ভাষা সাহিত্য থেকে নিয়ে এসেছেন সিম্বলিজম, ইম্প্রেশানিজম, সুরিয়ালিজম । তাঁরা বাংলা কবিতাকে প্রকৃত সমৃদ্ধ করার প্রয়াসে নতুন ধারা প্রণয়ন করেছিলেন । কিন্তু সেই ইম্প্রেশানিজম এর হাত ধরে, ইম্প্রেশানিজম এর নাম করে বাংলা কবিতায় পরবর্তীকালে এসেছে এক অসহনীয় দুর্বোধ্যতা । এসেছে এমন কবিতা যাকে কবিতা না বলে ধাঁধা বললেও সত্যের বিশেষ অপলাপ হয় না ।

মডার্ণ পোয়েট্রি বা আধুনিক কবিতার একটা বৈশিষ্ট্য হল রূপকের অবতারণা করলে সেটা কোন বস্তুর সাথে তুলনা করা হচ্ছে তা সরাসরি না বলা । কিন্তু সূক্ষ্মভাবে সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার একটা দায় কবির থাকে । কবিতার অর্থ বোঝানোর ব্যাপারে পাঠকের সাথে কবিরও যে কিছু দায় থাকে সেটা এই ধরণের কবিরা সামগ্রিকভাবে অস্বীকার করে । আমি নিজে কিছু কবিকে কবিতায় ব্যবহৃত রূপকের মানে জিগেস করে উত্তর পেয়েছি ''বোঝাতে পারব না । নিজে বুঝে নিন ।'' উত্তর দেওয়ার ঢং দেখে মনে হয় কবি নিজেও নিজের কবিতার মানে ওই ভাসা-ভাসা বুঝেছেন । স্বরচিত কবিতাও সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে ও বোঝাতে তাঁরা অপারগ । আর আজকের বাংলা কবিতার আর একটি প্রধান সমস্যা চোখে পড়ে যেটা, সেটা হল জনপ্রিয়তা বা পপুলারিটিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করার ঔদ্ধত্য। ইন্টেলেকচুয়ালদের এক ধরণের কবিতার প্রয়োজন যেমন আছে, সাধারণ নট-সো ইন্টেলেকচুয়ালদেরও অন্য এক ধরণের কবিতার প্রয়োজন আছে । এমন কবিতা যা বুদ্ধির থেকে হৃদয়ের কাছে আবেদন বেশি করে । গদ্য কবিতার সাথে ছন্দ এবং অন্তমিল থাকা কবিতার প্রয়োজনও আছে। ভালোবাসে সাধারণ পাঠক সে কবিতা শুনতে ।

কবিতার সংজ্ঞা হিসেবে জীবনানন্দ দাসের একটি লেখা থেকে উদ্ধৃত করি ''কবির চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সতন্ত্র সারবত্তাকে কল্পনার মোড়কে পরিবেশন করার নাম কবিতা'' । খুবই সুন্দর একটি ভাবনা । সংজ্ঞাটিকে নিয়ে একটু বিস্তারিত ভাবলে বোঝা যাবে — কবির মনন ও বৌদ্ধিক বিকাশ তৈরী করবে কবিতার হাড়-মাংস-মজ্জা ইত্যাদি ভেতরের অত্যাবশ্যক জিনিসগুলি । কিন্তু কবিতার পেলব ত্বকটি তৈরী করবে কবির কল্পনা । কারণ সুন্দর হওয়ার একটা দায় সকল শিল্পের থাকে । অসুন্দরের স্থান নেই শিল্পের মধ্যে । ডার্ক সিম্বলিজম-ই হোক বা ঈশ্বর চেতনা-ই হোক মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের থেকে একটি অন্য বোধে উন্নীত হতে শিল্পের কাছে আসে । কথা-শিল্পের মধ্যে কবিতাকে সর্বোত্তম ধরা হয় । তাই সৌন্দর্যের দায় কবিতা কখনো অস্বীকার করতে পারে না । পৃথিবীর অন্ধকারে ও স্তব্ধতায় মোমের মত জ্বলে ওঠে কবিহৃদয় এবং উদ্ভাসিত করে পাঠক-মানস । প্রাক-নির্দিষ্ট চিন্তা ও মতবাদ ছাপিয়ে থাকবে কল্পনার আলো যা কাব্যকে আভামন্ডিত করবে । কাব্যের মধ্যে থাকবে একটা সংহতি, একটা সঙ্গতি । একটা মনস্বী প্রবন্ধ

আর কবিতার মধ্যে সেখানেই পার্থক্য। জীবন ও সমাজের সমস্যায় উৎকৃষ্ট আলোকের জন্য মানুষ যাবে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন, মহাত্মা গান্ধী, অমর্ত্য সেনের কাছে, অন্যান্য অলোকসামান্য অর্থনীতিবিদ ও সমাজনীতিবিদদের কাছে। কাব্যের মধ্যে লোকশিক্ষা প্রকট ভাবে নয়, অর্ধনারীশ্বরের মত সম্পৃক্ত ভাবে বিধৃত থাকা জরুরি। কবিতার মধ্যে অস্থিরতা, অশান্তি থাকতেই পারে কিন্তু সেটাকেও কাব্যিক ঢঙে, পোয়েটিক ভাবে উপস্থাপিত করতে হবে। নগ্ন বাস্তব পাঠকমনের ইমাজিনেশানকে সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্তি দেয় না। পৃথিবীর ধুলো, বাস্তব, কঙ্কালের বেদিকাঠের ওপর দাঁড়িয়েও অন্য কোন এক পরা-বাস্তবকে ধরতে চাওয়ার নাম কাব্য। বুদ্ধিমান পাঠক হয়তো বুঝতে পেরেছেন আমি কবিতাকে কোনো কল্পনাবিলাস বলতে চাই নি। প্রদীপ জ্বললে যেমন আগুনের সাথে থাকে তার শিখাটি, সেরকম কবির মনন স্বরূপ আগুনের সাথে কল্পনা স্বরূপ শিখাটি কবিতা ও কাব্যকে একটা অন্য মাত্রাচেতনায় উন্নীত করে। কবিতার এই বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে আমার মতে পাঠকই বিচার করবেন কোনটি কবিতা আর কোনটি অকবিতা। সে বিচার করার ধৃষ্টতা আমি করব না।

এই ধরণের কিছু গঠনমূলক আলোচনা হওয়ার পর দিদিটি বললেন ''আজ থেকে তুমিও এই বাংলা কবিতার পুনরুজ্জীবনের একজন সৈনিক।'' আমি বললাম দিদি, সৈনিক কথাটার মধ্যে একটা ভারি বুটের শব্দ আছে, একটা বারুদের গন্ধ আছে। পাঠককে জোর করে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে তো কবিতার কাছে নিয়ে আসা যাবে না। এমন সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা আপনি আসে। তাই কবিতার সর্বমুখিনতাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ছড়া আর কবিতার মধ্যে আমার মতে মূল বিভেদ হল তার ভাবে। তার ছন্দের অনুপস্থিতির মধ্যে নয়।

''গাড়ি করে বাড়ি ফেরে হুকোমুখো হ্যাংলা
চোখা কথা তার আর চোখে জয় বাংলা''

বললে অনিবার্য ভাবে বোঝা যায় এটা কোন ছড়ার দুটো লাইন। কিন্তু ছন্দে লেখা অন্য তিনটি লাইন

''কারা যেন হেঁটে যায়, পায় পায়
ওই মেঠো পথে হায় নিয়ত পথ হারায়
বটবৃদ্ধ ছায়া তার দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়''

পড়লে বোঝা যায় কবি কোনো এক গভীর ভাব থেকে এটি রচনা করেছেন এবং ছন্দ এবং অন্ত মিল থাকলেও এটিকে ছড়ার পর্যায়ে ফেলা যায় না। উপসংহারে শুধু এইটুকুই আবার বলব, কবিতার কাছে পাঠকদের ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব কবি আর পাঠক দুদলেরই ওপর সমান ভাবে বর্তায়। পাঠককেও যেমন একটা সংবেদনশীল মন নিয়ে কবিতার কাছে পৌঁছনোর প্রয়াস করতে হবে, সেরকমই কবিকুলকেও নিজের ঔদ্ধত্য ত্যাগ করে পাঠকের মনের কাছে পৌঁছনোর, পাঠক হৃদয়ের কাছে পৌঁছনর একটা সচেতন প্রয়াস করতে হবে। তবেই পাঠক আর কবি মনের মিলনে এক অপূর্ব সঙ্গীত রচিত হবে।

' সে ছিল বাংলার মেয়ে। রুমালটি মুঠো করে
প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা যেত টিউশনিতে
দু এক পা এগিয়ে দিতে দিতে
দু লাইন লেখা এল। পরদিন আরো দু লাইন।
এইভাবে ক্রমে একদিন
লেখাটি সম্পূর্ণ হয় কোনো এক দোলপূর্ণিমায়'

– জয় গোস্বামী

— প্রবন্ধ —

আমার পুজো, ওদের পুজো

সৈকত দে

এই লেখা যখন লিখেছি তখন দুর্গাপুজো সমাগত প্রায়। আকাশে শরতের ছাড়া ছাড়া মেঘের আনোগোনা। উত্তরপূর্ব ভারতের এই অঞ্চলে যদিও তখনও বেজায় ভ্যাপসা গরম বাতাসে আর্দ্রতার দরুন শরীর ঘর্মাক্ত। কবির কল্পনার 'এসেছে শরৎ হিমের পরশ' এখনও গায়ে লাগে নি। তবুও শরৎকাল বলে কথা। বাঙালির নাকে পুজো পুজো গন্ধ। ভোরের বাগানে ঝরে পড়া শিউলি ফুল। তাতে কি শিশির লেগে থাকে ? দেখা হয়ে ওঠে না আজকাল। কাশফুলের মাঠ দেখা গেল ট্রেনে যেতে যেতে রেললাইনের পাশে। অপু দুর্গা ট্রেন দেখতে কাশফুলের মাঠ ধরেই দৌড়েছিল না ? বড় হতে কি পুজোটাকেও বিসর্জন দিলাম ? ছেলেবেলায় আমার পুজো শুরু হয়ে যেত মাসখানেক আগেই। আসামের ছোট এক শহরতলিতে আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা। স্কুল থেকে ফেরার পথে কুমোর পাড়া। প্রতিমার কাঠামো তৈরি হচ্ছে সেখানে। কাঠ বাঁশের কাঠামোয় খড়ের অবয়ব। তাতে পাটের দড়ি বেঁধে আকার নিচ্ছে মাতৃমূর্তি। কাঁচা মাটির প্রলেপ পড়ছে। রোদে শুকিয়ে কঠিন হচ্ছে। বৃষ্টি হলে বার্নার জ্বালিয়ে শুকোনো হচ্ছে। আস্তে আস্তে আকার ধারণ করছেন মৃন্ময়ী মা। কি সুন্দর তাঁর হাত পা মুখ। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখতাম সব বন্ধু মিলে। ভুলে যেতাম বাড়ি ফিরে খাবার খিদে। মহিষাসুরের পেশীবহুল শরীরের সিক্স প্যাক অ্যাব দেখে আরও বিস্ময়। শুকিয়ে গেলে মায়ের গায়ে রঙের প্রলেপ পড়বে। একে একে আঁকা হবে নাক কান করতলের রেখা। সবচেয়ে অবাক বিস্ময় ছিল ঠাকুরের চক্ষুদান। চোখ আঁকা হতেই যেন মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী রূপ ধারণ করলেন। শাড়ি পরে অস্ত্র শস্ত্র সহযোগে মহিষাসুর মর্দিনী রূপে সিংহ বাহিনী। বাঁধভাঙ্গা আনন্দের উচ্ছ্বাস আর রোমাঞ্চ নিয়ে সেই ছোট্ট আমি-টার জীবনে পুজো আসত।

একই সঙ্গে পুজো আসত সত্য-দা'র জীবনেও। কুমোর পাড়ার সত্য রুদ্রপাল। যার হাতে মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী রূপ ধারণ করতেন। আমরা যখন পুজোর কেনাকাটা নিয়ে মত্ত তখন সত্য-দা একমনে মূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত। গভীর রাত অব্ধি আলো জ্বলত সেখানে। দিনরাত সত্য-দা আর তাঁর সঙ্গীরা প্রতিমা গড়ে চলছেন। যেন নিঃশ্বাস নেবার সময় নেই। কত রকমের কত প্রতিমা। কত রকমের অর্ডার। পছন্দ না হলে বারোয়ারীর বাবুদের গোসা। বায়নার টাকা পুরো দেয় না। কিন্তু প্রতিমা সুন্দর হলেও তো কেউ জিজ্ঞেস করে না কার হাতে গড়া। তবুও কটা টাকা আসে সত্য-দা'র রোজকারের অনটনের সংসারে। অষ্টমী-নবমীর গভীর রাতে যখন অনেক ঠাকুর দেখে বাড়ি ফিরতাম, তখনও সত্য-দা'র কর্মশালায় আলো জ্বলে। ব্যস্ত সত্য-দা গড়ে চলেছেন প্রতিমা। আর দিন পাঁচেক পরেই যে আসছেন মা লক্ষ্মী। দুর্গা পুজো দেখার সময় কই সত্য-দা'র ?

ষষ্ঠীর বোধনে ঢাকে কাঠি পড়ল আর শুরু হয়ে গেল বাঁধভাঙ্গা আনন্দের উচ্ছ্বাস। দূর থেকে ঢাকের বাদ্যি বাজনা কানে আসলেই মন ছুটে যেত প্যান্ডালে। শহরের বিভিন্ন পুজোয় ঢাক বাজাতেন প্রায় বৃদ্ধ অনিল বাবু। আমরা বড় হতে হতে তিনি অশক্ত হলেন। তাঁর জায়গা নিল ছেলে নরেন। খুব ভাল বাজাত। বছরের বাকি সময়টা চাষ-বাস করত। সে বছর নরেনের বিয়ে হল। ভাবলাম এবার বুঝি নরেন আর বাজাবে না। ষষ্ঠীর বোধনে ঢাক হাতে নরেনকে দেখে বেশ অবাক হলাম। চেপে ধরলাম ওকে। এবারও ঢাক ? নরেন বলে গেল তার কাহিনী –

এবছর বৃষ্টি ভালই হল। ফসলও মন্দ হয় নি। সাহস করে নরেন আরো দুটো জমি বর্গা নিয়েছিল। অর্ধেক মালিককে দিতে হবে। তা দিলেও মোটামুটি বেশ কিছু পেয়ে যাবে নরেন। তবুও কাল ঢাকটা একটু টান করতে বসতেই শম্পা বলল – 'হ্যাঁ গো, এবার কি শহরে না গেলেই নয় ?' কি বলবে নরেন ? বাপ ঠাকুরদার পেশা কি অসম্মান করা যায় ! একবছরও বিয়ে হয় নি, তাও পুজো তে শম্পা কে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে যেতে হবে শহরে। যেতে কি ওরও ইচ্ছে হয় ! সকালে দুটো চিঁড়ে মুড়ি পোঁটলায় বেঁধে বাসের ওপরে ঢাক চাপিয়ে ৫ ঘন্টার রাস্তা শহর। সেখানে গিয়ে আবার ঢাকিদের লাইন। বারোয়ারীর বাবুরা এসে বাজাতে শুনবেন, দাম দর করে বুক করবেন। পুজোর চারদিন সমানে ঢাক বাজানো।

দুপুরে রাতে খিচুড়ি। মাঝে দয়া হলে একটু ভোগের চাল মুলো মিষ্টি। দশমীর দুপুরে ট্রাকে ঠাকুর যাবেন, সঙ্গে যাবে ইয়া ইয়া সাউন্ড বক্স। সেই গান বাজছে, বন্ধ হচ্ছে। কিন্তু ঢাকির থামার উপায় নেই। বাবুদের নাচের সঙ্গে হেঁটে যেতে হবে। হেঁটে হেঁটে কাঁধে ঢাক ঝুলিয়ে সমানে বাজানো। হাত ব্যথা করে, শরীর ভেঙ্গে আসে। থামলেই বাবুদের চীৎকার ধমক – 'এই ব্যাটা, থামলি কেন, বাজা বাজা!' শরীরের রক্ত জল হয়ে বেরোয়। এবার তার সঙ্গে মিশবে শম্পার চোখের জল। তবুও তো দুটো পয়সা আসে। এই সেদিন রায়বাবুর দোকান থেকে শম্পাকে লুকিয়ে যে শাড়িটা এনেছিল নরেন, সেটার টাকা শোধ হয়ে যাবে। শাড়ি পেয়ে শম্পার চোখের খুশীর ঝিলিকের জন্য এটুকু কি আর কষ্ট। প্যান্ডালে রাতে মশার কামড়ে যখন ঘুম আসে না, বিসর্জনের পর যখন শরীরটা ছেড়ে দেয়, শুধু ওইটুকুই তো সাথে থেকে যায়। ঢাকের চামড়ার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে নরেন ভাবে – পুজো আসছে।

পুজো আসে অনিমা-দি'র জীবনেও। বর কারখানায় কাজ করে যা রোজগার করে, তাতে চারটে পেট চলে না। তাই অনিমা-দি কেও উপায় করতে হয়। করতে হয় লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ। বাকি কটা ছোট খাটো হলেও ঘোষাল বাড়ির কাজ বড়। মাইনেও বেশি। ঘোষালদের একান্নবর্তী পরিবার। প্রতিবেলা ১৫/২০ টা পাত পড়ে। গিন্নিমার একটাই শর্ত – পুজোয় কিছুতেই ছুটি করা চলবে না। তখন ঘোষালদের অনেক আত্মীয় স্বজন, বাইরে পড়তে যাওয়া বা চাকরি করা পরিবারের সদস্য সব পুজোর ছুটিতে বাড়ি আসে। রোজ তিন বেলা ২৫/৩০ জনের রান্না। কোন বার আরো বেশিও হয়। তার ওপর দফায় দফায় চা-জলখাবার। সকাল থেকে রাত ঘোষালদের হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতেই পুজো আসে, চলে যায়। বাচ্চাদের নিয়ে ঠাকুর দেখা হয় না। বাচ্চাগুলো আগে খুব কান্নাকাটি করত। এখন মানিয়ে নিয়েছে। ঘোষাল গিন্নী রোজ অনেক খাবার দিয়ে দেন অনিমার আর বাচ্চাদের জন্য। বাচ্চারা মুখিয়ে থাকে সেই সব মহার্ঘ্য স্বাদু সুস্বাদু খাবার চাখার লোভে। তা ছাড়া প্রায় দ্বিগুণ মাইনেও পাওয়া যায়। সঙ্গে শাড়ী কাপড় তো অবশ্যই। বেড়াতে আসা আত্মীয় স্বজনারও ফিরে যাবার সময় এটা সেটা দিয়ে যান। সঙ্গে হাতে গুঁজে দেন কিছু বখশিস। এ যে অনেক পাওনা। সেটার জন্য দুর্গা ঠাকুরকে না হয় নাই দেখা হল ঘুরে ঘুরে। বাচ্চাগুলোর শুকনো মুখে চারটে ভালমন্দ তুলে দিতেই অনিমা-দি'র আনন্দ। দিনের শেষে যখন বাচ্চাগুলো হামলে পরে পেট পুরে খায়, অনিমা-দি'র চোখ ভরে ওঠে। কিছু কান্না কিছু খুশি নিয়ে আবারও পুজো আসে অনিমা-দি'র জীবনে।

আর এই খাবার নিয়েই পুজো আসে শঙ্করের। শহরের বড় রেস্তোরাঁর ওয়েটার শঙ্কর। এমনিতেই এই রেস্তোরাঁর বেশ নাম ডাক। তার ওপর পুজো এলে তো কথাই নেই। সময় পাওয়াই ভাগ্যের ব্যাপার। বাঙালি পুজো দেখতে বেরোবে আর বাইরে খাবে না, তা কি হয়! তাই খুব ভিড় লেগে থাকে সারাদিন। রেস্তোরাঁও খোলা। পুরো দিন এবং রাত তিনটে অব্দি। ঝন্ ঝন্ টুং টাং প্লেট ডিশ চামচের ঠোকাঠুকি। গরম খাবারের অর্ডার। শঙ্করের দম ফেলার ফুরসত নেই। ক্লান্তি গ্রাস করলেও বসার জো নেই। বাড়িতে বাবা মা ভাই বোন সবাইকে দেখতে হয় শঙ্করের। তাই পুজোর কটা দিনের কিছু বাড়তি টাকা খুব উপকারে আসে। আর তার থেকেও বড় আশা টিপস পাবার। প্রতি বিলের সঙ্গেই ভাল টিপস পাওয়া যায়। মালিক বোনাসও দেন। সেই সব মিলিয়ে কিছু বাড়তি রোজগারের লোভ সামলানো যায় না। সবাইকে কাপড় জামা কিনে দিতে হলে এই টাকা যে খুবই দরকার। তাই দুর্গা মা মণ্ডপে থাকলেও শঙ্করের সময় নেই দেখা করার। কাজের মধ্যেই পেন্নাম ঠোকে মনে মনে। দিনের শেষে রকমারি খাবারের সারাদিনের গন্ধে কখনও গা গুলিয়ে ওঠে। কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। তাও জোর করে দুটো গিলতে হয়। নইলে পরদিন লড়বে কি করে। কষ্ট আর টাকা মিলেমিশে শঙ্করের পুজো বাবুদের প্লেটে গড়াগড়ি খায়।

এই করেই পুজো আসে পুজো যায় সত্য-দা, নরেন, অনিমা-দি, শঙ্করের জীবনে। সেই সঙ্গে পুজো আসে যায় সারারাত ট্রাফিক সিগন্যাল সামলানো ট্রাফিক কনস্টেবল রমেশ বাবুর, রাস্তার কোণায় অন্ধকারে মুখে রঙ মেখে দাঁড়ানো দেহোপজীবিনী চুমকির, বড় পুজোর মণ্ডপের পাশে রোল-চাউমিনের স্টল দেয়া মিঠুনের। দুটো বাড়তি টাকার হাতছানি দিয়ে পুজো আসে পুজো যায়। জীবন বদলানোর স্বপ্ন নিয়ে পুজো আসে পুজো যায়। সত্যি কি কোনদিন কিছু বদলায়? না বদলাক, তবুও দিন বদলের স্বপ্নটাই তো কত সুখের। তাই বিজয়ার ঢাকের শব্দে মন থেকে বেরিয়ে আসে সেই আশা – আবার এসো মা।

— স্মৃতিচারণ —

ডিস্‌ওরিয়েন্টেড বা দিকভ্রান্ত

মনীষা বসু

এবার দুমাস পাঁচদিন পর দেশ থেকে ফিরে এসে সব কিছুই যেন অন্য রকম লাগছে। কথা, কাজ, বাজার হাট, খাওয়া দাওয়া সব কিছুই কেমন যেন গোলমেলে গোলমেলে লাগছে। মনে হচ্ছে আপনাদের ঠিক বোঝাতে পারছিনা কি বলতে চাইছি। মানে কেমন যেন ডিস্‌ওরিয়েন্টড লাগছে নিজেকে। অনেক ডিকশনারি ঠিকশনারি ঘেঁটে ঠিক যুতসই কোন বাংলা শব্দ না পেয়ে ডিস্‌ওরিয়েন্টেড কথাটাই মনে হল আমার এখনকার মনের অবস্থা প্রকাশের জন্য উপযুক্ত। যদিও ডিকশনারিতে দেখলাম ডিস্‌ওরিয়েন্টডের বাংলা মানে হলো দিকভ্রান্ত। সেটাও বোধহয় ঠিক।

যাকগিয়ে যা বলছিলাম ফিরে আসার ঠিক দুদিন পরেই একটা অন্নপ্রাশনে যাবো বলে তৈরী হয়ে আমার বর, শ্যামলকে বলেছিলাম — 'আজকে আমিই ড্রাইভ করি, তোমার তো মনে হচ্ছে এখনো ঘুম পাচ্ছে'।

শুনে ওকে বেশ খুশিই মনে হয়েছিল। ওমা গাড়ীতে উঠতে গিয়ে দেখি ড্রাইভারের সিটে ও বসে আছে!

'কি হলো অ্যাকসিডেন্ট করার শখ হয়েছে নাকি' — বিরক্ত হয়ে বলব বলে দরজা খুলতে গিয়েই নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছিলাম। মাথা নেড়ে নিজের মনেই ভেবেছিলাম — 'ও হরি এখানে তো লেফট হ্যানড ড্রাইভিং।' ভাগ্য ভালো যে কিছু বলে ফেলিনি। তাহলেই তো রাম-রাবণের যুদ্ধ লেগে যেত। জোর বেঁচে গেছি।

তারপর সাতদিনের মাথায় আবার সানিভেল ক্যালিফোরনিয়া গিয়েছিলাম নাতনী খুকুমণির অন্নপ্রাশনে। জেট ল্যাগ কাটা তো দুরের কথা তখনও ভালো করে গায়ের ব্যথাও কমেনি। প্রায় চব্বিশ ঘন্টা ব্রিটিশ এয়ার ওয়েসের জাম্বো জেটে কাটানোর পর সানিভেল যাবো বলে সাউথ ওয়েস্টের প্লেনে উঠে মনে হচ্ছিল কি ছোট্ট প্লেনটা, একেবারে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। শরীরটা যেন কেমন অস্থির অস্থির লাগছিল। একে তো সকাল আট-টার ফ্লাইট ধরার জন্য ভোর রাত থেকে ছোটাছুটি তার ওপর আবার এই ছোট প্লেন।

বিরক্ত হয়ে শ্যামলকে যেই বলেছি — 'দেখছ কি একটা ছোট্ট প্লেন দিয়েছে। কোন মানে হয়। চার ঘন্টা কি করে যাবো ? এত দূরের ফ্লাইট একটা ভালো বড় প্লেন দেবে তো'।

আমার কথা শুনে ততোধিক বিরক্ত হয়ে ও বলেছিল — 'ছোট্ট প্লেন দিয়েছে ? কি বলছ ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? সাউথ ওয়েস্টের প্লেন তো সব সময় এরকমই থাকে। মনে হচ্ছে যেন এই প্রথম উঠেছ ? সাউথ ওয়েস্ট তো তোমার-ই ফেভারেট এয়ার লাইনস্। এমনিতেই টায়ার্ড তার ওপর যতসব বাজে কথা। একটু যে ঘুমাবো তার উপায় নেই। দেশ থেকে ফিরে এসে কি যে আরম্ভ করেছ না তুমি'।

আসলে দুজনেই তখন ক্লান্ত, চোখে ঘুম। না হলে আপনারাই বলুন আমার একটা ইনোসেন্ট্ মন্তব্যতে এতটা রিএক্ট্ করা কি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না। যদিও রাত্রে ওর ঘুমের কিছু কমতি হয়নি যে প্লেনে উঠেই ঘুমাবার জন্য ব্যস্ত হতে হবে। সুটকেস্ গুছিয়ে ঘুমাতে গিয়ে দেখেছিলাম বাবু বেশ নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন। ভোর পাঁচটায় এ্যার্লম বাজার পর তিন চার বার ডেকে সেই ঘুম ভাঙাতে হয়েছে। সত্যি বলতে কি আমিই ঘুমাতে পারিনি ভালো করে। যাই হোক কথায় কথা বাড়ে তাই আমি আর কথা না বাড়িয়ে সিট্ বেল্ট বেঁধে চোখ বন্ধ করতেই একেবারে ঘুমের দেশে। কখন যে প্লেন আকাশে উঠে গেছে কিছুই বুঝতে পারিনি। হঠাৎ কাঁধে হাল্কা একটা নাড়া খেয়ে চোখ খুলে দেখি এয়ার হোস্টেস হাতে প্যাড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ড্রিঙ্কের অর্ডার নেবে বলে। — 'কফি উইথ ক্রিম, নো সুগার' — বলে শ্যামলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ও তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আমরা পাশাপাশি আইল সিটে বসেছিলাম। হাত বাড়িয়ে ওকে ওঠাতে চেষ্টা করে বিফল হলাম। সেই এয়ার হোস্টেস-ই তখন বাদাম, চিপস আর কুকি ভর্ত্তি বিরাট এক বাক্স নিয়ে সবাইকে দিতে দিতে আসছিল।

আমার সামনে বাক্সটা ধরে হেসে বলল — 'আই

ওলসো ট্রাইড টু ওয়েক হিম আপ, বাট নো লাক । মাস্ট বি বোথ অফ ইউ আর ভেরী টায়ার্ড' ।

চিনে বাদাম আর চিপস্ নিতে নিতে আমি লাজুক হেসে, (কারণ জানিনা তো আমাকে জাগাতে ওর আবার কতটা সময় লেগেছে) বলেছিলাম — 'ইয়েস জেট ল্যাগ । উই যাস্ট কেইম ব্যাক ফ্রম ইন্ডিয়া আফটার টু মান্থস' ।

তারপর বেশ ভালো করে বাদাম আর চিপস্ সহ দু-কাপ কফি খেয়ে বাথরুমে যাবো বলে উঠতেই শ্যামল বলেছিল — 'আমাকে একটা চা দিতে বলোতো' ।

ও বাবুর ঘুম ভেঙেছে তাহলে, আশাকরি লম্বা ঘুমটার পর মেজাজটা ও সরিফ হয়েছে । না না মুখে কিছু বলিনি যাস্ট্ নিজের মনেই ভেবেছিলাম । কি দরকার বাবা বললে যদি আবার চায়ের কাপে তুফান উঠে । তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভালো । ওইযে বলেনা বোবার শত্রু নেই ।

'ঠিক আছে' — বলে আমি বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলাম । বাথরুমের কাছেই সব এয়ার হোস্টেসরা বসে গল্প করছিল ।

আমার চেনা হোস্টেসকে বলেছিলাম — 'কুড ইউ প্লিস গিভ আ কাপ ওফ্ র-টি টু মাই হাস্‌বেন্ড । সিট নাম্বার টোয়েন্টিথ্রী' ।

র--টি ? — বলে ও আবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল ।

আমি ও খুব অবাক । এই সোজা কথাটা বুঝতে না পারার কি আছে । তাই আবার বলেছিলাম — 'ইয়েস র--টি, হি ডাস্‌নট টেইক ক্রিম অর সুগার উইথ হিজ্ টি' ।

'ও--ইউ মিন ব্ল্যা--ক টি' ।

এবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে লাজুক হেসে বলেছিলাম — 'ইয়েস ইয়েস ব্ল্যা--ক টি । সরি' ।

আজকাল দেশে প্রায় সবাই র-টি মানে দুধ ছাড়া চা খায় । চা-এর কথা হলেই কোরাস শুনতে পাই — আমি কিন্তু র-টি । মাঝে মাঝে আমার মনে হতো এটা বোধহয় দেশের লেটেস্ট্ ফ্যাশান । আমার কাজের মেয়ে দীপা, ধোপা রমেশ আর হ্যান্ডিম্যান মানিকও বলতো — 'দিদি আমাকে র-টি দিও' ।

তাও ভালো যে লিকার টি বলিনি । দেশে অনেকে আবার লিকার-টি ও বলে । ও যদি লিকারকে আবার লিকিওর বলেছি ভেবে চায়ের সাথে মিশিয়ে শ্যামলকে দিতো তাহলেই হয়েছিল আর কি । খুকুমণির অন্নপ্রাশনের সাথে সাথে আমদের বিবাহ বিচ্ছেদ ও হয়ে যেত । লিকিওর তো দূরের কথা ও এক চামচ বিয়ারও খায় না কখনো । তার ওপর আবার এই সাত সকালে ।

এসব ছাড়াও আরো নানা রকমের প্রবলেমও হচ্ছে । যেমন পনের দিনে এতো বিভিন্ন যায়গায় ঘুমিয়েছি যে, মানে কলকাতা থেকে শিকাগোতে এসে সাতদিনের মধ্যেই জয়ের বাড়ি স্যানিভেল যাওয়া, তারপর ওখানে আটদিন থেকে আবার শিকাগো ফেরা । এর মধ্যে জয়ের বাড়িতে এতজনের ঘুমোবার জায়গা ছিলনা বলে আবার চার রাত্রি আমি আর সুনন্দা হোটেলেও ঘুমিয়েছিলাম । তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রায়দিনই বুঝতে পারিনা কোথায় আছি । নিজের মনেই প্রশ্নোত্তর চলে — 'এটা কি কলকাতা? না-না আমিতো এখন সানিভেল, দুর এ তো বাররিজে আমার নিজের বিছানায় শুয়ে আছি' ।

তারপর এইতো গত কয়েকদিনের বৃষ্টি, ঠান্ডা আর মেঘলা দিনের পর গত শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই ঝকঝকে রোদ দেখে আনন্দে আমার দুই কুকুরবাবু — দুষ্টু আর রাক্ষসকে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়ে সেকি বিড়ম্বনা । দুষ্টুবাবুর পার্সোনালিটি তো জানেন আপনারা । মাথায় যখন যেটা উঠবে সেটাই তখন করতে হবে । ওই যে বলে না উঠল বাই তো কটক যাই । হঠাৎ ঠিক করেছে রাস্তা ক্রস্ করে উল্টোদিক দিয়ে হাঁটবে । কি আর করি ভালো করে রাস্তা দেখে যেই পেরতে গেছি ওমনি শুনি ক্যাঁ---চ করে ব্রেকের শব্দ । তাকিয়ে দেখি বিরাট এক এস-ইউ-ভি দাঁড়িয়ে আছে আর এক সাহেব কটমট করে তাকিয়ে দেখছে আমাদের । আসলে ওটা ছিল ওয়ান ওয়ে আর যথারীতি আমি উল্টো দিক চেক্ করে রাস্তা ক্রস্ করছিলাম । ওই আবার সেই লেফ্ট আর রাইট হ্যান্ড ড্রাইভিং-এর প্রবলেম । আর একটু হলেই তো আপনারা এতক্ষণ আমার এই লেখা পড়ার পরিবর্তে আমার obituary পড়তেন ।

এইজন্যই ভাবছি দেশে দু-মাস তো বেশ ভালোই আনন্দ করে কাটিয়েছি কিন্তু ফিরে আসার পর আমার এই ডিস্‌ওরিয়েনটেড বা দিকভ্রান্ত অবস্থা আর কত দিন ভোগাবে আমাকে ।

— স্মৃতিচারণ —

ছেলেবেলার কথা

বানী ভট্টাচার্য্য

এখনও আমার মনে পড়ে আমার বাবার সেই কালো মুখটা আর চোখ ভরা জল । পশ্চিমের নীল আকাশে বহুদুরে ঘোলা সূর্য্য প্রায় ডুবুডুবু । সারাদিন পরে গরমের তাপে অর্ধদগ্ধ হয়ে একটা পাতলা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বাবা বোধহয় বসেছিলেন বারান্দাতে, একটুখানি হাওয়াতে গা টা জুড়োতে । আমাকে দেখেই বাবা চোখের জল ডানহাতে করে মুছে নিলেন যতদূর সম্ভব আমাকে এড়িয়ে । সময়টা হচ্ছে উনিশসো ষাট সাল । আমি মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হয়েছি সবে । আমার দিদি কলেজে উচ্চশিক্ষায় রত । আমার পরের বোনও কলেজে যেতে আরম্ভ করেছে । আর আমার অনেক পরের বোন খুবই ভালো করছে হাইস্কুলে । আমাদের ভাই নেই । আমার বাবা ছোটবেলা থেকেই কাজ করে, অনেক কষ্ট করে, নিজের রোজগারে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, বোনের বিয়ে দিয়ে, তারও বারোটা ছেলেমেয়েদের মানুষ করে, অত্যন্ত সৎভাবে জীবনযাপন করে সুন্দরভাবে সংসার চালাতেন । আমার পিশেমশাই টি বি তে আক্রান্ত হয়ে অল্প বয়েসেই এ পৃথিবী থেকে চলে যান । আমার বাবার জীবন ছিল অত্যন্ত সৎ আর গভীর মায়াতে পূর্ণ । তাঁর একটাই লোভ, তা হলো শিক্ষার প্রতি । আমার বাবা মেধাবী ছাত্র হলেও বেশি পড়াশোনা করতে পারেননি বাড়ীর প্রয়োজনে । তাই বোধহয় ছোটোবেলায় আমাদের বোনেদের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, 'তোমাদের সবচেয়ে বড় উপহার যেটা আমি দিতে পারি । সেটা হচ্ছে শিক্ষা ।' মনে মনে তাঁর আশা ছিল মেয়েরা শিক্ষিত হলে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারবে । এটাই আমাদের বাড়ীর কাহিনী ।

মনে পড়ে সেদিনের কথা যেদিন আমার বাবার চোখে জল এসেছিল । আমার সাত মাসী, আমার মা ছিলেন সেজো । মাসীদের সবাইয়ের খুব বড়ো লোকের বাড়ীতে বিয়ে হয়েছিল । হয়তো তাঁরা খুব সুন্দর দেখতে আর ফর্সা ছিলেন বলে । আমার মাও খুব ফর্সা আর সুন্দর দেখতে তবে খুব ছোটোখাটো ছিলেন । সময় পেলেই আমার মাসীরা অনেকে মিলে আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হতেন আর খাওয়াদাওয়া করে, অন্য লোকেদের সম্বন্ধে আলোচনা করে, বিকেলে বিদায় নিতেন । আমাদের মোটর গাড়ি ছিল না, এদিকে আমার খুব মোটর গাড়ি দেখার আর চড়বার শখ । সে রবিবার দিনটায় সারাদিন সকাল থেকে বারান্ডাতে চলাফেরা করছি, বাড়ির সামনে অনেকগুলো মোটর গাড়ি এসে উপস্থিত হবে বলে । অবশেষে একটা ছোটো মতন মোটর গাড়ি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়ালো । আমি দেখতে লাগলাম একজনের পর একজন মাসিমা নামছেন তাদের সব ছেলেমেয়ে নিয়ে । অবশেষে সব মিলিয়ে তেরজন নামলেন সেই মোটর গাড়ি থেকে । সবচেয়ে বড়লোক মাসিমা বললেন আমাদের, 'গল্প করতে করতে সবাই একসঙ্গে আসার মধ্যে মহা আনন্দ ।' আমার দিদি পরে আমার কানে কানে বলে ছিলো, 'পেট্রলের দাম বাঁচাচ্ছেন ওরা ।' তারপর খাওয়া দাওয়া করে, হাজার রকমের মতামত দিয়ে বিদায় নিলেন তাঁরা গাড়িতে ঠেসাঠেসি করে বসে, বিকেল পাঁচটা নাগাদ । আমার সে রবিবার দিনটা মহা আনন্দে কেটে গেল মাসিমাদের গুঞ্জনে । বিশেষ করে বড়লোক মাসিমারা যাবার সময় সকলে মিলে আমার হাতে কয়েকটা খুচরো পয়সাও দিয়ে গিয়েছিলেন, যখন আমার মা সারাদিন ব্যস্ত ছিলেন রান্নাঘরে, বড়লোক বোনেদের আপ্যায়ন করে খাওয়াতে ।

সন্ধ্যে হতে চলেছে সেদিন । আমার ঠাকুমার আদেশে আমার কাজ ছিল, বাড়ীর সবাইকে একসঙ্গে করে দালানের তুলসী গাছের কাছে এনে সন্ধ্যের শাঁখ বাজানো আর ঠাকুরকে হাত জুড়ে মন ভরে ডাকা — আমার বাবা আর ঠাকুমা মন্ত্র আওড়াবার ভার নিতেন । তাই আমি গিয়েছিলাম বাবাকে ডাকতে আর সবাইকে সম্মিলিত করতে সন্ধ্যের পুজোর জন্যে ।

বাবাকে খুঁজতে এসে দেখলাম, আমার কঠোর কিন্তু দয়ালু, শান্ত, ভদ্র, স্বল্পভাষী বাবার চোখে জল । জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবা তুমি কাঁদছো ?' আমার সত্যবাদী বাবা তাড়াতাড়ি করে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'চল মা, সন্ধ্যের শাঁখ বাজাতে চল্ ।' আমি বাবাকে ভীষণ

ভালবাসতাম, হয়তো আমার মায়ের থেকেও । আমিও ছাড়বো না । 'বাবা তোমাকে বলতেই হবে আজকে এত আনন্দের মাঝে তোমার মন খারাপ কেন ? আমি বাড়ীর কাউকে বলবো না ।' বাবা জানেন, আমি খুব একগুঁয়ে মেয়ে । আমি সহজে ছাড়বার পাত্র নই । উত্তর না পেলে আমি হয়তো আগ্রহের চোটে বাবার এই দুর্বল মুহূর্ত্তের কথা বাড়ীর সবাইকে জিজ্ঞেস করে বেড়াবো । তাই আমার বুদ্ধিমান বাবা বললেন, 'জানো তোমার মেজমাসী আমাকে বলে গেলেন, আমার মত অবস্থার লোক মেয়েদের এত শিক্ষিত করেছি, ওদের জন্যে উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পেলেও, তাদের পণ দেবার ক্ষমতা আমার কোথায় ? কাজটা আমি ভালো করছি না, তোমাদের চারজনকে এত শিক্ষিত করে । সত্যিই তো আমি রোজ আনি রোজ খাই । বাকী টাকা কটা তোমাদের স্কুলের বইখাতার জন্য খরচ হয় । আমার জমানো টাকা কোথায় ? তোমাদের সমান সমান পাত্র পেলেও তারা তো অনেক টাকা চাইবে । বোধহয় আমি কাজটা ভালো করছি না । তোমার মাসিমা ঠিকই বলেছেন । তবে মনে একটু লেগেছে, ঠিক কথা হলেও ।' তখন আমারও মনটা খারাপ হয়ে গেল, বাবার মনে কষ্ট লাগার জন্যে, আর আমাদেরই জন্যে । আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'বাবা তুমি কিচ্ছু ভেবো না । আমরা বিয়ে করবো না । চলো তুমি সন্ধ্যের পুজো দিতে । দেখো ভগবান সব ঠিক করে দেবেন ।'

বাবাকে হাত ধরে সেদিন আমি উঠোনে নিয়ে এসেছিলাম । না একথা আমি আর কাউকে কখনও বলিনি । আমার এ কথাও মনে আছে ঠাকুরকে বলা, সব কিছু ঠিক করে দিতে ।

আজ আর আমার বাবা নেই । সেই সন্ধ্যে এখনও আমার চোখে ভাসে । সূর্য্য যখন বিদায় নিচ্ছেন, আমার বাবার দুচোখের কোণে দুবিন্দু জল আমাদেরই ভাবনাতে । সেদিন থেকে আজ অনেক বছর পরে মনে হয়, সত্যিই ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই করেন । হয়তো সেদিন সন্ধ্যেতে ভগবানের কাছে আমার প্রার্থনা ভগবান শুনেছিলেন । তাই বোধহয় আমার দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল এক বিলেত ফেরত খুব ফর্সা সুন্দর দেখতে নামকরা ডাক্তারের সঙ্গে, যিনি নিজে এসে দিদিকে দেখা মাত্রই সেইদিনেই বিয়ে করতে চেয়েছিলেন কিছু না নিয়েই । বাবার অনুরোধে একসপ্তাহ অপেক্ষা করেছিলেন । আমার বিয়েতেও আমার বাবাকে কোনো পয়সা খরচ করতে হয়নি, কারণ আমার বিয়ে যাকে বলে এদেশের ভাষায় 'ইলোপ' । বিয়ে হয়েছিল এদেশে পাঁচ ডলারে আর সেটা আমার স্বামীই দিয়েছিলেন । আমার পরের বোনকে আমার এক ডাক্তার বন্ধুর এতই ভালোলেগে গিয়েছিল যে তিনি তাঁর বাবাকে রাজী করিয়ে বিনা যৌতুকে বিয়ে করেছিলেন আমার পরের বোনকে । আমার ছোটো বোনের বরের বাবাও কিছু চাননি যদিও বর ছিলেন আমার বাবারই পছন্দ করা জামাই । যেহেতু আমি যেতে পারিনি সে বিয়েতে, তাই আমিই পাঠিয়েছিলুম কিছুটা বিয়ের খরচ ।

কে বলতে পারে কার ভাগ্যে কি আছে ? কিন্তু বাবার দেওয়া শিক্ষার জন্যেই আমরা আজও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছি । সত্যিই বাবা আমাদের শিক্ষিত করে, আমাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে গেছেন । আজ আমি ভাবি আমার বাবার মত বাবা পাওয়া ভাগ্যের কথা । আমার মাসীমারা বাবাকে হয়তো ভালো উপদেশই দিয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান বোধহয় তখন ওপর থেকে হেসেছিলেন ।

— স্মৃতিচারণ —

যাত্রায় শ্রীকৃষ্ণ হয়েছিলেন উত্তমকুমার

বিশ্বজিৎ মতিলাল

কলকাতার ভবানীপুরের 'গিরিশভবন' । গিরিশ মুখার্জি রোডের এই বিশাল বাড়ি অভিজাত মুখার্জি পরিবারেরই ভদ্রাসন । সেই বাড়িতেই 'লুনার ক্লাব' । মুখার্জি পরিবারের ছেলেদের সঙ্গে দু'-তিন বাড়ি পরের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের ছেলেদের ওঠাবসা । মুখার্জি পরিবারের সঙ্গে আমিও আত্মীয়তার পাশে আবদ্ধ । বালক বয়স তখন, স্নেহময়ী ঠাকুমার নিত্যসঙ্গী আমি । একদিন বললেন 'কাল গিরিশভবনে যাওয়া হবে, জগদ্ধাত্রী পুজোর আমন্ত্রণে । কিন্তু যাওয়া হবে সন্ধ্যায় ।' ওইদিন পূজার অঙ্গ হিসাবেই বাড়ির সবাইয়ের নিশি জাগরণ । সারা রাত ধরে অভিনীত হবে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'নরনারায়ণ', যাত্রাপালার আঙ্গিকে । ঠাকুরমা বললেন 'কৃষ্ণের ভূমিকায় কে অভিনয় করবে জানিস, উত্তমকুমার' ।

আমার সেই বালক বয়সে উত্তমকুমারের চাইতেও বেশি টান ছিল পুজো বাড়ির লুচি পায়েসের প্রতি । হাজির হলাম 'গিরিশভবন'-এ পিসির বাড়িতে । দেখলাম দেবী প্রতিমার সামনে বিশাল উঠোনের মাঝে যাত্রার আসর পাতা হয়েছে । আমাদের দোতলায় নিয়ে যাওয়া হল, সেখান থেকে যাত্রার আসর ভালো ভাবেই দেখা যায় । তিনটি চেয়ার পাতা, মাঝেরটিতে আমি, একপাশে ঠাকুমা আর একপাশে এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা, যিনি আমার অচেনা । দুই মহিলা গল্প করতে লাগলেন, আমি অপেক্ষায় আছি কখন প্রসাদ গ্রহণের ডাক পড়বে । এল সেই আকাঙ্খিত মুহূর্ত । পেট ভরে লুচিতরকারি, পায়েস খেয়ে বালক আমি সেই ঘরেরই খাটে ঘুমিয়ে পড়লাম ।

কতক্ষণ পরে মনে নেই ঠাকুমার ডাকে ঘুম ভাঙল । 'তাড়াতাড়ি আয় এইবার উত্তমকুমার আসবেন ।' গিয়ে বসলাম আবার দুই মহিলার মাঝে । পুরোদমে চলছে যাত্রা । একটু পরেই এলেন তিনি । খালি গায়ে, পরণে হলুদবর্ণ ধুতি । হাতে বাঁশি, মুখে মন ভোলানো হাসি । আসরে প্রবেশ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের । সেই আমার প্রথম উত্তম দর্শন । কিছু পরে ঠাকুমাকে বলতে শুনি পাশের মহিলাকে 'আপনার ছেলে সত্যিই কৃষ্ণ ।' বুঝলাম সেই মহিলা উত্তম জননী । স্মৃতিপটে এই ছবিটি যেমন আঁকা হয়ে আছে, তেমনই মনে পড়ে যায়, আমার বৃদ্ধা পিতামহীর উত্তম আগ্রহের কথা ।

এরও অনেক পরে, আর এক আত্মীয়ের বাড়িতে মাকে নিয়ে একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে গিয়ে সামনাসামনি দেখি উত্তমকুমারকে । আজও মনে আছে আমার মা উত্তমকুমারকে বলেছিলেন 'বিচারক' ছবিতে উত্তমকুমারের অভিনয় কতটা ভালো লেগেছিল । মহানায়ক বোধহয় উত্তরটি আশা করেননি, তবে স্পষ্টতই খুশি হয়েছিলেন । আমার কিন্তু আজও মনে আছে উত্তম দর্শনে আমার মায়ের আগ্রহ । পরেও তিনি সেই স্মৃতিটি সযত্নে লালন করতেন ।

এরপরে, আমার সমবয়সীনিদের মধ্যে দেখেছি, প্রায় একই রকমের কৌতুহল ও উদ্দীপনা, যার কেন্দ্রে উত্তমকুমার । অবাক হয়ে ভাবি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে, কোন মায়ায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন এই মানুষটি ।

মধ্যবিত্ত মননে তাঁর আবেদন চিরকালীন, আজও অম্লান । 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এর রাইচরণ থেকে 'নিশিপদ্ম'-এর অনঙ্গ দত্ত । সব ধরনের চরিত্রেই পেয়েছি আমরা এক চিরকালীন নায়ককেই ।

আমাদের গণমাধ্যমগুলির উত্তমপ্রীতি, চোখে পড়ার মতো । তাঁর জন্মের ও মৃত্যুর মাস দুটিতে পত্রিকাগুলি বার করে বিশেষ সংখ্যা, সংবাদপত্রগুলি ছাপে বিশেষ প্রবন্ধ বা সাক্ষাৎকার, সঙ্গে থাকে চিত্রসম্ভার । প্রকাশনগুলি জানে, আজও পাঠকপাঠিকাদের অন্তরে চিরস্থায়ী আসন পাতা রয়েছে 'নায়ক'-এর অরিন্দমের বা 'সপ্তপদী'-র কৃষ্ণেন্দুর ।

— বিজ্ঞান —

বুঝিবে সে কিসে

শাশ্বতী ভট্টাচার্য

সম্পাদিকা বলে দিয়েছেন, ‘বিজ্ঞান চাই, কিন্তু দেখো ভায়া, বোধগম্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য হয় যেন’ । ইন্টারনেটের সৌজন্যে পাওয়া একটা মর্মান্তিক চুটকি দিয়ে শুরু করি ।

একটা লোক অনেক দিন ধরে চুলকানির সমস্যায় ভুগতে ভুগতে শেষে বাড়ির সবার ঠেলাঠেলিতে এলাকার এক ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে রাজী হলো ।

ডাক্তার রোগীর রোগের ইতিহাস শুনে অনেকক্ষণ চিন্তাভাবনা করে একটা বড়ো শিশির ওষুধ দিলেন, ‘রোজ স্নানের সময় দুই হাতের আঙ্গুলে ভালো করে মাসাজ করবেন’ ।

রোগী খুশি হয়ে বলল, ‘তাতেই আমার চুলকানি চিরতরে সেরে যাবে ? আশ্চর্য, সায়ান্স কি উন্নতি করেছে !’ ।

ডাক্তার বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘না, এটা ঠিক চুলকানি সারার ওষুধ নয়’ ।

রোগী অবাক, ‘এটা চুলকানি সারার ওষুধ না তো এটা কিসের ওষুধ ? আমায় দিলেন কেন ?’

ডাক্তার আগের মতই গম্ভীর, ‘এই ওষুধটা আমি দিয়েছি আপনার নখ বড় হওয়ার জন্য, যাতে চুলকিয়ে আরাম পান’ (১) ।

হায় ! বুঝিবে সে কিসে, কি যন্ত্রণা বিষে, কভু আইভিলতা স্পর্শেনি যারে, কভু মশক কুলে দংশেনি যারে ।

এই চুটকিটার সূত্র ধরে এক বন্ধু আমায় বলেন, ‘‘কি বিজ্ঞান বিজ্ঞান করো ? চুলকানি সারানোর একটা ওষুধ আবিস্কার করতে পারলে না, চাঁদে গিয়ে কি লাভ হলো, তার চাইতে বরং.....’’ ।

চুলকানি আর আঁচড়ানো, ইংরাজী প্রতি-শব্দ ইচ (Itch) আর স্ক্রাচ (Scratch) । মাঝেসাজেই চুলকানোর

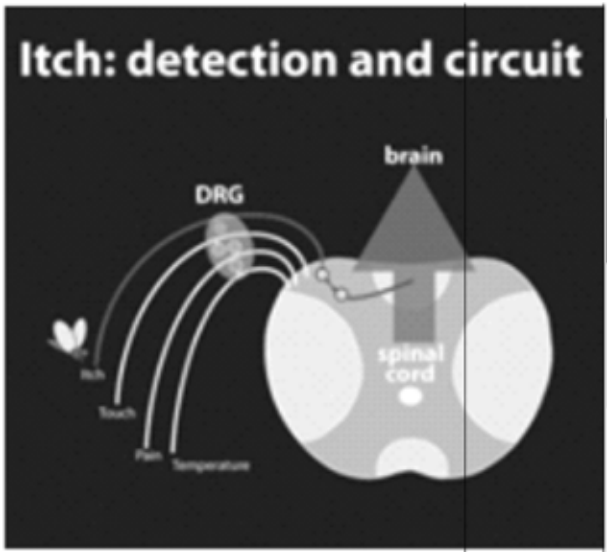

জায়গাটা নাগালের বাইরে থাকে । তখন মাসি, পিসী, যাকে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তার কাছে কাতর অনুনয়, ‘এই একটু চুলকে দাও না ! না না হচ্ছে না, আট্টু বাঁ, না না ডান . . ., হ্যাঁ হ্যাঁ । বেশ ভালো করে . . ., উফ্ তখন থেকে খুঁজছি তোমায় ! কোথায় যে থাকো’ ।

দরকার পড়লে পেন, পেনসিল, লোহার শিক, উলের কাঁটা তো আছেই । নখের আকারে একটা প্লাস্টিকের রডও বাজারে কিনতে পাওয়া যায় । জাংগল বুকের ভালুকে মনে আছে ? চোখ বন্ধ করে ইয়া-বড়ো এক গাছের কান্ডে নিজের পিঠটাকে উপর নীচে ঘষে তার মুখের হাসি ? কেন বা কি এই অনুভূতি, যাকে দমানোর জন্য নিজেরই শরীরের কোন একটা কেন্দ্রে আঘাত করে লাভ করি দারুণ এক পরিতৃপ্তি ?

ইংরাজী প্রুরাইটিক রেস্পন্স (pruritic response), দুটো কাজকে একত্র করলে যা দাঁড়ায়, তার ডাক্তারী নাম । প্রথমটা একটা অনুভূতি, চামড়ার ওপর থেকে যার যাত্রা শুরু, ট্রেনের এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাওয়ার মতো সেই অনুভূতির বার্তা পৌঁছাবে ট্রেনের ইঞ্জিনে, ব্রেন বা মগজে । তড়িঘড়ি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্রেন তখন পাঠাবে হাতকে, ‘এ্যাকশান ! উপর-তলা

থেকে হুকুম এসেছে, এখনই চামড়ার ওপর নখ বা তীক্ষ্ণ কিছুর ছোঁয়া চাই' । সুড়সুড়িটা ওরফে ইচটা কে সামাল দেওয়ার জন্য একটা কিছু কাজ করা হলো, আঁচড়ানোটা সেই রেস্পন্স ।

মনে রাখতে হবে যদি এতোসব কাণ্ডকারখানার পর শেষমেষ আনন্দানুভূতির একটা বড়োসড়ো পারিতোষিক না থাকতো, ওই আঁচড়ানোর কাজটা করতে আমরা যেতামই না । তার সব ভালো যার শেষ ভালো ।

পাঠক ঠিক ধরেছেন, আমি বিবর্তনের দোহাই পাড়তে চলেছি, তবে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখার তাগিদে শুধু-মাত্র মানুষের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকবো, ভালুর কথা আর তুলবো না ।

গড়পড়তা মানুষের দেহে রয়েছে প্রায় কুড়ি স্কোয়ার ফিট চামড়া (২) । বেঁচে থাকার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় ফুসফুস, কিডনী, যকৃত, জঠর ইত্যাদিকে আড়াল করা মস্ত একটা আচ্ছাদন । বাইরের পৃথিবীর সূর্যের ছটা, বৃষ্টি জলের ঝাপটা, হাওয়া, লক্ষ লক্ষ ভেসে বেড়ানো ধুলোর কণা, ফুলের পরাগ, জীবানু, বীজাণু ইত্যাদি থেকে ভিতরের সব অঙ্গসমূহকে রক্ষা করে রেখেছে এই চামড়া । ঠিক যেন বর্ম, অথচ বয়ে বেড়াতে অসুবিধে নেই ! এমন হালকা এটা আচ্ছাদনের অস্তিত্ব আদৌ যে আছে, সারাদিনে আমরা কয়বার সেটা ভাবি ? কচ্ছপ বা শামুকের পরিস্থিতিটা একবার ভেবে দেখুন পাঠক ।

কিন্তু চামড়া শুধুমাত্র আচ্ছাদনই তো নয়, বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ রাখার প্রাথমিক প্রবেশদ্বারও বটে এবং সেই জন্যেই প্রাণ-ধারণের জন্য অপরিহার্য । অতএব এই কুড়ি স্কোয়ার ফিট চামড়ার প্রতিটি ইঞ্চিকে ঠিকঠাক রাখাটাও একান্ত জরুরী । এই চুলকানো এবং আঁচড়ানোর মতো সহজ (কিম্বা কঠিন) যৌথ কাজটা সেই তাড়নায় বিবর্তিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয় ।

এইটুকু বললেই হয়তো কাজ মিটে যেতে পারতো, কিন্তু প্রুরাইটিক রেস্পন্স নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে বসে আলোচনাকে ভাসা ভাসা, অশভীর, ইংরাজীতে যাকে বলে স্কিনডিপ (skin deep) রাখলে চলবে কেন ?

পাঠককে মনে করিয়ে দিই আমাদের শরীর-ঢাকা জলজ্যন্ত এই চাদরটা কিন্তু তিন-তিনটে পরতের বেশ জম্পেশ একটা আচ্ছাদন (৩) । সব চাইতে ওপরের আস্তরণ এপিডারমিসের উপরে স্বাভাবিক ভাবেই ঝড়ঝাপটা সব থেকে বেশী, আবার অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে এপিডারমিস (epidermis) কোথাও ঠাস-বুনুন কোথাও বা আবার ফিনফিনে পাতলা । শীতের দিনে ফাটা পায়ের সাথে যাদের পরিচিতি আছে, তারা জানেন, পায়ের পাতার নীচে গোড়ালীর ধার থেকে মোটা চামড়ার টুকরোটাকে ফরফর করে বাঁধাকপির সব থেকে ওপরের পাতার মতো ছিঁড়ে ফেলতে কোন অসুবিধে হয় না । মামুলি ছড়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে সেরে যাবে । এই পরত কিছুদিনের মধ্যেই নতুন কোষ দিয়ে আবার ভরাট হয়ে যাবে ।

এর পরের পর্দা ড্যারমিস (Dermis) । এপিডারমিসের অনুপাতে দৈর্ঘে অনেকটা বেশী এই ''রোমাঞ্চকর'' পরতের মেলা কাজ । ঘাম আর রক্ত এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা । ভয় বা অনুভূতির প্রভাবে রোমকে যখন সটান দাঁড়িয়ে পড়তে দেখি তার জন্য দায়ী রোমের শিকড়-সংলগ্ন ছোট ছোট পেশী এবং ড্যারমিসে অবস্থিত নার্ভ এন্ডিং (nerve ending) । নদী যেমন এ ঘাট ও ঘাট ঘুরে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে গিয়ে মেশে, এই ড্যারমিসে এসেই থেমেছে আমাদের শরীরের সমস্ত নার্ভ । অতএব, ব্রেন বা মগজ থেকে আসা সিগন্যাল যেমন এই ড্যারমিসের কাছেই আসছে, আবার বাইরের পৃথিবীর যাবতীয় খবরাখবর এই ড্যারমিসের মারফতই যাচ্ছে মগজের কাছে । এর পরের তবক সাবকিউটেনাস ফ্যাট (Subcutaneous fat) । নামটা শুনতে একটু বাজে লাগলেও এই পরতটাই কিন্তু ঠান্ডার সময়ে শরীরকে গরম রাখে । এটা কে ড্যারমিসের সাথে শরীরের সংযোজক অংশ বলা চলে, কেননা এইখানে আছে এমন বিশেষ কিছু কোষের গোষ্ঠি (ওরফে টিস্যু) যেটা ড্যারমিসকে হাড় (Bone) বা পেশীর (muscle) সাথে যুক্ত করে রেখেছে । তাছাড়া ড্যারমিস থেকে আসা রক্ত-নালী এবং নার্ভ এই পরতে এসেই পরিধিতে বৃদ্ধি পায় ।

আমাদের আলোচনা এই ''দুই ধারে দুই কলাগাছ, মধ্যে খানে মহারাজ'' ড্যারমিসটিকে নিয়ে । আগেই বলেছি এই মহারাজটি নার্ভ নদীর সমুদ্র ।

পাঠক, কথা দিলাম সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার আগে, আপনার জন্য ডিঙ্গির যোগাড় করে দেবো । তার আগে

চট করে দেখে নিই, কি ভাবে হেড অফিস, (পড়ুন ব্রেন) উদ্দীপকের (ইং স্টিমুলাস) সাথে মোকাবিলা করে।

কল্পনা করুন বেলা শেষ। কাজের শেষে, চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে আপনি বাইরের বারান্দায়, বসেছেন বেশ মৌজ করে, আর এক বেটা মশা একটুকুন ফাঁকা চামড়া পেয়ে হাউ মাউ খাউ; দিয়েছে এক কামড়।

আমাদের জানা আছে মশার মুখে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জের মতো লম্বা এক নালী আছে। আমাদের ধারণা সুযোগ পেলেই সেই নালীটার মাধ্যমে শরীরের রক্ত-নালীর স্রোত থেকে রক্ত শুষে নেওয়াটাই মশার অভিপ্রায়। অধিকাংশ সময়েই মশা-বাবাজী সেই অভিযানে সফল হন না (কেন না তার আগেই চপেটাঘাতে মৃত্যু বরণ করে নিতে হয় তাকে) তবে ওই যে . . ., ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জটা ড্যারমিস অবধি এসেছে তাতেই বিরক্ত, উত্যক্ত হয়ে উঠবে ড্যারমিসে অবস্থিত বিশেষ প্রকারের রেসেপ্টার (receptor) প্রোটিনের দল।

বলাবাহুল্য এই বার্তা যাকে দিলে কাজ হবে সেটা হলো হেড অফিস। অতএব ড্যারমিসে শুরু হওয়া বার্তা একটি নার্ভ থেকে অন্য নার্ভ, তার পরে স্পাইনাল কর্ড-এর মেট্রো রেল ধরে পৌঁছে যাবে ব্রেনের সেরিব্রাল করটেক্স (cerebral cortex) নামক এক কেন্দ্রে। ব্রেন সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে যা করতে হুকুম দেবে ঠিক একই ভাবে উল্টোদিকে স্পাইনাল কর্ড হয়ে এক নার্ভ থেকে অন্য নার্ভ বেয়ে এসে পৌঁছে যাবে আপনার আঙ্গুলের ডগায়, খচাখচ খচখচ করে খানিকটা চুলকিয়ে নিয়ে আবার চায়ের কাপে চুমুক দেবেন আপনি; বাবাহ্ যা মশা এখানে।

আমাদের স্পাইন্যাল কর্ডে অবস্থিত যে জীন (Gene) এই কাজটা করতে আপনাকে বাধ্য করছে তার বাহারী নামটা হলো gastrin-releasing peptide receptor ওরফে জিয়ারপি আর (GRPR)। জীনটার নামটা লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে এখানে কিছু মোচন বা রিলিজ করার কথা বলা হচ্ছে। তার কারণ এই যে বার্তার কথা লিখলাম, পারমাণুবিক স্তরে তো আসলে কতোগুলো রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ যাদেরকে আমরা ডাকি নিউরোট্রান্সমিটার নামে।

যে নার্ভ কোষ গুলো এই নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়ায় অংশগ্রহন করে তারা নিউরণ (Neuron)। একটি নার্ভ কোষ যেখানে অন্য একটি নার্ভ কোষের সাথে মেশে সেই অংশটুকুর নাম সাইনাপ্স (synapse)। এই সাইনাপ্সে এসেই নিঃসারিত রাসায়নিক নিউরোট্রান্সমিটারটি চালান হয়ে যায় অন্য নার্ভের পরিধির মধ্যে।

প্রসঙ্গত, ড্যারমিসের স্তরে রিসেপ্টর এবং নিউরণ নিঃসৃত নিউরোট্রান্সমিটারের কার্যকলাপের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা লঙ্কার জ্বালা টের পাই, গরম ইস্তিরীতে হাত পড়লে ছিটকে সরে আসি, সূঁচ ফুটে গেলে হাত সরিয়ে নিয়ে ''উফ মাগো'' বলে উঠি। তাই বহুদিন ধরে বিজ্ঞানী মহলের বিশ্বাস ছিলো চুলকানোর অনুভূতিটাও যন্ত্রণার (pain) মতোই আরেকটি অনুভূতি; শুধু প্রবলতার নিরিখে যন্ত্রণার চাইতে লঘুতর (৪)।

প্রসঙ্গত, টিয়ারপিভি নামক একটি ছোট আকারের প্রোটিন (ওরফে পেপ্টাইড) নিঃসরণ করার মাধ্যমে ড্যারমিসে অবস্থিত নার্ভ কোষগুলি গরম ছ্যাঁকা, চিমটি কাটার ব্যথা কিম্বা মশার চুলকানিতে সাড়া দেয়, অর্থাৎ নার্ভ থেকে নার্ভবার্তা প্রেরণ করে ব্রেন অবধি নিয়ে যায়। যৌথভাবে এদের টিয়ারপিভি একপ্রেসিং নিউরণ (TRPV1-expressing neurons) নামে ডাকা হয়।

২০১৩ সালে, ন্যাশানাল ইন্সটিটিউট অফ ডেন্টাল অ্যান্ড ক্রেনিওফেসিয়াল রিসার্চের (National Institute of Dental and Craniofacial Research) ল্যাবোরেটরি অফ সেন্সরী বায়োলজীর (Laboratory of Sensory Biology) গবেষক ডঃ সন্তোষ মিশ্র এবং হুন মা এই ধারণায় এক নতুন চমক এনে দিলেন (৫)। এদের কাজের সুত্র ধরে এই ব্যথা-সুড়সুড়ি-আঁচড়-চুলকানির রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো দুইটি নতুন খেলোয়াড়। দাতা নিউরোট্রান্সমিটার এবং গ্রহিতা রিসেপ্টরের নাম যথাক্রমে ন্যাট্রউরোটিক পলিপেপ্টাইড বি (natriuretic polypeptide b) এবং ন্যাট্রউরেটিক পেপ্টাইড রিসেপ্টর এ (natriuretic peptide receptor a)। মিশ্র এবং মা দেখালেন যে চুলকানির অনুভূতিকে ব্রেনে নিয়ে যাওয়ার কাজটা হয় এই নির্দিষ্ট দাতা এবং গ্রহীতার মাধ্যমে, এবং কিছু বিশিষ্ট টিয়ারপিভি এক্সপ্রেসিং নিউরণ এই স্পেশাল জুটিকে বহন করে। শুধু এদের পক্ষেই চুলকানোর বার্তাকে মস্তিস্ক অবধি বহন করা সম্ভব।

নতুন এই তথ্যটাকে জোরদার করার জন্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ইঁদুরের শরীর থেকে এই বিশিষ্ট দাতা-গ্রহীতার জোড় বহন করা নিউরণগুলিকে সরিয়ে দিয়ে এই গবেষকেরা দেখালেন যে ইঁদুর গুলি ব্যথা বা গরমের অনুভুতিতে সাড়া দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু চুলকানোতে নয়। এই প্রসঙ্গে আরো একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো ন্যাট্রউরোটিক পলিপেপ্টাইড বি নামক পদার্থটা পরমাণুটা হার্টের কোষে থেকেও নির্গত হয়, সেখানে তার কাজ রক্তের সোডিয়াম আর প্রেসার মাপা।

আর চুলকানোর আরাম-টা ? সেটার জন্য আরেক নিউরোট্রান্সমিটার, যার নাম হয় তো শুনে থাকবেন। হ্যাঁ সেটা সেরোটোনিন (serotonin)। এই নিউরোট্রান্সমিটারের কাজই হলো ব্যথার অনুভুতিটাকে দমিয়ে ফেলা, যার ফলে নখের আঁচড়ে আপনার ব্যথা তো লাগলোই না, উল্টে আরাম পেলেন।

অতএব, বৈজ্ঞানিকেরা এই চুলকানো নিয়ে মহা ফাঁপরে পড়ে আছেন। তাঁরা না পারেন সেরোটোনিনকে কমাতে, না পারেন ওষুধ দিয়ে ন্যাট্রউরোটিক পলিপেপ্টাইড বি কে হটাতে।

কোন এক জ্ঞানী মহাপুরুষের মন্তব্য অনুসারে বলি, ফোড়াটা বেশ টু ইন ওয়ান, দেখিয়ে ভিক্ষা যেমন চাওয়া যায়, আবার চুলকিয়ে আরাম পাওয়া যায়।

তাহলে উপায় ?

এক — দয়া করে লক্ষ্য রাখবেন চুলকিয়ে যেন কেউ ঘা না করে। দুই — হাতের নখ বড়ো করুন। এক সাথে শত্রু আর চুলকানোর মোকাবিলা করা যাবে।

দ্রষ্টব্য

১। http://bdjokes.com/author/yasin/

২। Wilkinson, P. F. Millington, R. (2009). Skin (Digitally printed version ed.). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 39-50.

৩। http://www.aad.org/public/kids/skin/the-layers-of-your-skin

৪। Sun Y. G. et al. Cellular basis of itec sensation Science 2009 Sep. 18; 325 (5947): 1531-4.

৫। Misra S. K. & Hoon M. A. The cells and circuitry for itch responses in mice. Science. 2013 340(6135):968-71.

'সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝমিয়ে
বৃষ্টি এল খাতার উপর
আজীবনের লেখার উপর
বৃষ্টি এল এই অরণ্যে
বাইরে তখন গাছের নীচে
নাচছে ময়ূর আনন্দিত
এ-গাছ ও-গাছ উড়ছে পাখি
বলছে পাখি, 'এই অরণ্যে
কবির জন্যে আমরা থাকি।''

মেঘবালিকার জন্য রূপকথা / জয় গোস্বামী

— ভ্রমণ —

ভারতের বাহিরে টানিছে বিশ্ব

চিত্রা বসু

''বিশ্বের চারিদিক হতে প্রতি কণা টানিছে মোরে'' — অস্ট্রেলিয়া যাবার আমন্ত্রণ যখন এলো আমি অভিভূত হলাম। কর্ম সূত্রে অস্ট্রেলিয়া নিবাসী আমার ছোট ছেলে ও বৌমা আমাদের এই ভ্রমণের উদ্যোক্তা। যাওয়া বললেই ত আর যাওয়া নয়, তার অনেক কর্মকান্ড আছে। ভারত সরকারের অনুমতিপত্র, অস্ট্রেলিয়া সরকারের অনুমতিপত্র এবং এর পরেও নানারকম এটা, ওটা, সেটা। তার ওপর আমাদের এই বয়সে অর্থাৎ মধ্য বয়সে বেশ টেনশন তৈরী হয়, কাউকে খুলে অসুবিধের কথা বলতেও পারিনা। এ প্রসঙ্গে কথা হলেই উত্তর আসে, ''কিসের এত টেনশন, তোমাদের মত বয়সে লোকে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুযোগ হারিয়ো না।''

সুতরাং আমি ও আমার স্বামী, দুজনে মিলে মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে নিলাম। দমদম এয়ারপোর্টে রাত্রিতে আমাদের বড় ছেলে তুলে দিতে এসে আস্তে আস্তে বলে দিল — ''মা, সাবধান, ওখানে কিন্তু সমুদ্রের ধারে তোমাদের মতো মহিলারা হাফপ্যান্ট পরে দৌড়ায়, তুমি কিন্তু সেখানে হাঁফাতে হাঁফাতে আর পারিনা, আর পারিনা কোরো না, একটু বিফ-টীফ খেয়ে নিজেকে মজবুত করে নিও।'' হেসে বললাম ঠিক আছে।

ফ্লাইট সকাল সকাল সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল। বিস্মিত হলাম সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্ট দেখে — যা বিশাল, অতি পরিকল্পিত ও সুসজ্জিত। তিনঘন্টা বিশ্রামের পরে অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম শহর সিডনীর দিকে রওনা হলাম। পৌঁছলাম ওখানকার রাত্রি প্রায় সাতটা। কলকাতার থেকে সময়ের তফাৎ প্রায় পাঁচ ঘন্টা। নেমেই ঘড়ির কাঁটা ওদের সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিলাম।

জানলাম অস্ট্রেলিয়া মহাদেশটি ভারতের পূর্বে অবস্থিত ও আয়তনে ভারতের তিনগুণ। মাঝখানে মরুভূমি। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে লোকবসতি তৈরী হয়েছে। মাত্র কয়েক'শ বছর আগে দেশটি নিজের মতো নিজেকে সুন্দর করে তৈরী করেছে। এদের খনিজ সম্পদ প্রচুর। উন্নতির প্রধান কারণই এই সম্পদ।

প্রথম গন্তব্য ব্লু-মাউন্টেন। তার পরের দিন রাত্রে আমরা সবাই খুব বৃষ্টির মধ্যে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে যাবার পরে একটি ব্রিটিশ আমলের রিসর্টে উঠলাম। পরের দিন সকালে ব্লু-মাউন্টেনের দিকে রওনা হলাম কিন্তু বৃষ্টি ও মেঘের জন্যে কিছুই দেখতে পেলাম না। ওখান থেকে গেলাম Jenolan Cave -এ। বহু বছর আগে এই লাইম স্টোনের গুহাটি তৈরী হয়েছে। এখনও তৈরী হয়ে চলেছে খুব ধীরে। আমরা কিছু কিছু জীবন্ত লাইম স্টোন দেখলাম। প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে ভৌগোলিক কারণ মিশে এ এক অবাক বিস্ময়।

অন্য আর একদিন ব্লু-মাউন্টেন গিয়েছিলাম। খুব আকর্ষণীয়। সেদিন আকাশ পরিষ্কার। পরিবেশ খুব সুন্দর। এটা একটা উপত্যকা অঞ্চল। এখানে পাথরের স্তূপের আকারে লম্বা লম্বা তিনটে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। এদের বলা হয় ''Three Sisters''। এর একটা পৌরাণিক ইতিহাস আছে — তিন বোন অভিশপ্ত হয়ে পাথর হয়ে গেছে। দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট পাহাড় আর সেখানে ঘন জঙ্গল। জঙ্গল এত সুন্দর দেখতে লাগছিল যে মনে হচ্ছে কেউ বনভূমিটা তৈরী করেছে সযত্নে, আপনা থেকে তৈরী হয় নি, আশ্চর্য ও বিস্ময়কর।

বেড়ানোর সাথে সুবিধের মত খাওয়াদাওয়া নানা ভাবেই হতো। সবথেকে বলার মতো এই যে এখানে

আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন দশভূজা, কোনো কাজে এরা পিছপা নয়।

তার পরের দিন গেলাম ওয়েস্ট হেড-এ। ছোট পাহাড়। পৌঁছতেই ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো, সঙ্গে সঙ্গে থেমেও গেল। এ দেশের আবহাওয়া দপ্তর যা ফোরকাস্ট করে তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। পাহাড় থেকে তলার সমুদ্রটা নীল রঙের। সেখানে সিংহ আকৃতির দুটো ছোট ছোট দ্বীপ। সেই দ্বীপের ভেতর কটেজ এবং সাদা, সাদা ছোট ছোট প্রাইভেট বোট দাঁড়িয়ে আছে। একটু আগে বৃষ্টি হওয়ায় আকাশের রামধনুর প্রতিফলন জলে পড়ছে সব মিলিয়ে সে এক মনোরম দৃশ্য, যেন রূপকথার দেশ।

সিডনী থেকে আর একটি দ্রষ্টব্য জায়গা এর পরের দিন গেলাম, নাম তার – Gap Park।

গ্যাপ পার্কের একটা বিশাল নোঙর – এখানে সমুদ্রপথে জাহাজে অপরাধীদের আনা হোত

এক সময়ে যেখানে পশ্চিম দেশ থেকে অপরাধীদের আনা হোত সমুদ্রের মাধ্যমে। আমাদের গাড়ীটা একটু উঁচু দিকে উঠতে আরম্ভ করল। জায়গাটা খুব উঁচু, সমুদ্র খুব নীচুতে। রাস্তার ধারে স্টীলের রেলিং দেওয়া। এখানে সমুদ্রের জলের রঙটা কালো, সব জায়গায় আকাশের রঙ, আর সমুদ্রের নীল রঙ মিলে মিশে একাকার। জানিনা আকাশের রঙের ছোঁয়ায় সমুদ্রের জলের রঙ নির্ভর করে কিনা ! স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে এখানে একটি বিশাল আসল নোঙর রাখা আছে। ঐরকমই নোঙর ফেলা জাহাজে অপরাধীদের নির্বাসনে আনা হোত।

শুনলাম, কিছুদিন আগে এক মহিলা সাংবাদিক ঐ অঞ্চলে আত্মহত্যা করেছিল। ঐ একদিনই আমার শরীর আর মনটা দুর্বল হয়ে গেল। ওখানে আর বেশীক্ষণ থাকতে পারিনি।

সিডনী অপেরা হাউস – সিডনীর বিখ্যাত দ্রষ্টব্য, বছরের মাঝে ও নতুন বছরে – এর সামনে আলোর খেলা হয়

এরপর আমরা গেলাম অপেরা হাউস ও হারবার ব্রীজ দেখতে যা সীডনীর বিখ্যাত দ্রষ্টব্য। বছরের নানা সময় এখানে খুব সুন্দর আলোর খেলা হয়।

হারবার ব্রীজ দেখার পরে আমরা অপেরা হাউসের দিকে রওনা হলাম। চারিদিকে যেন একটা মেলার মতো পরিবেশ – পথ নাটিকার মত করে নাচ, গান, খেলা হচ্ছে, লোকে দাঁড়িয়ে তা উপভোগ করছে। এসে দাঁড়ালাম সেই বিখ্যাত অপেরা হাউসে সামনে। খোলা আকাশের নীচে জলের ধারবেষ্টিত ঝকঝকে স্টিলের বিশাল আকৃতি ফুলের মত না পাতার মত সেটা আমার দ্বারা বোঝানো সম্ভব নয়। ওখানে আর্কিটেকচারের অনেক বিশেষত্ব আছে।

এর ফাঁকে একদিন আমাদের এক অল্পবয়সি বন্ধু একটি নাটক দেখালো 'লা লা ল্যান্ড'। আমরা নাটক দেখতে ভালবাসি, তাই খুবই উপভোগ করলাম।

দুদিন রেস্ট নিয়ে আমরা গেলাম Willson Mountain। উইলসন নামে এক Victim এখানে এসে লুকিয়েছিল একসময়। তার নামেই জায়গাটার নাম। একই সঙ্গে বোটানিক্যাল গার্ডেন, এই দুটো জায়গায় যাওয়ার সময় যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম তার দৃশ্য অতুলনীয়। সাদা রোড লাইন, দু'পাশে মালভূমি, ঘুরে ঘুরে ওপরে ওঠা নামা, রাস্তাগুলোর বাঁক নেওয়ার সময়ে বিপজ্জনক নয়। দুধারে মেপল্ গাছের সমারোহ। এদের তিন রকম রঙ্ ধরে, শেষ রঙটি মিষ্টি কমলা রঙে এসে থামে। সে এক দৃশ্য। মনে পড়ে গেল গানের কলি – ''রঙ লাগালে বনে বনে কে, ঢেউ লাগালে সমীরণে''।

দুদিন পর আমরা গেলাম সিডনী থেকে পার্থে । সিডনী পূর্বে, পার্থ পশ্চিমে । একেবারে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত প্রায় পাঁচ ঘন্টার ফ্লাইট । সেখানে আমাদের ভাগ্নে, বৌমা ও তাদের দুই ছেলে থাকে । আমরা সেখানেই উঠলাম । শহরটি বেশ সুসজ্জিত, একটু স্তব্ধতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তো আছেই ।

বৌমা নিজেই গাড়ী ড্রাইভ করে বিভিন্ন জায়গা দেখাল । শহর থেকে বেরিয়ে চোখে পড়ল দুপাশে শুধু জঙ্গল । লম্বা লম্বা গাছগুলি অর্ধেক পোড়া । কিছুদিন আগে দাবানল হয়ে গেছে তারই চিহ্ন ।

অষ্ট্রেলিয়া মানে ক্যাঙারু, কোলকাতায় জু-গার্ডেনে ক্যাঙারু দেখা আর এখানে দেখা আলাদা । এছাড়া অনেক পাখির সমারোহ । সাদা হাঁস, রাজহাঁস আছে জানি, কিন্তু কালোহাঁস 'Black Swan' কোথাও দেখিনি । তা দেখা হোল । বৌমা, পাখিদের খাবার সঙ্গে নিয়েছিল । খাবার দিতেই কালো হাঁসেরা পিলপিল করে উঠে এল একেবারে গায়ে গায়ে । তারপরে দেখলাম আর এক পার্কে লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া । এ আবার মাথায় এসে বসে, ওখানে আবার পায়রাদেরও রাজত্ব । পায়রাদের কাছে এসে দাঁড়ালাম দুহাত ছড়িয়ে খাবার নিয়ে । কেউ হাতে উড়ে এসে বসে কেউ মাথায় বসে । তারপরে টুকটুক করে আমাদের হাত থেকে খাবার খাচ্ছে কিন্তু আমাদের ঠোকরাচ্ছে না । হৈ হৈ করে আমরা মজা পাচ্ছিলাম । যেন আমাদের বয়স অনেক কমে গেছে ।

সবকিছুই বর্ণনা করে প্রকাশ করা যায় না । চোখে দেখে অনুভব করা, যা দেখলাম – Aquarium of Western Australia, যেটা সমুদ্রতলে – অসাধারণ ও অনবদ্য, Fremantle Port, Curtain University of Western Australia সব ছবির মতো গোছানো । Aboriginal Studies, Kings Park (War Memorial) ও Hindu Temple-এ গিয়েছিলাম ।

আরে, এটা তো বলাই হয়নি – যা হলে – একটা শহরকে চেনা যায়, কতটা disciplined সেটা রাস্তা দেখে, যেমন রাস্তার ডিরেকশান, গাড়ীগুলো কোনভাবে যাবে আসবে, disable-দের জন্য আলাদা ব্যবস্থা । জেব্রা দিয়ে রাস্তা পারাপার হওয়ার সময় আমি তো ভয় খাচ্ছি যা স্পিডে গাড়ী যাওয়া আসা করে – এই কিছু হয়ে গেল বুঝি । দূরে গাড়ী দেখলেও থতমত খেয়ে জেব্রাতে দাঁড়িয়ে পড়ি কিন্তু আমাদের দেখে গাড়ী চালক বিদেশী ভদ্রলোকটি গাড়ী থামিয়ে হাতের ইশারায় চলে যেতে বললেন । মনে মনে নিশ্চয় ভাবলেন এই শাড়ী পড়া মহিলা মানে ইন্ডিয়া থেকে সদ্য আসা । ওখানে শিখেছি হাতটা অল্প তুলে তাদের থ্যাঙ্কস্ জানানোর কায়দাটা । আমি অবশ্য এই কায়দাগুলো খুব উপভোগ করেছি ।

সফর শেষ করে যথাসময়ে প্রায় দেড় মাস পরে কলকাতায় ফিরে এলাম । কলকাতার মাটিতে পা রাখতেই বড় বৌমা প্রশ্ন করল – কলকাতা খুব গরম, খুব ভীড় ?

মনে হচ্ছে, আর একবার যেতে পারলে ভাল হয় । আর যেতে পারি বা না পারি, মনে থাকুক বা না থাকুক ভেতরে একটা বিস্ময়কর অনুভূতি থেকেই গেছে । কি অনবদ্য সুন্দর-ই না সেই দেশ ।

— ভ্রমণ —

নীল আকাশের নীচে

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

প্রিয় তন্ময়, (Sunday, August 14, 2016)

আমার মাথার উপর উদার আকাশ এখন, খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিচ্ছি প্রাণভরে। সামনে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র। মুখে চোখে লোণা জলের ছিটে লাগছে। পায়ের নীচে বালি আর ঝিনুককুঁচির ভিজে রুক্ষতা। হাওয়ায় ভেসে আসছে মাছ মাছ গন্ধ।

আজ বিকেল তিনটে নাগাদ এসে পৌঁছেছি ফ্লোরিডার দক্ষিণ পশ্চিমের ছোট্ট এই দ্বীপটিতে। নাম Captiva Island। Chicago থেকে উড়ে এলাম ফোর্ট মায়ার্স বিমানবন্দরে। সেখান থেকে গাড়ীতে ঘন্টাখানেকের রাস্তা হল Sanibel island। Sanibel island-এর দক্ষিণে Captiva island। স্যানিবেল আর ক্যাপটিভা দুই যমজ দ্বীপ যেন। দুটির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে গাড়ীতে দু মিনিটে পার হওয়া যায় এমন একটি সেতু। ছোট্ট দ্বীপ ক্যাপটিভা – লম্বায় প্রায় চার মাইল, আর যেখানে সে সবথেকে চমড়া সেখানে তার পরিসর আধ মাইল মতো।

হোটেলের ঘরে জিনিসপত্র রেখে, lunch সেরে বেরিয়ে পড়েছি। এখন বিকেলও প্রায় গড়িয়ে গেছে। সাগরের সঙ্গে এবারের সফরে এই প্রথম দেখা আমার। যতদূর চোখ যায় জল আর বালির সীমারেখা অনবরত ভেঙেচুরে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র আর সৈকতের এ এক অদ্ভূত খেলা – বার বার দেখলেও যা পুরনো হয় না।

এই খেলা দেখতে দেখতে কি মনে হচ্ছে জান ? এই যে অনন্ত আকাশ আর অসীম জলরাশি, এর কতটা কার অধিকারে তা কিসের নিরিখে মাপা হয় ? ঢেউ-এর অবিরাম ওঠাপড়া, আকাশে নরম আলো, ভেজা বালিতে সমুদ্র কাঁকড়ার চলার চিহ্ন, দূরে দু-একটা পেলিকানের হাল্কাভাবে জলকে ছুঁয়ে যাওয়া – সবই একটা সুতোয় গাঁথা। একই সমগ্রের অংশ। তাও এত দ্বন্দ্ব কেন বল তো মানুষে মানুষে ? হয়তো অনেকটা আকাশ, অনেকটা আলো আর অনেকটা জল একসঙ্গে দেখলে নিজেদের মনটাও রোজকার আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, রাগ অনুরাগ ভুলে সেই পূর্ণের অনুভব পায় খানিকটা, তাই তখন অধিকারের লড়াই-এর অর্থহীনতাও বেশ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

আকাশে এখন অদ্ভুত আলো। কিছুটা আকাশ মেঘে ঢাকা। কালচে নীল, জমাট মেঘ। মেঘ চিরে থেকে থেকে ঝিলিক দিচ্ছে বিদ্যুতের রেখা। আর একদিকে সূর্য পাটে যাওয়ার প্রস্তুতি চলেছে। জলে কমলা আভা, আকাশের আয়নায় রঙের খেলা। সমুদ্র সেখানে বুকে ধরেছে মেঘের ছায়া, সেখানে আবার জল কালো। কালো জলের উপর থেকে থেকেই ভেসে উঠছে আরও গাঢ় কালো রঙের অবয়ব। খানিকটা তাকিয়ে থাকার পরে বুঝলাম দুটো ডলফিন মনের আনন্দে খেলা করছে সাগর জলে। মেঘ, রোদ, আলো, ছায়া মিলেমিশে একাকার এখন। জল কোথাও নীল, কোথাও কালচে সবুজ, কোথাও আবার ঝিকিমিকি কমলা। ভেজা বালিতেও নানা রঙের প্রতিফলন। দূরে প্রায় ডুবে যাওয়া সূর্যের সামনে দিয়ে পালতোলা নৌকা চলেছে। ঠিক যেন সিনেমার দৃশ্য। সূর্যের মতো এতবড় আলোকচিত্রী আর কে আছে বল তো ?

দিগন্তে সেখানে আকাশ আর জলে গলাগলি, সেখানে এখন শুধু গাঢ় নীল দাগ, কালো ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনী। আকাশের যে পারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে তার অপর পারে তালগাছ, নারকেল গাছের মাথায় চাঁদ উঠেছে। জলচর পাখীরা ঘরে ফিরছে পড়ন্ত সূর্যের সব আলোটুকু পাখায় মেখে।

আজ তোমাকে ফোন করা হল না। ফোনে চারপাশের ছবিটা ভাল করে আঁকতে পারতাম না। তার থেকে চিঠি লেখার বিকল্পটাই নিলাম। অনেকদিন তোমাকে চিঠি লিখিনি। এই ছুটিতে রোজ তোমাকে একটা করে চিঠি লিখব ভেবেছি। শুধু চিঠি-ফোন বা

e-mail নয় । কিছু ঝিনুক কুড়িয়েছি । দেখাব ফিরে গিয়ে। ভাল থেক ।

তোমার নীল

On Monday, August 15, 2016 (tbose@yahoo.com) wrote

Dear Neel,

How are you ? Did you reach safely ? I have been wanting to talk to you. Did you forget me ? How ? I know. The water and sand, the sky and the waves, the sea shells, the crimson sunset .... they have so much to offer. I, only with longing in my heart, am no match for the abundance of nature. Call me as soon as you get a chance. Please check your e-mail and reply soon.

প্রিয় তন্ময়,

তোমার ই-মেল পড়লাম । ঠিক করেছি এই ছুটিতে তোমাকে কোন ই-মেল লিখব না । চিঠি লিখছি তার পরিবর্ত্তে । পড়তে পাবে । তবে দিনকতক পরে । শেষে জল, বালির সঙ্গে প্রতিযোগিতা এ কিরকম ছেলেমানুষি তোমার ? দেনাপাওনার হিসেব এখন থাক । বরং গল্প শোন একটা ।

নিউ ইংল্যান্ড-এ ছিমছাম, পরিপাটি এক কটেজ । ছোট্ট সেই কটেজে থাকে এক দুধবরণ কন্যে । দুধবরণ কন্যে তার সোনার বরণ চুল; জানালা দিয়ে দূরে সাগরপারে তাকিয়ে রোজ বেশ খানিকটা সময় কাটে কন্যের । কেন বল তো ? সুদূর দক্ষিণ অতলান্তিকের বুকে জাহাজে পাড়ি দিয়েছে তার প্রিয়তম । কন্যে তাই তাকিয়ে থাকে সাগরপানে । চোখের দৃষ্টি উদাস; সোনার বরণ চুলের ঢাল এলোমেলো করে দেয় সাগরের হাওয়া । দিন যায়, মাস যায় । সাগরের জলে খেলা করে যে আলো ক্রমশ তার রঙ বদলে যায় । বদলে যায় হাওয়ার গতি । একদিন দূরে আকাশের দক্ষিণ কোণে দেখা দেয় একটুকরো কালো মেঘ । ভয়ে দুরুদুরু কন্যার বুক । সে রাতে ঘুম আসে না তার চোখে । অনেক রাত পর্যন্ত জানালার ধারে গালে হাত রেখে বসে থাকে সে । আকাশ জল জুড়ে শুধু অন্ধকার । সে অন্ধকারে আরও ঘনিয়ে আসে তার ভয় । হঠাৎ দূরে একটা ছোট্ট আলোর বিন্দু দেখতে পায় সে । কালো জলরাশির বুক চিরে ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে সে বিন্দু । কন্যে চমকে ওঠে তবে কি তার প্রতীক্ষার অবসান হল এতদিনে ? জাহাজের বাঁশি বেজে ওঠে রাতের নীরবতাকে ভেঙে । তাহলে তার আশা বাস্তবে রূপায়িত হল শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা শেষে ঘরে ফিরল তার নাবিক । এবারে মিলনের পালা ।

প্রিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরে নাবিক । প্রশ্ন করে, ''বল তো, সাগর ছেঁচে তোমার জন্য কি এনেছি এবারে ?'' অবাক চোখে তাকিয়ে মাথা নেড়ে কন্যে বলে, ''জানি না তো ।'' ''চোখ বন্ধ কর । হাত পাত ।''

পদ্মকলির মতো আঙুলগুলি মেলে ধরে কন্যে চোখ বন্ধ করে । হাতে ঠেকে মসৃণ, ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ । চোখ খুলে সে দেখে দুধসাদা এক শাঁখ । তার গা থেকে পিছলে পড়ছে লালচে গোলাপী আভা । চোখ ফেরাতে পারে না দুধবরণ কন্যে । বিস্ময়ের ঘোর কাটতে শাঁখটি পাশে রেখে প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্না হয় সে । প্রিয়তম তার কানে কানে বলে চলে তার নিজের এবারের সাগর অভিযানের অদ্ভুত সব গল্প ।

Sailor is valentine – উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথাটির প্রচলন ছিল খুব । দক্ষিণ অতলান্তিক বা ক্যারিবিয়ান সাগরে পাড়ি দিত যে সব নাবিকেরা, প্রিয়জনের জন্য নিয়ে আসত এই বিশেষ উপহার । চারকোণা, পাঁচকোণা বা ডিম্বাকৃতি কাঠ আর কাঁচের বাক্স । তার ভিতরে ঝিনুকের আলপনা । নানা আকারের নানা রঙের সব ঝিনুক ।

Captiva Island এর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল National Seashell Museum । ফ্লোরিডা ছাড়াও পৃথিবীর নানা জায়গার সমুদ্র সৈকত থেকে আহরণ করা sea shell এর একটি সংগ্রহশালা এটি । এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর থেকে আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত যে জলরাশি, উষ্ণতা আর অগভীরতার কারণে সেখানে জন্ম নেয় অজস্র প্রবাল, শাঁখ, ঝিনুক, কড়ি আর শামুক । তাদের রঙ, আকার ও আয়তনের বৈচিত্র্য দেখলে তাক লেগে যায় । গতকাল সন্ধ্যেবেলা যখন সমুদ্রের তীরে বসে সূর্যাস্ত দেখছিলাম কানে বাজছিল একটাই সুর । খোলা

আকাশ, অসীম জলরাশি, বিস্তীর্ণ বালুচর, তালগাছের সারি, ভেসে ওঠা ডলফিন, পেলিকান সব যেন মিলেমিশে একটাই ছবি । আজ এই shell museum-এ দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে বিপরীত কথা । এখানে প্রাণের বহুবিচিত্র প্রকাশ । নানারকম shell, তাদের নানারকম নাম – Horse conch, lightning whelk, triton's trrumpet, queen's helmet – আরও অনেক নাম । বেশিরভাগ নামই shell-টির আকৃতি প্রকৃতির সঙ্গে মেলান । কোনোটা আবার প্রথম যে সংগ্রাহকের হাতে পড়েছিল তাঁর নামে চিহ্নিত ।

প্রাণের বিবর্তনের ইতিহাসে এইসব ঝিনুক, শাঁখ, কড়িজাতীয় প্রাণীগুলির আবির্ভাব হয়েছিল মানুষের অনেক আগে । কিন্তু নিজের অধিকার স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য মানুষ বেপরোয়াভাবে হাত বাড়াচ্ছে এদের জগতে । ঝকঝকে আর বিরল প্রজাতির নমুনা সংগ্রহের আশায় প্রবল জল তোলপাড় করে ফেলছে ডুবুরিরা । জীবন্ত সব নমুনা তুলে আনছে তারা । এইসব নমুনার বাইরের শক্ত আবরণটি হয় নিটোল, নিখুঁত । ভিতরের প্রাণীটিকে মেরে ফেলে চড়া দামে সংগ্রাহকদের কাছে সেইসব শাঁখ ঝিনুক বিক্রী করছে ব্যবসায়ীরা । কি ভীষণ চিন্তাহীনতা আর আগ্রাসন বল তো ? বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যে এ এক নিরন্তর আঘাত । ভাবলে মন খারাপ লাগে বড় । কি করা যায় বল তো ?

আজ আর অন্য কোন চিন্তা নয় । ভাল থেক ।

নীল

On Tuesday, August 16, 2016 (tbose@ yahoo. com) wrote

Dear Neel,

Why didn't you call me even once ? Do you have any idea how worried I am for you ? You are not answering my call either. Hope you are safe. Be well.

Tanmay

Tuesday, August 16, 2016

প্রিয় তন্ময়,

বুঝতে পারছি আমার জন্য খুব চিন্তা করছ তুমি । আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়োনা । আমি ভাল আছি । তোমাকে ফোন করছি না কেন জান ? ফোন করলে যা দেখছি তার সবটুকু তোমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছা করত । তোমার মূল্যবান সময়ের কতটা চলে যেত বল তো তাহলে ?

গত দুদিন ধরে প্রকৃতির অকৃপণ দান আর খেয়াল খুশীর খেলায় ডুবেছিলাম । আজ দিনটা একটু অন্যরকম কাটল । গতকাল sea shell museum-এর বিষয়ে লিখেছি তোমাকে । শিল্প সম্বন্ধীয় পাঠ্যবইতে Elements of Art-এর সংজ্ঞায় যা যা থাকে form, shape, texture, pattern, color-এ সবেরই এক অভিনব উদ্‌যাপন দেখলাম সেখানে । আজ গিয়েছিলাম Sarasota শহরে । Captiva Island থেকে গাড়ীতে Sarasata যেতে প্রায় ঘন্টা দুয়েক সময় লাগে । এই শহর আমার আগের চেনা । ২০০৯ সালে এখানে এসে দিনদশেক আমি

ছিলাম। সাদা মিহি বালির সমুদ্রসৈকত ছাড়াও সারাসোটা শহরের একটি বিশেষ আকর্ষণ হল The Ringling। রিংলিং সার্কাস খ্যাত জন রিংলিং ও তাঁর স্ত্রী মেবল শীতকালে থাকতেন এই সারাসোটায়। ভেনিসিয়ান গথিক শৈলীতে নির্মিত তাঁদের প্রাসাদ CA 'D' ZAN সারাসোটার একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। রিংলিং দম্পতির ছেষট্টি একর ভূ-সম্পদের মধ্যে আছে আরও অন্যান্য দর্শনীয় জায়গা। ১৯১৩ সালে মেবল রিংলিঙের গড়ে তোলা গোলাপ বাগান তার মধ্যে একটি। ২৭,০০০ বর্গফুট জুড়ে আছে এই বাগান। প্রায় ১২০০ রকমের গোলাপ ফোটে সেখানে। এই গোলাপ বাগান ছাড়া আরও যে দুটি দ্রষ্টব্য জায়গার নাম না করলেই নয় তা হল museum of art আর circus museum।

এই circus museum টি ভারী মজার লেগেছে আমার। এ যেন অন্য এক জগৎ ! এটিই আমেরিকার ঐতিহ্যময় সার্কাসের ইতিহাসের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় ঘটানোর জন্য গড়ে তোলা প্রথম সংগ্রহশালা। ১৯১৯ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ছিল রিংলিং ভাইদের সার্কাসের রমরমা। তাদের সার্কাস কোম্পানীতে ছিল ১৩০০ জন কর্মী আর ৮০০টি জীবজন্তু। লোকলস্কর, জীবজন্তু, তাঁবু ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে সার্কাসের ট্রেন এক একদিনে ১৫০০ মাইল পার হত। ১৫০টি শহরে ঘুরে ঘুরে তাঁবু পড়ত সার্কাসের। তখনের শহরবাসীদের সাদামাটা জীবনে, সেটাই ছিল একটা বিশেষ উত্তেজনার কারণ। সার্কাসের রান্নাঘরে প্রাতঃরাশে রান্না হত ২২৬ ডজন ডিম। সন্ধ্যেবেলা শুরু হত সার্কাসের প্রদর্শনী। একসঙ্গে ৮০০ জন শিল্পী খেলা দেখাত দর্শকদের। বড় তাঁবুর নীচে ১৩০০০ লোক মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখত সেই খেলা। ভুলে যেত দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ, কষ্ট, সংগ্রাম। সার্কাসের একটি পুরো দিন – ভোরবেলা শহরে ট্রেন ঢোকা থেকে শুরু করে রাত্রে তাঁবু গোটান পর্যন্ত ছোট্ট ছোট্ট মাটির পুতুল দিয়ে ধরা আছে এই museum এ। সে এক আশ্চর্য হয়ে দেখার জিনিস ! মিনিয়েচার মাটির মডেল দিয়ে তুলা ধরা সার্কাস জীবন – তাঁবুর ভিতরে সার্কাস শিল্পীদের দিনযাপন, তাদের অবসর বিনোদন, প্রস্তুতি, সাজগোজের পালা, নানা ভেল্কি। শিল্পীর তারিফ করতে হয় প্রতি মুহূর্তে।

এছাড়াও এখানে রাখা আছে পুরনো ব্যানার, সার্কাসশিল্পী কস্টিউম, একটি ওয়াগন ইত্যাদি। সন্ধ্যেবেলা 'সিয়েস্তা-কি' বীচে সূর্যাস্ত। আজ আবার অন্যরকম খেলা মেঘের সঙ্গে জলের। রঙ বদলের পালা আজ। কিন্তু মুগ্ধতা কাটে না। আশাও মেটে না দেখে দেখে। ভাল থেক।

নীল

Wednesday, August 17, 2016

প্রিয় তন্ময়,

আজ সকালের সমুদ্রস্নানে গেলাম। এবারের ছুটিতে এই প্রথমবার। স্ফটিকস্বচ্ছ জল। অল্প কয়েকজন ছুটি কাটাতে আসা মানুষ জড় হয়েছে সমুদ্রতীরে। তাদের কথাবার্ত্তা, ইতস্তত আসা যাওয়া, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের হলুদ, গোলাপী ঝিনুক দেখে উচ্ছাস সমুদ্রতীরের পরিবেশটাকে করে তুলেছিল অন্যরকম। মনে হচ্ছিল আজ সত্যিই আলো আর আহ্লাদের দিন।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে রিসর্টের ব্যালকনিতে বসেছিলাম। নীচে ঘন জঙ্গল। লোণা মাটির গাছ সব। জঙ্গল যেখানে শেষ সেখানে শুধু বালি আর বালি। বালির তটরেখা ঘিরে সাগরের জল। গাছপালার সবুজ এত ঘন যে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয় যেন সবুজ মেঘ জমাট বেঁধে আছে। আকাশেও ঘনিয়ে এসেছিল মেঘ। সেই মেঘের ছায়ায় গাছপালার গভীরে সবুজ অন্ধকার হয়ে উঠেছিল নিবিড়, রহস্যময়। সাগরের জলেও তখন কালো মেঘের ছায়া। তারপর একসময় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। আকাশ ভাঙা জল সাগরের অতল জলরাশির বুকে মিলেমিশে একাকার।

Thursday, August 18, 2016

প্রিয় তন্ময়,

এত চুপচাপ কেন ? ফোন নেই, e-mail নেই, ভাল আছ তো ? রাগ হয়েছে বুঝি e-mail-এর উত্তর দিই নি বলে ? আচ্ছা বেশ। থাক তুমি রাগ করে। আমি তোমাকে জল বালির গল্প শোনাই।

আজও sunset beach-এ সূর্যাস্ত দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের resort থেকে সেখানে যেতে দশ মিনিট মতো লাগে গাড়ীতে। রাস্তাটি ভারী সুন্দর। নানারকম গাছপালা রাস্তার দুধারে। তার মধ্যে কিছু গাছ

আমার শৈশবের পরিচিত – গোলঞ্চ, করবী, টগর, নানারঙের জবা। এছাড়াও আরও নানারকম গাছ। আর মাঝে মাঝে সেই সবুজের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে সুদৃশ্য সব বাড়ী। তার মধ্যে একটি বাড়ীর নাম Artist's Point। যাতায়াতের পথে বাড়ীটির দিকে চোখ পড়লে মনে হত শিল্পীদের থাকার উপযুক্ত বাড়ীই বটে এটি। বাড়ীর যে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালেই চোখে পড়ে অপূর্ব নৈসর্গিক চিত্র।

ঘড়ির সময় ধরা হিসেব অনুযায়ী সূর্যাস্তের সময় হল ৮টা বেজে তিন মিনিট; পৌনে আটটা পর্যন্ত আকাশ একরকম মেঘেই ঢাকা ছিল। হঠাৎ সেই মেঘের জাল ছিঁড়ে আগুনের গোলার মতো বেরিয়ে এলেন সূর্যদেব। মেঘে মেঘে যেন আগুন ধরে গেল, জান ! আকাশ জুড়ে আগ্নেয়গিরি। সে আগুনের আভা ছড়িয়ে পড়ল সাগরের বুকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে দিনের আলো নিঃশেষে মুছে গিয়ে অন্ধকার নেমে আসবে পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে। ঠিক একই সময়ে ভূ-গোলকের অন্য গোলার্ধে রাঙা উষার আলো ফুটে উঠবে দিগন্তে। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের এই খেলা চিরন্তন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এই সাগরবেলায় এক সূর্যাস্ত থেকে অন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত অধীর প্রতীক্ষা। চেনা মুহূর্তকে নতুন করে পাওয়া প্রতিদিন।

সূর্যদেব অস্ত গেছেন। কিন্তু পশ্চিম আকাশে তখন লেগে আছে আগুনরঙা আলো। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে পিছনে তাকাতেই দেখি তাল, নারকেল গাছের সারির মাথায় মস্ত এক চাঁদ। দিনের আলোয় এমন স্পষ্ট করে এত বড় চাঁদ আগে দেখি নি। মনে পড়ে গেল আজ রাখী পূর্ণিমা। এই মুহূর্তে আকাশে চাঁদ আর সূর্যের সহাবস্থান যেন এক নিবিড় মৈত্রী, প্রেম আর শান্তির দ্যোতনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই মিলেমিশে গলাগলি করে থাকার মধ্যে হিংসা ফণা তোলে কি করে বল তো ? কিসের বিরোধ এত মানুষে মানুষে ? কি অধিকারের নেশায় এই হিংসার পাগলামি ?

এপ্রিল থেকে অক্টোবর – এই ছ-মাস রাত নটার পরে গোটা দ্বীপ অন্ধকার। সমুদ্রতীর একেবারে শুন্‌শান্। কেন জান ? এই মাসগুলো নানা প্রজাতির sea turtle-এর breeding season। ডিম ফুটে বের হওয়া বাচ্চা sea turtle রাতের আলোয় পথ চিনে নিজেদের ঘরে ফেরে। তাদের ঘর হল সমুদ্র। বালুতট থেকে সমুদ্র – পথে নানা বিপদ ওৎ পেতে থাকে এমনিতেই। মানুষের কার্যকলাপ যাতে তাদের বিভ্রান্ত না করে তাইজন্য এই সতর্কতা। পূর্ণিমার রাত এইসব সদ্যোজাত sea turtle-দের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নিছক বেঁচে থাকার তাগিদে। তাই রাতের অন্ধকার একটু ঘন হয়ে আসতে যখন রিসোর্টে ফিরে এলাম চারপাশ নিস্তব্ধ। আকাশে বিশাল এক চাঁদ !

নীল

On Friday, August 19, tbose@yahoo.com wrote

Dearest Neel,

The moon was gorgeous last night. Did you see it ? Of course you did. It must have looked spectacular with the setting of the ocean and the beach. I already figured out that you were not going to reply my e-mail or answer my phone call while you were in Florida. That's alright. I shall wait. I know you are surrounded by your elements. Be happy. Enjoy. I look forward to seeing you as soon as you come back.

Love

Tanmoy
Friday, August 19

তন্ময়,

গতকাল যেখানে লেখা শেষ করেছি আজ ঠিক সেইখান থেকে শুরু করব। এবারের ছুটিতে আজই প্রথম ভোরবেলা হাঁটতে বেরলাম। ভোর আমার বড় প্রিয়

সময়। রাত শেষ, আর একটা নতুন দিনের শুরু। আরও একবার নতুন করে প্রকৃতির কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার সুযোগ। ঘড়িতে তখন সময় প্রায় সাড়ে পাঁচটা। সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দেখি চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। এখন আর আকাশে রঙের খেলা নেই। শুধু অসীম কালোর মধ্যে সাদা রেখায় আঁকা ঢেউ। সেই ঢেউ-এর ওঠাপড়া ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে দিশা বদল করলাম। জ্যোৎস্না মাখা এই বালুচরে এই মুহূর্ত্তেই হয়ত ডিম ফুটে সদ্য বের হওয়া কোন turtle সমুদ্রে ফিরছে। আমার উপস্থিতি তাকে দিগভ্রান্ত করতে পারে ভেবে সমুদ্রকে পিছনে রেখে হাঁটতে শুরু করলাম। রাতের অন্ধকার তখনও ঘিরে রেখেছে চারপাশ। খানিকটা পরে বাঁ হাতি একটা Pier চোখে পড়ল। সেটির দৈর্ঘ্য খুব বেশী নয়। খোলা সমুদ্রের ঢেউ এড়িয়ে জল এখানে শান্ত। এদিকের এই জলরাশির নাম Pine Sound কোন ভাবনা চিন্তা না করে Pier এর মধ্যে বসে পড়লাম।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ তখনও উজ্জ্বল। রাতের অন্ধকারে মোহময় আলোর জাল বিছিয়ে সে যেন এক যাদুকরী। শান্ত জল ছলাৎ ছলাৎ করে ফিরে আসছে মাটির কোলে। স্নিগ্ধ হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ পূব আকাশে গোলাপী রঙ ধরল। সন্ধ্যেবেলার মতো আগুনের রঙ নয়। দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল লালচে গোলাপী আভা। অন্ধকারের চাদর সরে গেল জল আকাশ আর মাটির বুক থেকে। জলের উপর উদয় হল সে দিনের সূর্য – উজ্জ্বল লাল, জবাকুসুম।

সূর্যোদয় দেখে ফেরার রাস্তা ধরলাম। এবারে সমুদ্রের তীর বরাবর চলা। ভোরের প্রশান্তি সেখানেও। মানুষজনের ভিড় নেই বললেই চলে। পায়ের তলায় ঝিনুককুচি, বালি আর ঠান্ডা জলের ছোঁয়া। ঢেউয়ের সঙ্গে একরাশ ঝিনুকের আসা যাওয়া এখন। নিস্তব্দ সমুদ্রতীরে রিনরিনে আওয়াজ হচ্ছে তার। অগভীর জলে মাছ ধরছে দু একজন। এই দ্বীপকে ঘিরে থাকা জলরাশিতে মাছ প্রচুর। American Bottlenose Dolfin, সমুদ্রের ধারে কিছুটা সময় কাটালেই যাদের দেখতে পাওয়া যায়। তাদের এক একজনই একদিনে খায় কুড়ি থেকে ত্রিশ পাউন্ড মাছ।

সমুদ্রের তীর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে নানারকম ঝিনুক। বড় বড় ঝিনুকের বুকে টলটল করছে লোনা জল। বাহারী ঝিনুক খুঁজে পেতে একটু মনোযোগ দিতে হয়। নান্দনিক কারণে তাদের চাহিদা বেশী। তাই ঢেউয়ে ভেসে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই উৎসাহী পর্যটক কুড়িয়ে নেয় তাদের। কিন্তু বাহার যাদের কম বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় তাদের ভূমিকা কোন অংশে গৌণ নয়। জল আর বায়ুর ক্ষয়কার্যের প্রভাবে এইসব শামুক, ঝিনুক, শাঁখ বালিতে পরিণত হয়। তার ফলে অটুট থাকে সমুদ্রতীর বর্ত্তী উপকুল। আমিও মনের আনন্দে ঝিনুক কুড়োলাম কিছু। গোলাপী, কমলা, হলুদ – নানারকম। ফিরে গিয়ে তার কয়েকটা দেব তোমায়। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চোখে পড়ল চকচকে বাদামী রঙের ভারী সুঠাম প্রায় ৫'' লম্বা একটি শাঁখ। কুড়িয়ে নিয়েই বুঝতে পারলাম সেটি জীবিত। দোকানের তাকে রাখা শাঁখগুলির আবর্ত্ত যেখানে শেষ হয়েছে সেই অংশটুকু ফাঁকা, এ তো দেখতেই পাও। জীবিত শাঁখের বেলায় সেখানে থাকে একটা কালো পর্দা, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে বলে operculum ভিতরের প্রাণীটি জীবিত থাকলে সেই operculum শক্ত করে বন্ধ থাকে। হাতে ধরে না দেখলে বোঝার উপায়টি নেই। আমি যেখান থেকে শাঁখটি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম সেখানেই আবার তাকে যত্ন করে রেখেদিলাম। আমার বসার ঘরের সৌন্দর্য্য বাড়ানোর জন্য ভিতরের প্রাণটিকে নষ্ট করে কি লাভ হত বল ? আকাশ মাটি, জল বালির এই যে শোভা সে তো প্রাণ আছে বলেই।

আর কিছুদুর এগোতেই এইসব দার্শনিক চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। জলচর পাখীদের সভা বসেছে ভীষণরকম শোরগোল তুলে। তাদের মধ্যে দুরকম পাখী চিনতে পারলাম – এগরেট আর হিরণ। দুটো পেলিকান ভেসে বেড়াচ্ছে কিছুটা দূরে। সভাসমিতির যোগ দেওয়ার তাদের কোনরূপ আগ্রহ দেখা গেল না।

আজ শুধু সকালবেলাটুকুর কথা কেমন ?

সারাদিনের বাকী কথা লিখতে ইচ্ছা করছে না। ভাবছি তোমার কথা। জানি তুমিও ভাবছ আমাকে। ভাল থেক।

নীল

Saturday, August 20, 2016

তন্ময়,

আমার ছুটি শেষ । আজ ফিরে যাওয়ার পালা । গতকাল বিকেলে wild life watch cruise এ গিয়েছিলাম । সমুদ্রের বেশ গভীর পর্যন্ত যাওয়া হল । সেখানে আকাশ আরও উদার । জলের বিস্তার অপার । তরঙ্গ আছে সেখানেও । জলের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে অনন্ত গভীরতার উপলব্ধি হয় ।

এই দ্বীপটির ইতিহাস, প্রকৃতি, এখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সবকিছু সমুদ্রকে ঘিরে ।

এই দ্বীপের উত্তরে আছে আরও একটি দ্বীপ । তার নাম নর্থ ক্যাপটিভা । একসময় নর্থ ক্যাপটিভার আলাদা কোন অস্তিত্ব ছিল না । ১৯২১ সালে হারিকেন চার্লি ক্যাপটিভা দ্বীপটি ভেঙে দুটুকরো করে দিয়েছে । দুটুকরো ভূখন্ডের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা জলরাশির নাম 'রেড ফিস পাশ' । জলের স্রোত খুব জোরাল সেখানে । নাম থেকেই বুঝতে পারছ অসংখ্য রেড ফিস ঘোরাফেরা করে সেই জলে । ডলফিনের আনাগোনাও সেখানে তাই বেশী ।

নৌকা চলছে । হঠাৎ দেখা গেল সবুজ নীল জলের তলা দিয়ে কালো চলমান কতগুলো ছায়ামূর্তি তীরবেগে আমাদের নৌকোর পাশ দিয়ে চলেছে । তার পরক্ষণেই কিছুটা দূরে কখনও পুরো শরীরটা শূন্যে তুলে দক্ষ ডাইভারদের মতো নীল জলে লাফিয়ে পড়তে থাকল দুটি ডলফিন । নৌকার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ক্যামেরা হাতে উদভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করছে পর্যটকরা ।

বটলনোজ ডলফিনরা সাধারণত পরপর দু তিনটি লাফ মারতে ভালবাসে । তাই একবারে না পারলেও অনেকেই চেষ্টাচরিত্র করে এক দুটি ডলফিনকে শূন্যে লাফিয়ে ওঠা অবস্থায় ক্যামেরা বন্দী করতে পেরেছেন ।

শূন্যে তখন অন্য খেলাও চলেছে । তার খেলুড়িরা হল সামুদ্রিক সব পাখিরা সমুদ্রের মাঝে মাঝে যেখানে গভীরতা নির্ধারক খুঁটি পোঁতা আছে । তার উপর থেকে থেকেই এসে বসছে অসপ্রে । ঠোঁটে মাছ । নৌকার এক কর্ত্তা একটি মজার গল্প শোনালেন । একবার নাকি এক করমোর‍্যান্ট ঠোঁটে মাছ নিয়ে উড়ছিল । হঠাৎই তার সামনে চলে আসে এক 'বল্ড ইগ্‌ল' । অপ্রত্যাশিত আততায়ীকে দেখে করমোর‍্যান্টের ঠোঁট থেকে মাছ খসে পড়ে । সে মাছ জলে পড়ার আগে শূন্যেই তাকে গিলে ফেলে বল্ড ঈগলটি ।

জলচর পাখী আর প্রাণীদের নিয়েই এই দ্বীপের জীবনের নাটক । গতকালের সূর্যাস্ত ছিল একেবারে অন্যরকম । পশ্চিম দিগন্তে গাঢ় লাল কমলার ঘনঘটা নয়, সারা আকাশ জুড়ে এক অদ্ভুত নরম আলো ছড়িয়ে পড়ল সূর্য ডোবার আগে । খোলা সমুদ্রের হাওয়ার সঙ্গে মিশে সে আলো এক মায়াময় পরিবেশ তৈরী করে দিল । মনে হচ্ছিল আলো, হাওয়া, জল, আকাশ, মাছ, পাখী – সব মিলেমিশেই সম্পূর্ণ এই দ্বীপের প্রকৃতি, জীবন । কোন একটা কিছু এর থেকে সরিয়ে নিলেই সুর কেটে যাবে । সেই মুহূর্তে নৌকার খোলা ডেকের উপর দাঁড়িয়ে মনে আসছিল রবীন্দ্রনাথের গানের চরণ –

''এই বিশ্ব মহোৎসব / দেখি মগন হল / সুখে কবিচিত্ত / ভুলি গেল সব কাজ, দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মান্ড মাঝে''

তুমি তো জান আমি মুহূর্তকে ক্যামেরা বন্দী করতে ভালবাসি না । পারিও না ঠিক । তাই শব্দ দিয়ে কিছুটা ছবি আঁকার চেষ্টা করলাম এই Captiva island-এর । ভাল থেকো । ফিরে গিয়ে কথা হবে ।

নীল

Editorial

Lessons

Lessons are all around us not only in our educations, but in any book we open and any person we truly listen to. The best lessons I have learned have come from dedicated teachers, my parents, relatives and friends and from observing nature and other people. Even strangers whose names I never knew have taught me valuable lessons.

In college a man I met asked me what I did. I said that I was a writer. “Write what's true,” he advised me. Whenever I write an essay, an article or even compose a poem or fictional story, I consider which parts of it are “true”, honest and meaningful.

The emotion and moral in a story or poem can be a universal truth like friendship or perseverance even if the characters and setting are completely fictional as in “The Land Where It Rained Erasers” by Samrat Bose.

Respect for nature and human life resonates in Viola Lee's poem “Gray Wilderness”. The renewal of spring in “Solis Invicti” by Souvik Dutta and the unexpected friendship in Mekhala Bannerjee's “Black Pearl” offer timeless truths.

The Kharbanda family's dedication to each other, even when forcibly separated in India's partition in 1947 and the courage of the Indian National Army in Anjan Roy's “A Glorious Defeat” taught me lessons I never learned in school and made me think more deeply about war, freedom, family and the best lesson my father shared with his four daughters, simply “Never give up.”

I have applied that lesson in my education, my work and maintaining my friendships and family life in spite of distance. In my story “The Last Lesson” a student longs to go to college but fears the cost for her family. In “I Cannot Live Without Books” by Rochelle Wooding, students and teachers, readers of all ages enrich their lives with reading. In “Communication of the Self” Allen McNair offers us freedom of the mind and heart. In “Papadam” Balarka Bannerjee shares a literal taste of the culture of Southern Indian cuisine. The painful lesson in Menachem Emanuel's “Mango King of Trees” calls on us to stand up for women's lives everywhere. Maureen Peifer's “North Sea Jazz” sings out to music lovers worldwide.

In Bengali and in English, our Batayan writers open a window into their lives for readers and offer them a new view of the world, new lessons and inspiration. In Batayan, we write what is true.

Jill Charles
English Editor

Gray Wilderness

Viola Lee

Let us write a sentence or two.
Let us continue on and on as if
even though we are becoming
the grass, the leaf, the hydrogen,
even though we are becoming
the oxygen, the birds, the bees, the trees.
Let us call this then, our gray wilderness.
Let us become the prairie grass,
this prairie who often restores herself,
sunlight and ash always unearthed.
We will become part evolution,
part embankment, part adaptation.
We will become the weight of it all
of how things will often occur.
Let us re-examine our words then,
this grace and this relentless gratitude.
Let us re-examine our need
for solitude as we struggle again
and again to write these syllables
move us to water and to the rivers
of ice and light. It is not that we
live with regret and resentment.
But, it's that there is this dichotomy
in a need to do our work: me, you, us,
the -*what we should*- over the -*what we want*-
The should: nurse, teach, reinforce this
practicality. The want: write
the story of our lives in verse,
drink coffee irresponsibly, follow
freedom over responsibility.
So many similarities even:
in the end, there's this thirst to reason
to build: fill the cloud of white noise.
grill something savory to taste,
still the same napping schedule,
still all day at the park as soon
as the clouds turn. But isn't poetry
practical after all? Don't we need this
as much as we need the water, the light,
the earth, this earth, where we are always
uprooting and re-rooting ourselves,
trying to understand this grain of sand,
the unending universe in fingers,
in this skin, in this dark and eternal
soft opening made of light and ink
and all these consistent moments
of redirecting the danger of light
Follow the path, you once said to me,
Follow it until your body heals.
And so we must
and so we shall.

Mango King of Trees

Menachem Emanuel

***LUCKNOW, INDIA* – May 29, 2014, AP**, Two teenage sisters in rural India were raped and killed by attackers who hung their bodies from a mango tree, which became the scene of a silent protest by villagers angry about alleged police inaction in the case. Two of the four men arrested so far are police officers.

Mango
King of trees
Bearer of the most fragrant fruit
Evergreen leaves to grace the bridal bower
`The promise of sweet beginnings

Amika
Mother goddess
Gathers her daughters
To teach them to do no harm
To any living being
And keeps them safe in the embrace
Of the Holy Mango Tree

All this overarching majesty
Token of abundant fecundity
Is grafted on wild stock
A shrubby thing that prises
From thin poor soil
A few leathery leaves
And bitter fruit
Hinting of turpentine
Upon this unlikely root
Generations have raised
The cultivar from whose scions
Spring
The King of Trees
Fathering the sweetest fruit

At the height of day
The wanderers come to rest an hour from their path
The gatherers and gleaners of the field
Sojourn beneath the boughs
To forget the metal skies and pitiless sun
And the Sacred Mother comes to nurse her calf
All harboring in the in the shade of the Holy Mango Tree

When the sun dies in the west
The grove grows still
The golden mango birds fly home to rest
All that's heard is the thrumming
Of the cricket clan
And the faint far-away tiger cry

As it strikes its prey
Two will not return to rest
Like the golden mango birds
Hidden in the safety of the Holy Mango Tree

Strange fruit greet the rising sun
Two perfect sisters
Unripe fruit
Hung along the bough
Of the sacred Mango Tree
Mute testimonies
To something old and dark
Ancient savage ceremonies

How many millimeters how many millennia
Do you suppose
Separate
The amygdala and the pineal gland
Where dwell the reptilian remnants of our brain
From the prefrontal cortex
Where we suppose
Our sense of grace and sin begin
How far apart
Time enough later to explain
To allot the blame
To deal with guilt and recompense
Now only to stand before the holy Mango Tree
To taste the horror of it all and all

And fetch the victims down
Down from the silent Mango's limbs
These sacrificial lambs
Wash the blood away
Wind them in their final shrouds
Place them oh so gently and so tenderly
On the funerary pyre

Scream out loud
To the Master of us all
And make Him see
This is not the way
It's supposed to be
When will it be revealed
The meaning of it all

These shunned broken ones
Auctioned off
To sweat their youth away in a brickery
Or sold to slake some unholy thirst
Or made temple girls to dance and serve
All these will not come home again
Like the golden mango birds
To rest beneath the Holy Mango Tree

Sleek and sweet fleshed fruit
Within in its seed
Conceals a bitter core
Germ of a time of tooth and claw
When blood and iron made the law
When one took because they could

After the flames have done their work
All there is left are ash and dust
The rising drafts from the fire
Swirl away the garments of their here and now
To join the remnants of exploded suns
That we see tonight as stardust
Far above the Holy Mango Tree

On behalf of Batayan editorial team, I want to acknowledge Jill Charles for her hard work. Jill does it out of her sheer love and passion for literature. English section of Batayan has always been full of great literary merit. The 'Sankalan' issue is no exception. It is beautifully put together by Jill. My hearfelt thanks to all the contributors. We look forward to having your support in the upcoming days. Stay well everyone. Keep reading, keep writing.

Ranjita Chattopadhyay

Circle of Life, Circle of Being

David Nekimken

Being
Keeper of secrets, keeper of mysteries
For seekers of the ever-elusive Truth…
Moving beyond the smallest circles of our lives
family, neighborhood, national origin, national residence
religion, gender, racial, class boundaries
Towards our solar system: sun, planets, moons
outward towards the far-flung systems of the Milky Way
through black holes, wormholes, past
giant stars, dwarf stars, twin stars
eluding meteor showers, comet tails, gaseous swarms
slingshotting towards the most distant galaxies
Ultimately reaching the center, the origin, the end of the Universe…
Questioning
Who we are
Where we are from
Where we are going
What we are doing here
Are we alone, is there intelligent life beyond planet Earth?

Being
Revealer of all secrets, all mysteries
For the wonderers, the awestruck of the Universe…
From the largest circle of the Universe
embracing the vast canopy of stars in the night sky
an infinite array of galaxies, both large and small
a giant network of solar systems with their suns, planets and moons
To the circle of Earth's orbit around our sun
encircled by longitudes and latitudes
the great oceans and great continents
the intricate interlacing of interlocking circles of life
To a small, intimate circle of human beings
populating and cohabiting many still smaller circles
geographic boundaries, natural and manmade
ethnic, gender, racial, class identities
cultural and family values and histories
To our own unique circle
physical maps of cells, genes, DNA histories
intrinsic values of spiritual origin
A lifetime of beliefs, needs and stories...
Circle of Being
Circle of Life
Circle of I

North Sea Jazz

Maureen Peifer

Rivers of music flowing into the North Sea
Blues from the Mississippi where
Afro - Cuban Arturo O'Farrill disseminates, articulates his jazz heritage
Chick Corea's piano notes in the Amazon
Earth, Wind, and Fire illuminate the Nile

Pharoah Sanders slides and glides his saxophone doing
molasses tai chi yoga between alto bars
while percussion waterfalls tinkle around and through him

Kurt Elling and Cecile Savant scat, snap, sing through the currents of Branford
Dr. Lonnie Smith sails up and down the Hudson on his mighty ship
Hammond B3, turbaned teeth twinkling through tuneful waters,
bass bouncing off and under his bright notes

Arturo O'Farrill unapologetically plays " FUCK TRUMP" to let us know
Hispanics won't stand for it - NO!!

Round white frames on Cecile's round black head as round rich tunes
emerge from her sweet red lips and the ringdingding of her trolley
transports us to Afro Paris from Judy Garland's white St. Louis

A sea of humanity flows up and down these rivers of sound
Diving into the waters of Pharrell, Esperanza, Kurt
Pulsing to the waves of the Roots
Blending into streams of Heineken, wine, Moscow Mules, mojitos
Fueled by herring, fruit, curry, tapas, barbeque, satay, sushi
Throbbing to the dj beats in Tigris
Thrumming to jazzy Columbian harp strings
Internal beats joining your heart, your blood pulsing in the Great River
That is North Sea Jazz
That is the music that joins us
That is this sea of humanity
That flows into and out of AHOY ROTTERDAM
The rivers to the sea of life
That join us despite bombs, bullets, planes
The music flows over and through it all pulsing
LIFE LIFE LIFE

Communication of the Self

Allen F. McNair

There is a place where I like to go
Deep within my mind and heart.
It is a place of unbounded bliss
Which I enjoy relating to others.

An unlimited reservoir of creativity.
It allows me great wisdom to express
To others about life's experiences.
I am able to tap into it twice-daily.

Ideas effortless bubble up within.
My writing and illustrations grow
Inside my head, capable of fruition.
I am soon in the zone of productivity.

When I go beyond my thoughts
I experience something greater
Than the mental sum of my parts.
It is a field of all possibilities.

The deep-rooted stresses just melt away.
My mind is then freer than the wind.
Many of the poems I write provide
New insights into others' character.

The feelings and thoughts of each poem
Reach universal truths in my constant
Effortless communication of the Self.
Without poetry, I could not communicate.

Just a few words of title or theme rapidly
Expand to complete stories in poetry.
I am able to paint solid word-pictures
That have been transformed to artworks.

The energy expended in telling these stories
Is really quite minimal to my versatile mind.
Going to my place of rest and tranquility
Transforms the individual self to cosmic Self.

The Self is all there is within each person.
Anyone has access to this infinite Self.
I have had this experience for over forty years
Since instructed in Transcendental Meditation.

Poetry is the universal expression of one's thoughts.
Its great importance is very real, especially to me.
Individual pieces about homelessness and its adventures
Have progressed into an epic poem set in the future.

My mind and heart have also grown apace.
Poetry has given me a voice to be heard.
My own world is a better place originating
From thoughts and progressing into words.

My wish to be self-published has borne fruit
My epic poem, *I Dream of A'maresh*, has
Taken root in the minds of many readers
Both in the recent past and soon into the future.

I look forward to telling other stories every day.
With the constant communication of the Self
There is no end to what I can express to all.
And poetry actually makes all of this come true.

If Our Hearts Travel

Jill Charles

There is another country
In this one
You can walk or go by bus
You can reach it if you listen.

Every language sings
You know the feeling
If not the punctuation.

There is another country here
You can taste it if you try
In falafel and tahini
In pistachios from Rome
In baklava jeweled with honey
The soup pot in every home.

You are welcome in the game
Children from Iraq, El Salvador
Playing tag or hide and seek
Kick and chase the soccer ball
As they recognize each other
The parents nod and smile.

Men drew borders on the map
States and nations come and go
If our hearts travel every day
The whole world will be home.

You and I

Balarka Banerjee

You and I
Were never meant to survive
You and I
Just a twinkle in some mad child's eye
Just a wisp of foam
On some foreign tide
You and I
Were never meant for this
These forms full of puss and piss
With grobs in our knobs
And knots in our spots
With joints that go creak
And knees that grow weak
Just bags of bubbly fat and meat
Bound together by an elastic sheet
With cracks that ooze
And edges that seep
Poisoned by booze
And lack of sleep
And that flowy red juice that never seems to cease
No
You and I were never meant for these.
We were two bits of dandelion
Soaring for the clouds
Two verses of secret prayer
Whispered out loud
Yet in a world that was created to die
Where all existence has no persistence
And maybe when all is gone to entropy
Maybe all that will ever be
Maybe. Just You and I.
Two lonely specks of light
I blink once for you
And you blink in reply
You and I
Will be all that survive

ESSAYS

Siding

Josef Steiff

I thought we were rich. And it made me uncomfortable.

Never mind that my mother worked two jobs most of the time I was growing up. That just made me feel like an adult, because I got the whole house to myself and could watch *Dark Shadows* - with its vampires and witches and time travel - after school.

Never mind our dinners made up of a slice of white bread topped with two tablespoons of gravy made from breakfast's sausage drippings. Or a hot dog cut up in Campbell's Baked Beans. Or our Friday night tradition of cheese and crackers.

Never mind that we were eligible for food stamps even with my mom's two jobs though my mom wouldn't sign us up for them. I didn't really understand what food stamps were. I imagined some special perforated sheet from the post office with pictures of mac and cheese instead of birds or presidents.

Or maybe they were a special kind of stamp you got at the grocery store, like the time my mom and I went shopping and I was given my very own grocery list for the first time; I was supposed to find us napkins, the word printed out in big clear letters so I would recognize it when I saw it. I was so proud when I found a box of them, not the usual flimsy plastic wrap package. On a shelf almost out of reach, the box was really cool; it even had a woman on the front. I didn't understand when my mom put them back. I mean the woman looked like an astronaut, all dressed in white, with her hands on her hips, standing confidently, a round glass helmet on her head. I didn't know what the word 'sanitary' meant.

I knew we were rich because we had siding on our house, brown one by three shingles rough to the touch when all the neighbors' houses had black tar paper or weathered wood slats, and had potbelly wood stoves when we had a gas wall furnace on the six foot long partition that divided our sleeping area from the kitchen slash dining room slash living room. It didn't occur to me we were basically living in a one-room house.

Never mind that our house had been a chicken coop and before that where they stored the apples of my mom's childhood or before that the moonshine still of my grandfather's young manhood.

To me it was like we lived in a brand new house, not an old shed with snakes in the walls, moss on the roof, nestled among hundred-year-old oak trees. Because now it had siding. And a sliding glass door that provided a vista of forest and fields and a tree that would one day be struck by lightning and split to reveal a massive honeycomb and beehive. It was almost like living outdoors… except with a gas furnace.

My mom didn't like doors or walls; she wanted no place to be hidden or out of sight. One six-foot partition and a sliding glass door made total sense.

My grandfather had tried to level the floor as much as possible, but it still pooled the mop water in the center of the house, and the linoleum looked wavy with sharp edges and ridges of black lines from individual boards cracking through as they continued to rot and sink beneath the green with gold and silver flecks.

My mom, as a divorced single woman, was not able to get a loan to buy or build a house. But she could get a home improve-ment loan, so she and my grandfather walked the farm, looking at every outbuilding to find the one most likely to meet the bank's definition of "remodel."

"Ralph's House" was in the best condi-tion, abandoned and empty since he had died ten years before. But my grandparents worried about the fact it was right off the rutted gravel township road that ran along one edge of the farm, isolated and out of sight, the nearest neighbors a mile away and too far from my grandparents' house to feel secure, to feel safe.

The bunkhouse had the opposite problem, too

close to my grandparents' house, at the edge of their yard. And its ceiling was only five feet high perfect size for me but not so much for my mom.

I wanted us to pick the hay barn and would draw pictures of how we could turn it into a house and how my bedroom would be the farthest room, the one that opened out into the pasture, the room where I was once trapped by our bull until my grandfather heard the dogs barking and came to see what all the commotion was about, and the room where I'd sulk as a teenager. It always smelled of warm dusty hay particles that swam through the sunlit air whenever I settled into the bales.

Unfortunately most of the barn didn't have a floor, and so it didn't make the bank very confident that their meager loan could "improve" it enough to make it livable. Instead it would become the place I'd raise rabbits and later park my motorcycle, because neither of them minded the dirt floor, as cool to my bare feet as the tin roof was hot in the summer sun.

And so it was the chicken coop, apple house, whiskey still that became our home. With its siding and gas furnace and cistern with pump so we could have an indoor bathroom.

I'd live in these 400 square feet from nine years old to nineteen, though we would eventually add another two rooms for a grand total of 600 square feet.

My mom would work two jobs, though once she found out I was watching *Dark Shadows*, I would have to go to my grandmother's house right after school till my mom got home. She and my aunt would can and freeze the food we raised. I'd paint houses in the summers or put up hay for spending money. I'd help around the farm where I could.

And my grandfather and my mother would make sure I went to college, able to afford books and tuition.

I'd be embarrassed by all we seemed to have. I never knew we were poor.

Regarding Utopia

M. C. Rydel

They think they can build something perfect,
A castle on the tip of a peninsula
Separated from the mainland by a moat,
Where you leave all the doors unlocked,
Feed the neighbors, pray however you want,
And tolerate graffiti and revolution.

I spray paint footprints on the mailboxes
And stone walls, fight off their trances
And enchantment the way the west wind
Might breathe autumn into an August day
Scattering leaves on cobblestones,
Months before it's supposed to happen.

I love life in something, almost perfect,
Embrace quintessential sorrow
Savor lost loves and squandered fortunes,
Sunbathe half naked next to the misty sea,
And protest perfection for the sake of stains,
Litter, diapers, stuttering, and white lies.

They have, in fact, created something perfect,
Perfect theatre, fiction, science, and art,
Reality projected on a movie screen,
A synthetic pearl, a silk rose,
A morning fog like an angel, a bodiless body
Who makes us forget everything one life to the next.

I am just trying to remember last night,
The utopian coffeehouses and pubs,
The latte, beer, vodka, and rum,
Taking a boat out into the bay
The illuminated castle like a chocolate candy
Ready for the continent to consume.

ESSAYS

Solis Invicti

Souvik Dutta

A 6th grader was asked by her bus driver why she is celebrating Christmas, when she is of Indian origin. She smiled at her bus driver and said "Well, because I can." However, she herself wasn't happy about the answer she gave to the driver. She wanted to know more, she had questions that needed to be answered. She had to feel connected to the most popular festival in the country she was born in, even though she was born to immigrant parents.

The above is a true story that compelled me to write about the ancient origins of Christmas. I dedicate this article to that lovely girl and all children of different races and nationalities.

Humanity created festivals to remember certain times in the year and to celebrate time, over and over again every year. Time was recorded by a calendar. The calendar was recorded by the changing seasons and phases of the moon (lunar). Almost all ancient calendars were lunar in nature. The solar calendar we use today is most simple, but a hugely inefficient way to record time.

Four major turning points in the year are the two solstices and the two equinoxes. The Winter Solstice is very special. In the Northern Hemisphere, it is the day when the night is the longest. From that day onward, the length of day increases right up to the Vernal Equinox, when the length of day and night are the same. From the Vernal Equinox to the Summer Solstice, the length of the day continues to increase until the day of the Summer Solstice when the night is the shortest. From the Summer Solstice, the length of day gets shorter and the nights longer. On the Autumn Equinox, the night and day are of equal length, and from that day onward, the length of the night increases right up to the Winter Solstice.

Light, and hence day, was associated with divinity in ancient Greece and Rome. In *Sanatan Dharma*, light is associated with *devas* and *purusha*. Darkness was associated with demons in ancient Greece and Rome, while in Sanatan Dharma it is associated with *asuras* and *prakriti*.

The Winter Solstice and the Romans

The Ancient Romans always celebrated the rise of the Sun God over a period of three days during the Winter Solstice. They called the festival "Dies Natalis Solis Invicti," the birthday of the unconquered sun. *Sol Invictus* means the "Unconquered Sun." Unconquered is a very interesting word here. This shows the revival of light even on the darkest day of the year. It also reiterates the truth that from this day/time onward, the day, and hence the power of the sun will keep increasing in length.

The three-day celebration which begins on the day of *Uttarayan* (or Winter Solstice) is very symbolic. The number three, just like in Sanatan Dharma, represents three planes of existence among Romans too – the netherlands (*patala*), the Earth (*bhuloka)* and the heavens (*swarga*). Over three days the rise of the sun in each of the three zones was celebrated.

After the rise of Christianity in Rome, especially among the poor peasants, the nation was in a state of anarchy and dispute. At this time, the Roman emperor Constantine I called the First Council of Nicea in 325 CE. It was a council of Christian bishops who convened in the Bithynian city of Nicaea (currently called Iznik, Bursa province, Turkey), and it was in this council that modern day Christianity was born. Which books to be included in the Bible, which books to be left out? – these important decisions were all taken in this council after both religious and political scrutiny. Constantine had been a strong pagan and sun worshiper before converting to Christianity in 312 CE.

It was in this council that, due to the influence of Emperor Constantine I, the ancient tradition of "Dies Natalis Solis Invicti" (Birthday of the Sun God) was given the overlay of the birthday of the son of God, Jesus Christ.

Many more concepts were borrowed from the Roman God Sol and incorporated into the life of

Jesus Christ. If one looks closely, one theory connects the Biblical elements of Christ's life to those of a sun god. According to the scriptures, Jesus had 12 followers or "disciples," which is akin to the twelve zodiac constellations. When the sun was in the house of Scorpio, Judas plotted with the chief priests and elders to arrest Jesus by kissing him. As the sun exited Libra, it enters into the waiting arms of Scorpio to be kissed by Scorpio's bite.

The Winter Solstice and Sanatan Dharma

From the Winter Solstice, the sun enters its northward movement and in the process, brightens up the days (as in making days longer). Beginning from the Winter Solstice to the Summer Solstice is considered a span of time which has more light, and this time period is called *Uttarayan*.

It was believed that people who leave their mortal body during Uttarayan will attain the abode of the gods (devas). This finds mention in the Mahabharata when Bhishma, with arrows pierced in his body, did not leave his mortal body until the day of Uttarayan.

Uttarayan has been always associated with the worship of Surya and Vishnu among Hindus. The Winter Solstice is considered to be the day when Vishnu wakes up from his 6 month long sleep. Vishnu is said to sleep during *Dakshinayan* (Summer Solstice to Winter Solstice) and wakes up on the first day of Uttarayan.

The celebration includes the ringing of bells, burning of incense and loud chanting so as to wake up the gods from their 6 months sleep.

taraṇirviśvadarśatojyotiṣkṛdasisūrya |

viśvamābhāsirocanam ||

~ Rk Veda, Mandala 1, Hymn 50, Verse 4

In the above verse from *Rk Veda*, Surya is called *jyotiṣkṛdasi* or the maker of light (*jyoti*). Thus from the first day of Uttarayan, the same concept that is iterated by the Romans, is reiterated by the Hindus – the rise in the power of the unconquered Sun.

We can celebrate a festival in any way we want. We can call it by any name we want. We can belong to any race, religion or creed. However, we cannot forget that nature came first, man next, and religion was the invention of man to better understand nature. Festivals are nothing but an attempt by man to remember and admire the message of nature. We should never forget this in our arrogance.

ESSAYS

I Cannot Live Without Books

Rochelle George Wooding

" I cannot live without books!"

— Mark Twain

Have you ever smelled the pages of a newly printed book? It is similar to smelling a new baby just after it has been brought home by his parents and lathered with baby oil and baby powder. There is a distinct fragrance of paper and ink that makes you smile. Why? Maybe you are the first person to touch that book after it was born, I mean printed and distributed in a school library. I caught one of my students sighing and placing a book on his cheek. I inquired what he was doing. He said, "My favorite book! I loved this book so much when I was younger." Just smiled at him and thought to myself, this why I am a librarian! I want to give my students the experience of loving books and the absolute joy of reading a book.

There is nothing like a new book, or an old book that you have been looking around the library, home, or elsewhere to purchase. It makes me smile when you find it, and if you don't believe it, check your facial expression when you find, and touch the book you love and finally located.

A librarian who loves books and the students and/or patrons can see examples of books and what they do to a reader. I would share with the students that sometimes I would have three different books I read at my home. One would be in the living room by my big chair; one in the bedroom near my table lamp, and my Bible/Daily Bread in my purse.

My love of books extends to the new and the old. I have my books from an early age that brought me smiles and laughs. My books are a treasure that I value. I can remember the title of a book that I read in the 4th grade, Under This Roof. I told myself at the age of 9 that I would never forget the title. It gave me such a picture of family and what one member of the family could do to keep the family together. The main character, the older sister of three, worked so hard to keep her family afloat during a hard winter season, she had me mesmerized with her abilities. Books have taught me how to live in this world and appreciate my family. Books have allowed me to learn a language, visit countries through reading, and enjoy a good mystery.

My autographed books by the author are my treasure too. I remember making my way to the bookstore on 52nd Street and Lake Park, to listen to Terry McMillan read Waiting to Exhale. Hearing the author read their written words was a thrill. I waited in line to have the book signed, but my legs gave out. During my tenure as a librarian, I attended many meetings, workshops, and conventions where I met many authors and did get an autographed book**.** The Watsons Go to Birmingham**,** Bud Not Buddy**,** Newberry Book winners, by Christopher Curtis, Chicago Haunts and More Chicago Haunts*,* by Ursula Bielski, just a few of the many autographed books I have in my home library. One book Chicago in 2010 featured, A Mercy by Toni Morrison the renowned African-American author and the first 100 people got a free book. Also, there was a free meet and hear from the author at the Auditorium Theater. I stood in line for both events and did receive a copy of her book. If it were not for friends that got to the theater earlier than I did, I would not have been able to get a seat. My biggest coup was in Cleveland, Ohio at the Cuyahoga Community College at the downtown campus where the author of Roots, Alex Haley, was introducing his book. I saw, listened, and asked a question. This was before the movie. I was a beginning high school English teacher in a school where desegregation of schools began with the teachers in about 1971. I had most of my students ready to go to Africa with my enthusiasm. We also read, Things Fall Apart and No Longer at Ease, by a Nigerian author, Chinua Achebe. I wonder if any of them have traveled to Africa?

I continue to make it to book readings and signings in an effort to purchase the book, newly printed, and see the author. Some authors do not match your musings. One of the readings that we had with old writing groups at the public library was the time someone asked me to sign my submission.

Yes, I cannot live without books and if you visit my home, the most items I have are books on paintings and books on living better and longer, and volumes of books on every subject.

ESSAYS

A Glorious Defeat

Anjan Roy

[Not many North Americans know that a large number of the Indian population had taken up arms in South East Asia to free India from the British rule and the man who spearheaded that movement, many consider him the "George Washington of India", was Subhas Chandra Bose, respectfully called 'Netaji' (the revered leader). American Historian Professor Peter Ward Fay wrote:

> "Halfway through the Second World War there appeared quite unexpectedly in South East Asia an army, an Indian army; an army with an adored and indomitable leader by training not a military man at all; an army that using Malaya as a base, Burma as a launching pad, and Japan as a helpmate, tried - even as the war in that part of the world wound up towards its by then inevitable close - to throw the British out of India."

Ironically, the contribution made by that army to the cause of India's independence has not been recognized. Although its efforts failed, it has been established by many Western historians that this Army, known as the Azad Hind Fauj or Indian National Army, left a long lasting influence on the Indian population, particularly on the British-Indian Army. History says that the British Administration became worried with the changing political situation in India as the public sympathy towards the INA soldiers and the INA's influence on the Indian servicemen in the British Army grew steadily after 1945. The reason for which the British hurried to transfer power and leave India could be found in this Official Memorandum sent to the Viceroy of India by Sir Henry Twynam, Governor of Central Provinces:

> "I am bound to say that I do feel some uneasiness as to the attitude which Indian troops may adopt if called upon to fire on mobs. The disposition towards a sudden change of attitude in a tense political atmosphere is present now, I think, as it was in the days of the Mutiny."

With the aforementioned prelude, I tried to tell the story of the beginning of the end of the INA and how it influenced the British's decision to quit India, in a very brief way. The names Bose and Netaji are synonymous]

By the end of February, 1945 it became apparent that the Indian National Army's (INA) efforts to enter Imphal from Burma and move deep into India had failed and it also became obvious that the Japanese could not hold on to Burma much longer because of the rejuvenated British-Indian army's advancement with American assistance. But INA's Netaji Subhas Chandra Bose did not want to retreat from Burma, he sought to go to Mount Popa, a steep, isolated 5000-foot mountain instead, where one of his most trusted men Lieutenant Colonel Prem Kumar Sahgal of the INA's 2nd Division was camped. Bose's only wish was to 'fight the British unto death.' Hugh Toye wrote: "he would lead the INA to victory or death," as he had promised his troops that he would be with them "in darkness and in sunshine, in sorrow and in joy, in suffering and in victory."

Bose was in Meiktila in Western Burma at that time and his fellow officers were vehemently opposed to his going to Mount Popa. British-American bombers were bombing the area heavily. But Bose was adamant. Hugh Toye wrote: his motivation was: "his soldiers must create such a legend of heroism and determination that their countrymen could be inspired to raise the banner of revolution again in India." At one point Lieutenant Colonel Shah Nawaz lost his patience, he told Bose: "you are proposing to risk your life," he said, in effect, "just to show your personal courage, but this is selfless and you have no rights to do it; your life is not your own, it is a precious trust for India, held in our keeping: we are responsible."

Not only non-stop bombing by the Allied airplanes, the INA's fighting forces were faced with multifaceted problems such as, shortage of arms and ammunition, paucity of food, clothes and shoes, communication and medical equipment, medicines and above all non-cooperation from the withdrawing Japanese. Many of the INA soldiers became sick of malaria, diarrhea and other ailments. And there were the problems of desertions. Bose was devastated

with the news of daily desertions by his soldiers and officers and their surrender to the British. Bose ordered shoot at sight for the deserters and arranged evacuation of sick and injured soldiers. He also ordered evacuation of the women of the Rani Jhansi regiment for them to return to their parents. A report came that an advancing British-Indian armored column came within 16 miles of Meiktila. Bose agreed to get away if he could to Pyinmana (on the way to Rangoon and eventually to Singapore). The sky was full of enemy planes and the villages of British spies. Shah Nawaz wrote:

> "I filled up the car with grenades and ammunition…. When we entered the car and started off [at about 9 a.m.] Netaji was sitting with a loaded Tommy gun in his lap. Raju [Bose's doctor] had two hand grenades ready. The Japanese officer was holding another Tommy gun and I had a loaded Bren…. We all were ready to open fire instantaneously. The Japanese officer stood on the foot-board of the car to be on the lookout for enemy aircraft."

Netaji returned to Rangoon on March 2, after receiving the news of daily desertions. Nevertheless, the brave INA soldiers fought bravely here and there, but most of them died or were taken prisoner. Shah Nawaz had returned to the front. It may be noted here that Prem Kumar Sahgal surrendered in Mount Popa on April 4, 1945. Shah Nawaz and Gurbaksh Singh Dhillion were captured near Pegu on May 13, 1945.

On April 24, 1945 Netaji set off from Rangoon by road on the way to Siam (Thailand) and Malaya with a large contingent of INA officials and the women of the Rani Jhansi Regiment. Major-General A. D. Loganathan was left to preside over the INA surrender in Rangoon with 5000 soldiers. Netaji arrived in Siam on May 21, 1945. It was an arduous and dangerous journey, marching mainly under the darkness at night on foot and partly by train to avoid enemy bombing. He had offered Captain Lakshmi Swaminathan to come with his team, but she refused to leave Burma. She was eventually captured while hiding in a Gurkha village near Mawchi in early May 1945.

Upon arrival in Singapore, the Azad Hind Government's cabinet met frequently to discuss future options of its very existence including the future of its Netaji. There was no doubt in anybody's mind that the British agents were looking for Netaji, dead or alive. In the meantime the Americans dropped the atom bomb in Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 9, 1945 respectively. On August 10 Japan declared its intention to surrender, which it did and on August 15, 1945. The USSR declared war against Japan in August 1945 and entered the Pacific War. There were not many options left for the Azad Hind Government to consider, yet they met over and over again to discuss options:

1. Netaji will stay in Singapore and surrender to the British Army with all his military and civil staff.
2. He will stay in Singapore but remain underground under the protection of his followers.
3. He will move to Siam and stay in Bangkok (the King of Siam had actually offered him a safe sanctuary) disguised as a monk in a Buddhist monastery, until the dust is settled.
4. He will fly to Manchuria with his cabinet colleagues and try to negotiate surrender to the Russian authorities.

The 'final decision', according to S. A. Ayer, Publicity Manager of the Azad Hind Government, was "out of Malaya definitely, to some Russian territory certainly, to Russia itself, if possible. Netaji conceded that it would be an 'adventure into the unknown'."

The next morning, August 16, 1945, Netaji signed and issued the following order: "During my absence from Syonan (Singapore), Major General M. Z. Kiani will represent the Provisional Government of Azad Hind." It may not be out of place to mention here that arrangements were made to distribute sufficient money to INA soldiers and civilians affiliated with the Provisional Government, to see them through at least six months. He also made it sure for the five hundred women of the Rani of Jhansi Regiment camp in Singapore and the forty-five cadets he had sent to Tokyo for training in the army and the air force to return to their families with adequate funds and provisions. That day he arrived at Bangkok in the afternoon. On August 17, he took off from Bangkok airport and arrived in Saigon. According to Leonard Gordon : on August 17, 1945 Netaji arrived in Saigon to find out that there were no arrangements made by the Japanese for him to move

to Manchuria. It was mid-morning. He went to the home of an Indian Independent League member, where he shaved, bathed and went to sleep. But he was awakened within an hour with word that a plane was warming up at the airfield. In that plane there was an army officer named General Tsunamasa Shidei whose task will be to negotiate the surrender of Japan's Kwantung Army, and who would therefore be in a position to introduce Netaji to high-ranking Russians. Initially, Netaji had requested a plane for all his Cabinet members to fly together. But today, he was offered only one seat. Netaji refused to board the plane and negotiations followed. Eventually, he was offered one more seat and an assurance that another plane will be made available for the rest of his men to fly as soon as possible. Everybody was in a hurry to get away from Saigon. Netaji selected Colonel Habib-ur-Rahman to accompany him, not his old submarine mate Major Abid Hasan. Per Sugata Bose, he might have picked Abid Hasan, his submarine voyage companion, but Habid held the higher military rank and had served as his deputy chief of staff in Singapore. It was a twin-engine bomber of the type known as a Sally. The five members of Netaji's Cabinet who were left behind were hoping to join their leader in a day or two, but it was not to be.

The plane carrying Netaji and others landed at Touraine airfield (now Da Nang) in Vietnam in the late afternoon on August 17, 1945. The pilot decided to spend the night there and attempt an over-water flight to Formosa next morning. At Touraine the Japanese crew lightened the plane by removing the machine guns and some of the baggage. At five the next morning, Saturday the 18th of August, 1945, the plane took off again with its crew of four, its six Japanese army officers and two Indians, and arrived at Taipei six to seven hours later. At Taipei, while the crew refueled and checked the engines (the port one ran a little rough), the passengers ate lunch in a tent. They boarded again about two-thirty in the afternoon.

Peter Ward Fay wrote: "Bomber or no, the twelve men plus the remaining baggage and a full load of fuel were almost more than the Sally, which was old and tired, could manage. Nearly out of the runway when at last it lifted into the air, it climbed steeply, both engines laboring, and at less than a hundred feet lost the port propeller, which tore loose with a noise like a backfire. A wing dropped. The plane dove, stuck the ground, and broke in two. Shidei, pilot, and copilot died instantly. Habib-ur-Rahman was knocked unconscious, but regained consciousness soon and tried to lead Bose out the back. Baggage blocked their way so they turned and made for the front, which by now was on fire. Habib reached the ground safely. Gasoline, however, had soaked Bose's uniform, the uniform caught, and by the time he struggled free he was a living torch. Habib tried to beat the flames out with his hands. Bose seemed unable to help himself. Habib noticed that his face was battered and cut.

"Men came in trucks and carried the survivors to an army hospital. There Japanese doctors did what they could for Subhas Chandra …..He had third-degree burns over most of this body…. For several hours he was conscious and quite clear in the head, though in terrible pain. Then he sank into a coma. Habib, who was lying the same room with burns on hands and arms, told Ayer later that Netaji spoke to him before he died. "Habib," Ayer's rendering goes, "I have fought all my life for my country's freedom. I am dying for my country's freedom. Go and tell my countrymen to continue the fight." Fay continued: "it is possible Bose never spoke at all. But we can agree with Leonard Gordon that these were the words he would have wished to say, and would have prepared himself to say… He died between nine and ten that evening. It was still Saturday, the 18th (of August, 1945).

Let us look at Sugata Bose's book: "He (Netaji) stood outside the plane with clothes burning and tried to unbuckle the belts of his bushcoat round his waist. Habib's hands were burned in the process of trying to help him. As he was fumbling with the belts, he looked up and his heart nearly stopped when he saw Netaji's face, "battered by iron and burnt by fire." A few minutes later, they both lay down exhausted on the ground of Taipei's airfield….. The next thing Habib knew, he was lying on a hospital bed next to Netaji. For the next six hours, Netaji slipped in and out of consciousness. During those hours he never once complained about the wrenching pain he must have been suffering. In a delirious moment, he called for Abid Hasan. "*Hasan yahan nahi hain, Sab, main hun, Habib*" (Hasan is not here, Sir, I am Habib) - Habib-ur-Rahman explained to him.

Netaji told Habib in Hindustani what Ayer had

quoted as saying that he had fought for his country, etc….At about nine that evening, Netaji's mortal end came, peacefully." Habib tried to fly Netaji's body either to Singapore or to Tokyo. But it did not happen. At last Habib had to consent to a cremation in Taipei. The cremation took place on August 20; Netaji's ashes were placed in an urn and kept in the Nishi Honganji temple, close to the hospital. On September 5, Habib boarded an ambulance plane in Taipei with Netaji's mortal remains, on his journey to Japan. The urn was eventually taken to Renko-ji temple in Tokyo.

There have been controversies, as Ayer had predicted, about the death of this revered Indian leader. Many people still believe that Netaji survived that plane crash and went hiding. But, why would the Japanese lie? Most importantly, why Habib-ur-Rahman would lie? To this writer, the more important issue today is to examine the fruits of Netaji's efforts. There is no denying the facts that the British left India because of the influence of Azad Hind Fauj (AHF) on the Indian armed forces. The British administration could not trust the Indian army any longer after 1945, which had been the backbone of its power. This writer hopes that one day AHF's contribution to India's freedom would be recognized and the thousands of men and women who died fighting the British to free India under the banner of Azad Hind Fauj will be honorably remembered and given due place in the country's history. Can there be an "***Azad Hind Gate***" built in Kolkata, similar to the "Victory Gate" in Paris, initiated by Napoleon Bonaparte, to pay belated homage to the fallen Heroes of Azad Hind Fauj? ***Jai Hind !***

Author's Note: *1. Professor Peter Ward Fay obtained his PhD in History from Harvard University and taught History at the California Institute of Technology. He also taught at the IIT Kanpur for 2 years. He did extensive research on the subject and personally interviewed some of the INA survivors including Lakshmi Swaminathan Sahgal, Prem Kumar Sahgal. 2. Professor Sugata Bose (son of Sisir Kumar Bose) teaches History at Harvard University and personally interviewed many INA survivors including Habib-ur-Rahman, Abid Hasan, S.A. Ayer, Lakshmi Swaminathan Sahgal, Prem Kumar Sahgal. 3. Hugh Toye was a British Intelligence Officer posted in South East Asia during the Second World War and personally interrogated many of the INA prisoners of war captured in 1945. 4. Professor Leonard Gordon taught History at Brooklyn College, The City University of New York; Associate Director of the South Asian Institute, Columbia University, etc. He is an award-winning writer.*

Bibliography:

1. Professor Peter Ward Fay - **The Forgotten Army - India's Armed Struggle For Independence**, University of Michigan Press, Ann Arbor.
2. Professor Sugata Bose - **His Majesty's Opponent**, The Belknep Press of Harvard University Press.
3. Hugh Toye **- The Springing Tiger**, Cassell, London
4. Professor Leonard Gordon - **Brothers Against The Raj**, Columbia University Press, New York.
5. Professor Joyce Lebra - **Jungle Alliance - Japan and the Indian National Army**, Asia pacific Press, Singapore.

ESSAYS

A Journey With No Return

Mohan S. Kharbanda

From time immemorial, we were people of Chenab River – one of the five rivers of Punjab, India. Chenab holds a special place in every Punjabi's psyche. Its very name, Moon River in English, and folklore about tragic loves on its banks (Heer & Ranja, Sohini & Mahiwal) associate the river with mythical romantic powers. My father was born in Gajj Da Kot across one bank of Chenab and my mother in Chaniott on the other. My grandparents moved downriver to Lyallpur after the English governor of the state, Sir Charles James Lyall, founded it.

I was born in Lyallpur in 1946. The family had by then long put down roots in the new city and become affluent. Our family lived in a large estate in Lyallpur with multiple floors and bedrooms. One of the significant features of our house was modern plumbing that included a Western flushable toilet – a novel feature in late 1930s.

I was 18 months old when India was partitioned. The story below is what I have learned from my family.

In early August 1947, a train of half-alive Muslim refugees arrived in what is now Pakistan. They told a harrowing tale of murder, arson and rape on the other side. The Muslims of Lyallpur vowed revenge. Later that month occurred the great massacre of the Hindus and the Sikhs of Lyallpur. Sikhs were especially singled out. They could be easily spotted.

That week, a neighborhood near ours was attacked by a mob, led by a Muslim Sub-Inspector. In the evening, the family could see a huge wall of smoke and flame rising to the sky. Throughout that night Muslim groups armed with guns, pistols, spears, hatchets, and bamboos wandered about the streets attacking and setting fire to the Hindu and Sikh owned shops.

As the week advanced, panic buying by Sikhs and Hindus pushed up prices for gold, weapons, horses, and horse carriages. Prices doubled every day.

My father was on the Indian side for business and chartered a plane to fly our extended family out of Lyallpur. In the evening, we left in various horse carriages called tongas. Not all could fit in the carriages, which were soon overflowing. My older brother, 13 at the time, had a new bicycle and had me sit on the bar and hold onto the handle while he steadied me with one hand. My father walked beside us.

As we approached the canal bridge, we saw murdered Sikhs lying on the canal banks. My father, unsure if we would make it safely, gave some of his money to my brother and asked him to bicycle off if we were to encounter a mob.

When we approached the plane, there was pandemonium. The pilot had taken money from the rich among the people at the airport and had already filled the plane. My father, who had chartered the plane and paid in advance, was furious. He boarded the plane with my uncle to argue with the pilot but the pilot shut the plane door and the plane took off with my father and uncle. We were stranded on the tarmac.

With the plane gone, we returned to the house. It was hot in the noon Punjab sun. Mobs were more active in the evenings when it was cooler and we made it home safely.

That week, with the situation worsening, our local community issued instructions to all the residents to jump from the rooftops to the next house and then to the following until they reached the safety of our neighborhood Gurudwara. Women were instructed to wear at least two dresses and hide gold jewelry on their persons. My mother, in our father's absence, did not sleep and moved to the top floor terrace in the evenings to keep vigilance.

In fear, we waited for our father's return. Two days later there was an announcement by the police that they could not protect us. They asked that Hindus and Sikhs either leave for India or assemble at Khalsa College by 4PM, which was set up as a refugee camp. My mother resisted the move – she

wanted to wait for father's return. There were no phones or other means of communication then and our father may not have found us had we left for the refugee camp.

That evening as my mother began to cook for us, my father suddenly appeared at the house and said with urgency that we had to leave for Khalsa College right away. It was past 4PM. He had bought railway tickets for us but the railway station was not safe since he had heard the sound of bullets and found Sikhs and Hindus pouring out in the hundreds from the direction of the station as his train arrived in Lyallpur. Apparently Muslim guards had taken over the train station. There was no time to pack or discuss it further. The horse carriage was waiting outside.

The refugee camp at Khalsa College was safer when we arrived but earlier, the Baluch army had molested and abducted a few young girls and looted the refugees of their gold and cash. Sikhs and Hindus decided to kill their young wives and daughters if there was a danger of abduction again.

The college was not set up to house such a large number. It was unhygienic and wretched. Some children fell ill but I was spared. Most did not sleep much at night. We heard distant drums beating all night long, and sometimes the air was pierced by the dreaded cry of 'Ya Ali.'

My sister, about 5 years old at the time, recalls that one of her earliest memories is of watching mother cook food for the family in the camp making use of makeshift bricks and firewood. This was an early indication of the deprivation and hardship the family would endure for the next two decades.

In the camp we learned that our house was sealed to protect it from the looters. It also meant that it was already earmarked for a police officer or a politician. We were at the camp for roughly three weeks. Sporadically, buses were arranged at exorbitant prices to take refugees to the new Indian border. There was a mad rush to board the buses when they arrived. It cost Rs 600/head (current prices over Rs100,000) for the bus ride– a very large fortune in those days. In the melee my brother and sister, 13 and 10 respectively, boarded a bus for Amritsar. It left before anyone else from the family could board. Many families were separated and it took months before they were reunited.

While still stationed at the refugee camp, and after the bloodletting had diminished, we were informed that a military convoy was headed to Amritsar. We walked to the place where the convoy was to commence. We reached it quite late and the night was pitch dark. We were informed that the departure was being delayed until 4AM due to security concerns.

Mother decided to put us to sleep and went to the camp to fetch some blankets so that my siblings and I could sleep on top of them rather than on the floor. It was a dark night and she discovered that she had followed a wrong distant light and had reached a place called 'Clock Tower', where she was confronted by military. She was threatened to turn back else she would be shot down. Trembling with fear, she somehow found her way back to the place where the convoy was to commence the next morning.

The next morning, the convoy commenced on the route to Amritsar. There was a mad rush again and not enough room on the military vehicles. Some of our extended family and my second oldest sister were able to board and left for Amritsar.

My parents and the remainder of the family left a few days later. It was slow moving. We saw caravans moving in both directions. They consisted of thousands of refugees who walked 8-10 people abreast. Some brought their livestock with them. On route to Amritsar, the family saw a well filled with dead bodies of women who had plunged in alive to save their honor. It was said, with Punjabi hyperbole, that our beloved Chenab River was red in color for days due to the wounded and dying floating bodies.

It was the longest August for our family but at the end of the month we were rejoined at the family shop in Amritsar. But not everyone was so fortunate. My aunt (mother's sister) was killed, along with her family, except for one son who survived by faking death. His was a harrowing tale. He survived for two months - alternately sheltered by Muslim friends and hunted by others before he made a safe passage to India. During his hiding, he heard rumors that his sisters were abducted and alive. We made attempts to locate them but never found them. This remained a private wound for my mother.

For months after we moved to Amritsar, the news of killings and losses continued to come.

****

Our father's friend offered to have us stay on the

first floor of his house. Stress, and hygiene conditions took their toll and most of us, including me, were sick and down with diarrhea. One of my sisters had typhoid. My younger brother was born in this house.

My early memories began to take shape around this time. Golden Temple, as we know it today, is usually crowded. However back then, it was crowded several times over with hardly room to move. It was a much sought after place by every refugee even two years after partition.

Two generations have passed since partition but I know that we were shaped by its aftermath for better and ill. We experienced many moves (Amritsar, Jaghadhari, Bombay, Saharanpur and then back to Bombay) in the next four years, a period of general uncertainty and deprivation. My father tried his hand at businesses but they were not to succeed. He sold the shop, mother's jewelry and eventually became an accountant for Rs 80/M. Later my older brother, still in his teens, joined the same company. My eldest uncle assisted us financially when required.

Later we moved to Jagadhari to try our luck in business again and lived with my grandparents in a tiny room. When that did not succeed, the family split for a few years. Father and the older two brothers moved to Bombay and my mother and the younger siblings moved to a house allotted to us for refugee settlement in Amritsar. I was eleven years old before we could afford to all live together again.

During this time, my older brother and sister, after they finished tenth grade, became schoolteachers at new schools for refugees. One brother worked as a ticket checker for the Indian Railways. My sister and I bound books part time. We were ten brothers and sisters and it was tough for the two brothers in the middle to study with multiple moves and schools in different states with their own medium of instructions. But the family continued to sacrifice and persevere and had the younger ones focus on studies. Over the years, with help from scholarships and part time work, eight of us armed ourselves with college degrees and found ourselves a part of the emerging Indian urban middle class. My four older siblings stayed in teaching positions so that the younger ones could pursue professional careers in sciences.

I was perhaps the luckiest and finished engineering at IIT and in 1971 moved to the United States for an MBA with a bank loan guaranteed by a family friend who had done well.

****

In my teens, I used to wake up with nightmares but I also know that my story is only one of roughly 14 million. Studies in the West have shown that refugees the world over, like abused children, suffer from high cortisol (a stress hormone) and blood pressure. Muslims suffered equally. There were no winners. We were all a part of the largest migration in human history. One caravan alone had 400,000, refugees, so large in sheer number that it took about 12 hours to pass a given spot on its route. A million perished. In six weeks, half as many Indians and Pakistanis lost their lives as Americans did in four years of WWII.

India has forgotten about partition but it is alive in the lives of people who made this journey with no return. My siblings and I were denied childhood. Our pre-partition wealth has eluded us but we don't crave it. Partition has been a terrible reminder as to how terribly delicate is the fabric of civilization, of the vigilance required to protect it and of the painstaking work of mending it once it has been torn. It is a lesson we were supposed to have learned after Nazi Germany but it has been repeated after partition in Bosnia, Rwanda and the Middle East. Perhaps we are fated to forget and relearn. On a positive note, partition has forged among us work ethic, frugality, facing adversity with courage and a strong sibling bond.

I know the defining moment of my history is receding with each passing year. The next generation has its own sensibilities where partition is just a footnote. Perhaps it is for the better. We have made ourselves anew as each generation must. Wish the parents had lived to see it.

STORIES

Black Pearl

Mekhala Banerjee

One summer afternoon the sky was clear blue with patches of white clouds here and there.

The sun was generous, which is very uncommon in Chicago. Mira loves this kind of day like everybody else, but today she is in a very bitter mood. As soon as Nicole, her babysitter, called she knew something was wrong.

"Hallo, how are they doing?" she asked.

"What? Could you please talk a little slow?"

She couldn't realize what she was saying.

Nicole replied "I got a job, so from tomorrow on, I can't come."

She hung up. Mira burst into tears with anger.

Jim, in his forties, a sincere doctor who still loves research and a compassionate guy as a boss, came out of his office to talk to her about the new project. "What happened? A babysitter problem again? You have to solve this; otherwise it is hard to finish anything on time. "

She noticed a little annoyance in his tone. She couldn't defend herself because this was not the first or second time. She took couple of minutes to compose her thoughts.

"I will work evening hours after my husband comes home, just give me a week, I promise, I will find a steady babysitter."

Jim explained the work and left without much discussion. After he left, Mira started to run the sample, but her mind wasn't there at all. Her dark big eyes became full of tears with the reflection of sweet home atmosphere. Both of their parents' houses were full of people, housemaids and servants, just like a mega family. Her daughter, being the first grandchild, got enormous attention from everybody, she barely knew her mom or dad. Over there neighbors always stopped by to say "hallo".

Every day her brother-in-law Rabin after having tea and "luchi" (fried flat bread) after coming from work, used to say "Boudi (sister-in-law), feed my cute niece and dress her up. I will take her out."

Mira knew she was free for the whole evening.

They had a competition between brothers and sisters who will take the baby out to show her off to their friends.

She came to this country couple of years ago with her husband and little daughter along with a bag full of hope and joy. She didn't expect all this. It should be a lot easier, rather than this. Her former babysitter finally left; it was a blessing in disguise. Every other day she had a serious reason for not showing up. Mira was desperate to find a babysitter for her six-month-old son and maybe for his seven-year-old sister, that would be optimal. Mira's boss was nice enough about it for a while, but finally he said that either Mira find a reliable babysitter or he had to find a more productive employee. This was perfectly understandable to Mira, he needed to have the results of her work by a specific deadline.

She walked home thinking about all the possible places to look for a babysitter, without enjoying the blooming bushes, or planning which flowers to plant next year. On the way she picked up several ads, and couldn't wait to call.

As soon as she entered her building, their super Mr. Richardson welcomed her, asking about the kids. He wore his usual working clothes, a plaid shirt and jeans.

She collapsed, saying, "Please rescue me from the crisis, do you know anybody? Otherwise I have to quit."

She was so tense she wasn't clear about what she said.

"Calm down, tell me what's the problem. Let me see whether I can solve it," he smiled. Six feet tall, a strongly built German descendant, he and his wife were very nice, always with a helping attitude.

Mira took a couple of deep breaths and told him about the nightmare situation. That day was the last

day for her old babysitter. Mira had a couple of ads in her hand, but she didn't know if any would work out.

After listening to all her worried explanations, Mr. Richardson smiled in his usual way. "Don't worry, I know one girl in our church. She seems very nice, and she was asking me about some kind of job. I will tell her to call you." He consoled Mira in a fatherly voice.

Mira desperately said "Please don't forget; thanks so much," and took the elevator to her 5th floor apartment. She opened the door, and saw Nicole, the babysitter was waiting to leave. Mira hugged the baby, said hello to her daughter, deeply immersed in TV. She had to say "Hi" to Nicole and gave her the check for her work though Mira didn't like paying her this much. She didn't even show up two days this week and left early three days last week. Well, it's over now, in a way it's a relief, Mira thought.

Nicole left. Mira sat down on the sofa by her daughter with the baby in her lap, staring at the TV screen without noticing at all. She came back to her senses by her daughter's shouting "Mom look" then bursting into a laugh. Mira woke up from her worried thoughts. She wiped teardrops from her cheek. What a bad fate she had.

"No I shouldn't waste time," she thought to herself, and she put the baby down, played with her daughter's hair a bit, then went to the phone. She took the ads from her purse and sat at the dining table, on one side of her living room, so she could keep an eye on the baby.

She started: "Hello I am calling for a babysitter…No it's too far I can't drop the baby in the morning," and hung up. She called at least five or six numbers. No luck so far. She started to get annoyed. OK this is the last one, then I have to start cooking.

She murmured, "Hello I am looking..." "You talk to my daughter," the lady said in broken English with a heavy Oriental accent.

"OK, give the phone to your daughter." Mira talked to her and felt relieved, she was a Japanese lady who stays with her daughter, but the problem was she couldn't start right away.

"Well," Mira thought, "Maybe I could take days off here and there, go to work early, or work part-time, bla bla bla - at least I found somebody I want. She'll be available in only two weeks, I can manage somehow."

"Oh no," she jumped when she heard the time on TV. She had to start cooking, her husband would be home in a couple of hours. "Thank God he comes late" she thought.

She heard knocking at the door, and said "Who is it?"

Then they heard the familiar voice of Mr. Richardson. Mira greeted him with "Come in."

He replied "No, I was about to sit down to dinner, and all of a sudden I remembered my promise to you. Here is the girl's phone number."

Then he left, and didn't wait for Mira's sincere thank you. But he heard it through the elevator doors. Mira didn't wait to call the number. But no one was there.

"Well tomorrow is Saturday, I can call then. Friday night, no one stays home, especially the young people," her husband always says.

She went back to her kitchen, keeping an eye on her kids. Her daughter was playing with her brother. Mira finished her rice, chicken curry, lentil and spinach dishes. Then they heard the door. Her husband came in. Pretty soon they started dinner, with the baby in the high chair. Mira told the whole babysitter story to Dilip, her husband. She couldn't wait. After all the cleaning was finished they went to bed. Mira couldn't sleep at first, then she dreamt the babysitter turned her down.

She woke up in a cranky mood. Even before having breakfast, she called the number Mr. Richardson gave her. After a couple of rings, she got worried.

"Hello" said a woman's voice.

Mira said "Hello. I am Mira. Mr. Richardson gave me your phone number. Would you like to babysit?"

"Sure," replied the voice, "When do you want me to start? I can come today to meet you."

"Wonderful!" Mira wanted to dance. She didn't expect this quick and easy solution. She couldn't wait to see her new sitter. Mira woke everybody up, and finished breakfast. She wanted to get busy so time would pass faster. Finally she heard the door buzzer.

"Who is it?" called Mira.

"It's Doris, I'm supposed to come to meet you."

Mira pushed the buzzer, then opened the door, waiting for Doris. Those couple of minutes seemed like an hour.

"Oh no!" Mira couldn't figure out from the accent on the phone if the person is black or white. She was disappointed looking at her, a tall, slim, African American girl neatly dressed in a skirt and sweater. She was a young girl in her twenties.

"Come in, have a seat." She welcomed Doris anyway. They both sat down, so Mira could find out about her. Mira was even more upset, when she learned Doris worked in a hotel at night.

Mira looked pale, talking casually. "Where do you live?" she asked. "I need somebody at home at least by eight."

"No problem, I get off from work at 7:00, so I will be here by eight. I won't go home from work."

About an hour later Doris left. Mira told her husband, "I didn't like her, the place she lives sounds like a real slum. Not only that, she works at the hotel at night."

Dilip replied. "But she sounds ok to me, she is a telephone operator."

"That's what she said," Mira replied with a caustic tone. "She wouldn't say what she actually does."

"But," Dilip said calmly. "Why would a person lie, first of all, and secondly, if she is a bad person, she wouldn't look for a babysitting job."

"Well," Mira sighed, relieving a deep breath. "I don't have a choice right now, but after two weeks, that Japanese lady will start."

Mira went to take care of her son. Dilip had to take her daughter to swimming. Saturday and Sunday passed the usual way. Monday morning came, and before Mira had a chance to worry, the doorbell rang.

"Who is it?" Mira even forgot that the babysitter could come on time.

Doris entered with a big smile on her face. Mira kept talking and showing Doris what to do. Finally she left full of worry that Doris would sleep all day long, and she was sure something bad would happen to her son. She called home almost every half hour.

Nothing happened the first day. Every day afterward she came home thinking that she could find something wrong so she could fire Doris. No, not today. Eventually two weeks passed without any incident. The last day Mira paid Doris the same amount she was paying to her former babysitter. Doris didn't complain. Mira was happy to tell Doris that she found another person who will charge a lot less, and that money was a big matter to them at that time.

"Oh my God," thought Mira, she didn't expect this at all. Doris said she wouldn't mind getting less pay, but she absolutely needed the job. Mira was confused, she didn't know what to do now. She couldn't come up with another excuse. Doris kept saying she had lots of loans she had to pay back.

"OK I will call you on Sunday. I have to talk to my husband," said Mira.

She was trying hard to let Doris go. Mira closed the door, sat down and called the Japanese lady. She said she'd start on Monday. Oh, that made Mira is extremely happy. Finally she told her husband the whole exciting story, how she finally got rid of Doris.

"Oh, not again," Mira thought, when Dilip told her to keep Doris.

"Why? I don't know what she does at the hotel. On the other hand, this old lady is very nice could be just like our mother." Mira was persistent.

Dilip nodded his head. "If you want, you can take the Japanese lady, but you are not doing the right thing. You are assuming everything you think about Doris, and that is not right."

So it went on and on, the young couple's argument over their babysitter.

Dilip's view was rational. "Doris needs money, and the elderly woman lives with her daughter. She doesn't need money that badly. You should not do any injustice. The poor girl trying hard to be honest, you should give her the job."

Finally Dilip won. Mira said "OK, I will try two more weeks and if I see anything wrong, that's it."

And believe it or not, that two weeks never ended. Mira loved Doris so much she wouldn't let her go for four years. Finally her son needed to play with other kids at some preschool. Doris taught Mira's daughter good behavior, and read them good books all the time. Finally Mira had to move, she and her children couldn't hold back their tears.

Every year for the next several years Doris sent a birthday card for the kids with some gifts. She was a poor girl trying to make ends meet, but had a very rich soul. Mira thinks about Doris sitting in the porch of her new house. Once Mira bought a very pretty white dress for Doris.

She was very happy but said, "I won't wear the pretty white dress, because I'll save it for my wedding." She was a pure girl, in her mind, in her character.

Mira heard all her stories, of growing up, it was a typical poor neighborhood. All kinds of problems were around, everything we see on the news. Mira thinks that proverb is so true, "Don't judge a book by its cover." She is a genuine pearl and needs no description.

It is almost three decades later. Still Mira and her two kids, now adults, sing the Christmas song taught by Doris. "On the first day of Christmas my true love gave to me----"

It was so beautiful then, now it brings a joyous resonance in their hearts where still hangs a portrait of a big-eyed girl with a sweet smile. She herself is a woman over 50 now. Someday maybe their hope will come true.

Is This Bliss?

Kathy Powers

The mastery of energy
The power of a mantra
The beauty of humanity
The honesty of passion

I feel pulses of my life
My not-dead-yet beliefs
Strong brainy wisdom freely flows
My love, hypomania

These blameless, happy impulses
Spur me on a course
To help myself and others now
Whilst I remain untouched

Oh yes, I always take my meds
I skip along steep cliffs
To me, I'm soaring with the breeze
With persistent connectedness.

STORIES

Guavas Grow Near Juba – A Memoir

Bakul Banerjee

"No matter how thin you slice it, there will always be two sides."

— Baruch Spinoza

My meager luggage, a rolling but wobbly carry-on suitcase, was packed and standing next to the door. It was heavy, but my backpack sitting next to it still had enough room to stuff my purse in it before boarding the plane. A maximum of two pieces of carry-on luggage that's the rule for my travel. I was heading out to London from O'Hare. Sixteen pockets of my travel vest were filled with other essentials. The dispatcher from the taxi company suggested that the driver should pick me up three and half hours before the departure time of all international flights. That was fine with me because I could never sleep the night before any big trip.

Through the haze of dawn I noticed that the taxi was on the driveway fifteen minutes ahead of time. Back in the kitchen I gulped down the last few drops of the coffee, but the doorbell rang. A very tall and substantial man was standing at the door.

"Good morning." He reached for the suitcase and slung my backpack across his shoulder. I rushed back to the kitchen to put on my coat. By the time I closed the door and ran out, he was about to close the trunk with the backpack inside.

"May I have my backpack - inside the car with me?" I asked. Taking it out of the trunk, he handed it to me as I tried to put the seatbelt on. I hadn't had a chance to see his full face yet, but felt his significant presence. In the blue light of dawn, his deep black skin had taken the hue of indigo blue. Where had I seen that skin tone? I remembered the picture of the Lord Krishna, my favorite deity, strategically placed in our hallway to the garage so that I could see his benevolent face playing the flute every time I had to go out to the car. The taxi driver had exactly the same complexion. I always thought that Indian artists painted Lord Krishna and Lord Rama in rather unrealistic colors, but the skin of a black man from the African continent could also take on that same blue hue under certain light.

His clean navy blue polyester suit looked bluer. It had been a while since I met a suited taxi driver. As he got into the driver's seat I could see the right side of his face.

"How do you plan to pay?" He asked as he turned his face partially toward me.

"With my credit card." I answered mechanically, then I noticed for the first time a set of deep horizontal scars on his forehead. It was as if somebody had held his head against a burning grill, the kind of cooking grills commonly used by north Indian street food vendors. I was curious and eager to start a conversation, but kept quiet until we got out of my neighborhood.

"What is your name?" I asked.

"David," he answered.

"Where are you from?" I had to ask.

"From South Sudan," he replied.

"War is still going on there. Isn't it?"

"It is not so bad now, but it was very bad when I left."

"When did you come to the US?" I could not help but ask. A few months ago, I had read some internet stories about mass murders committed by the Sudanese People's Liberation Army (SPLA) starting in 1983. Victims were mostly Christians who lived in rural villages in the southern part of Sudan. Many of the orphaned children were able to escape. They walked to faraway Ethiopia first, then migrated to Kenya. This migration continued till 2005. They became known as the lost boys of South Sudan to the aid workers in the camps.

"About twelve years ago," he replied. That was approximately the year of 2005, about the time when several lost boys, now young men, resettled in big cities in the US, including Chicago.

"I came from India more than forty years ago. I wanted to study in a big university here." I shared my story with him hoping that he would reciprocate with his own, which was bound to be far more interesting than mine.

"Oh! That was a long time ago."

"Yes, but, as you know, time flies. This country has been good to me and to my children. How about you? Do you like it here?" I said.

"Yes, it is OK, but South Sudan is much better." I was somewhat surprised by the tentative undertone in his voice. If my calculations were correct, this middle-aged man in front of me was one of those lost boys. Of course, immigrant hearts ache for their birth countries.

"What do you miss about your birth country?" I probed.

"It is pretty and green all the time. I miss the fruit trees everywhere," David said.

"What kind of fruits?" I asked. Although quite fluent in speaking English, he had difficulty in translating the names of the fruits. Since Chennai in India and South Sudan share approximately the same latitude, I started rattling off the names of popular fruits in Chennai.

"Mango? Jackfruit? Guava?" I suggested.

"Yes, yes, guavas," he said, and after a pause, "Mangoes too."

"I like mangoes and guavas." I said with trepidations. "Are you a Christian?"

"Yes, I am. And you?"

"I was born a Hindu." I replied while trying to get a closer look at his forehead in the rearview mirror.

"That is good. Hindus are good. They don't bother others."

"Thank you. We try to be good. Our scriptures teach us to be good unconditionally."

"I do not know if this country will remain safe for people like me for long," he replied.

The traffic became heavy at that point. Suddenly, his phone rang.

"Pardon me, Miss. I have to take this call," he said as he began talking in a foreign language. That was an interesting change, I thought. During my last few trips in limos and taxis, I had Indian drivers. Almost all of them carried on non-stop loud conversations in Hindi or Gujrati with their friends, ignoring my discomfort. I had a feeling that they knew I might understand their conversations. Perhaps, being an Indian woman, I was invisible to them. Therefore, they could be disrespectful. I laughed at myself thinking about my earlier statement of being good unconditionally.

"Sorry, Miss." His animated voice brought me back to the present. "That was a call from my brother in Sudan. I bought a farm there and my family lives on it. It is the harvest season. I sent money to pay the temporary workers, but my lazy brother did not go to the bank at the right time. Now, the workers are threatening to take up another job. It might ruin the harvest."

"Do you have a big family there?"

"Yes. Many of us returned to our village after the war. I visit my mother there as much as I can."

"That's great. Just before the call, you mentioned that you don't feel safe here anymore. Please tell me why."

"Let me tell you a true story. Last week, nuns who helped me to settle here came to see me. They helped a Sudanese family, supposed to be a Christian one persecuted by the Muslim majority, to emigrate recently. Nuns found them a place to stay, gave them things for home and money. They also found the woman a job in an office. Recently, they went to visit the woman at her workplace with a belated Easter gift basket. The woman was wearing a Hijab and told the nuns that she would not accept gifts from Christians because she was observing Ramadan." His voice trailed off as the taxi approached the O'Hare airport. Another car was about to cut in front of him.

"How could the family fool the nuns from the charities?" I blurted out.

"That is easy. One can find many Bibles in hotels all over Africa. They study the book and pretend to be Christians. The nuns sponsored them believing that they were being persecuted in Sudan, just like me. How can I feel safe here when people

whose family members probably killed my people are coming here telling lies and getting benefits? The nuns were quite upset with me. I tried to tell another nun about this family earlier, but she did not believe me." Although he told the story in a matter-of-fact tone, the anguish in David's voice was unmistakable. There was a long pause.

As we passed under the signs of departure terminals, we busied ourselves with the business of payment, exchanging charge cards and receipts. In spite of the occasional traffic jams on the way, I had plenty of time left before boarding.

In front of the British Airways terminal, David took out my luggage. As he helped me out of the taxi, I took time to let the picture of the old scars from burnt flesh splashed across the forehead of this hulk of a man sink inside my brain. He probably sustained that injury while fleeing from SPLA soldiers. He carried my luggage inside.

As I ambled toward the check-in desk, I took time to digest David's story. I knew that most charitable organizations did take in Muslim refugees routinely. Just last week, one of my friends told the story about how her church welcomed a Muslim family. Since I had no way of validating David's story, I had to accept it. I could not deny David's perceived threat. If I had to take the story on its face value, I should also feel threatened. I travel around the streets of Chicago in my Indian outfits, and often perform worship in empty Hindu temples where I leave the doors open according to our religious customs. I concluded that the nuns were upset not because the woman was Muslim, but because of the lies they were subjected to, coupled with the deceit and egregious display of thanklessness.

I had to turn my attention to something positive and remembered the trees laden with guava fruits in my family's orchard in Varanashi, India. Those fruits grew from small sizes like large marbles into large globes within a week. That accelerated rate of growth always amazed me. I wondered if David and other young boys were able to sustain themselves eating guavas, at least for a few weeks, during their long walks when danger and betrayal waited for them at every corner.

To Grandmother's House

Shreya Datta (11th Grade)

Alas ends our eighteen-hour journey
Luckily the flight landed early
Searching for the luggage we stowed
To Grandmother's house we go

To navigate the narrow streets
Requires skills that only the rickshawala meets
Keeping patience as the traffic slows
To Grandmother's house we go

We catch sight of the mango trees
And don't feel as if we're overseas
Basking in the summer glow
To Grandmother's house we go

She stands at the front door
And embraces us till we can take no more
Smelling her saree's sweet lavender scent
To Grandmother's house we went

STORIES

The Last Lesson

Jill Charles

The grain elevator was the tallest building in town. At sunset it cast a shadow over the Best Flour parking lot and the Methodist Church, all the way up Main Street. Ryegrass darkened early but Lila Blake stayed up late.

Lila looked out the window of the ice cream shop at the golden sky, the rolling hills of wheat and woods beyond it. The metallic shadow of the mill dominated the horizon.

Lila's mother and father both worked at the mill. Her dad had unloaded trucks of wheat from local farms and loaded wheat, white and pastry flour onto trucks and even train cars pulling up onto tracks beside the mill. Her parents had met at the mill, Mom smiling behind the front desk, Dad in flour-dusted overalls and a union T-shirt asking her out for pie on their first date. Twenty-three years and three kids later they were still together and still in the same jobs. Tucker, their oldest son, worked with Dad on the loading dock.

“Listen to the train,” Lila said to Wallaby and Roo.

The blond brother and sister gazed out beyond the grain elevator where the brown and green boxcars chugged along.

Their mom was Professor Hobbes; her first name was Sunflower but Lila always called her “Ms. Hobbes” or “Ma'am.” She taught evening anthropology classes at State College three nights a week as well as high school history during her children's school day.

Lila had worked as a nanny for the Hobbes family for three years now, since she was fourteen, and baby-sat Wallaby and Roo since she was twelve. Lila liked being the oldest for a change, able to give Wallaby and Roo directions as she never could with her older siblings Tucker and Jolene at home.

“Roo, Wallaby, do you want to go to Patterson Park and play on the swings?”

“Yeah! Yeah!”

The streetlights weren't on yet. It was May and starting to stay light until almost nine. Patterson Park was on their way home, only five blocks from the Hobbes house.

Wallaby and Roo rushed down the street pausing only a few seconds at each crosswalk. Few cars were out at seven in the evening, except some teenagers cruising. Lila caught up to Wallaby and Roo at a crosswalk as a white pickup truck full of high school boys slowed down. Ryan Johnson leaned out the window and spat on the ground, staring up at Lila holding Wallaby's hand.

“Hey Lila, is that your boyfriend?”

“Don't spit at me! I'll beat you up!” Wallaby yelled.

“Me too!” Roo piped up. “I know tae kwon do!”

Ryan and his friends laughed as he sped away.

“Don't pay any attention to them,” Lila told the kids. “They're just idiots.”

“Nobody can talk bad about our Lila,” said Roo.

She hugged Lila and Wallaby gave her his secret jumping high five. Lila wished the kids could grow up without hearing the words classmates hissed at her in the halls of Ryegrass High School or scratched into her locker. It had started with “teacher's pet” and “four eyes” in first grade and gotten worse every year.

When they reached Patterson Park, Roo and Wallaby raced for the swings, with Roo barely winning. They could pump their legs to swing themselves high, but they still begged Lila to push them. Lila liked the swings too and was about to climb on one when she saw Mr. Whittier crossing the park. He wore a blue pouch over his shirt with his baby son facing forward, wiggling his arms and legs and smiling.

Lila saw Mr. Whittier every school day in her AP English class, but she had never seen his baby. Mr. Whittier sat on his desk reading aloud from

Hamlet or *The Bell Jar* or The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian. He had clapped during her oral report on Edith Wharton's short story *Roman Fever*. The other students rolled their eyes, not understanding Wharton's irony, not dreaming about seeing Rome. Lila dreamed of other times and places every day, especially in Mr. Whittier's class.

He waved to her and she waved back. Lila felt too old now to jump on the swings, seventeen and not a kid anymore. She would be a senior in the fall. She hoped Mr. Whittier would pass by quickly and she wouldn't have to talk to him outside of school, that Wallaby and Roo wouldn't ask him a million dumb questions. Their mom knew him and they had seen him acting minor parts in Ryegrass High's plays.

Already, Roo and Wallaby slowed down and climbed out of their swings. The baby was the newest person in town and they approached him cautiously, curiously.

"Hi Mr. Whittier," said Roo. "What's your baby's name?"

"His name is Timothy," Mr. Whittier said, settling on a park bench with Timothy on his lap. Wallaby tried to give Timothy his high five but very softly. Timothy grabbed Wallaby's finger and cried when he had to let go.

"Hello, Lila," said Mr. Whittier. "These children keep you busy, don't they?"

"Yes. They're really fun," Lila said.

Mr. Whittier gave Timothy his bottle. The baby wore a University of Iowa hat.

"What's on Timothy's hat?" Wallaby asked.

"That's University of Iowa," said Mr. Whittier. "Where I went to school. I went to writers' college."

Roo asked Lila "Can we play tree tag?"

"Sure."

"I'm it!" Wallaby yelled, chasing his sister off into the pines and willows by the stream. They flickered like shadows from one tree base to the next.

Lila was about to join them when Mr. Whittier said "Lila, there's something I wanted to ask you about."

"Yes?"

"Have you thought about colleges?"

The question made her heart sink like a fishing weight. Mom and Dad changed the subject when she brought up college. Neither of them had gone to college and they thought it was a waste of money. She could go to work at the mill right out of high school, like her brother Tucker, like them.

"I'd like to go but I don't know how I'll afford it," she admitted. "Maybe State College."

Her older sister Jolene had dropped out of State College, pregnant in the first semester of nursing school. She had told Lila "No one studies there. All they do is party on the weekends with their high school friends."

Lila didn't care what anyone else around her did. She would learn as much as possible anywhere and State College was the cheapest, closest college besides online courses.

"Lila, if you wouldn't mind, I'd like to meet with you sometime where we have more time to talk."

Timothy pushed his bottle away and fussed. Mr. Whittier stood up and rocked him.

"To talk about your future, I mean," he said. "There are some college options you may not have considered."

"Sure, that would be great."

She liked talking to Mr. Whittier but hopefully it would not be at school or anywhere her fool classmates might drive by. She would never hear the end of it.

Mr. Whittier reached into his pocket and gave her a flyer. It read *Breaking the Mirror: Gender and Freedom in Victorian Literature*. Mr. Whittier's name and picture were listed with three other presenting professors with doctorates.

"I'm speaking on a panel at State College on Sunday. I know it's short notice, but I thought you might be interested and we could talk after."

"Sure, I'll ask my mom if I can get a ride."

"Let me know. If you can get out there, I could give you a ride home."

"Thank you."

Mr. Whittier waved goodbye and Timothy waved back at Lila too. She hardly noticed Wallaby and Roo rushing up behind her until Wallaby grabbed her arm, screaming "You're it!"

Instantly she saw herself drinking coffee across the table from Mr. Whittier in a room full of smart people and fine art. She imagined riding home in his car over the rolling hills and wheatfields as the stars came out. Like a date, she couldn't help thinking. It was a stupid thing to think about a man twice her age with a wife and new baby, but nobody had taken Lila out before. A few hours outside Ryegrass, at a college, would be worth the effort.

At dinner that night Lila waited for the right moment to ask for a ride to State College on Sunday.

Jolene dished up barbecued chicken, baked beans, corn, broccoli, a big salad and a raspberry jello mold with real raspberries.

"Pretty tasty, Jolene," Dad said, as he did every night.

"Cooking is the least I can do," she said, settling T.J. in his high chair.

Since she was staying home with T.J., Jolene had become the family's main cook and housekeeper, a role that Mom couldn't wait to pass on. It made sense since Jolene couldn't afford day care and no one else in the family could watch six-month-old T.J. while she got a job or went back to school. Her child support from Brett, her jobless rich boy college ex-boyfriend, barely paid for diapers and baby clothes. Jolene ground cooked rice and bananas into baby food for T.J.

"Do you girls have any plans for the weekend?" Mom asked.

Jolene shook her head.

Lila reached into her pocket and showed her family the flyer.

"I'd like to go to this lecture at State College. I can get extra credit in English if I go and I've read all the books and stories they're talking about: Wings of the Dove, Age of Innocence, *The Yellow Wallpaper*."

Her mother scrutinized the flyer, then passed it to Dad. He turned it over without reading it; Dad's only reading was *Field and Stream* magazine and *Sports Illustrated.*

"It looks interesting," said Mom. "Is anyone from your class going?"

"Not that I know of. I was going to ask if I could take the truck," Lila asked.

"No can do," said Dad. "I need to fix the brakes on the truck before anyone takes it on the highway. I was planning to do that on Sunday."

"I could get a ride back, just not out there," said Lila.

"From who?" asked Dad.

"Mr. Whittier."

"Is Professor Hobbes going to this?" Mom asked.

Lila shook her head.

"No, she always stays home and plays with her kids on Sundays."

Tucker had his own car, a jeep that ran better than Mom and Dad's truck. Jolene could

drive but wouldn't want to take T.J. in the car for two hours.

"Could you drive me?" Lila asked her brother.

"What's in it for me?" Tucker asked.

"I'll pay for the gas and buy your lunch at Burger Factory by the college."

Burger Factory cheeseburgers were Tucker's lifelong favorite food: flame-broiled, cheesy and topped with everything.

He reached out to shake Lila's hand.

"You got yourself a deal."

"One thing, Lila," Dad added. "Take your phone with you. Call me before you leave the college. If Mr. Whittier's dropping a couple kids off, I don't mind that, but I don't want him going out of his way for you. If you need a ride back from this thing, I'll probably have the brakes fixed by then. If not, I can take T.J.'s jeep."

"Thank you, Dad. I will."

"Yeah, don't put Mr. Whittier out," said Jolene, burping T.J. on her shoulder.

On Sunday Lila went to the bathroom before the hour-long car ride and watched Jolene bathing T.J. in the tub. She washed his hair gently and he squeaked his rubber duck.

"What are you wearing to State College?" Jolene asked.

"This," said Lila, pointing to her black T-shirt, jean shorts and sandals.

Jolene shook her head and said "If you're going to college, you should dress like a college girl. Wear your purple sundress with the daisies. You can take my leather jacket in case you get cold."

"Really?"

The black leather jacket was Jolene's prized possession and she had never let Lila borrow it before.

"Sure. Maybe you'll meet a college man. You never know."

Jolene stood behind Lila at the mirror and brushed her sister's brown hair back out of her eyes and clipped the top half back in a golden clip, letting the rest fall over her shoulders.

"You're pretty, you know," Jolene said.

"Not like you," said Lila.

"No need to be like me," said Jolene. "Just make the most of what you got and don't waste it on some turkey like my ex."

Lila hugged Jolene and kissed T.J. goodbye.

Tucker yelled from downstairs "Come on, Lila. We gotta go!"

She changed in her room and rushed downstairs, grabbing Jolene's leather jacket. Tucker turned the key in his jeep.

Dad slid out from under the truck, legs first and hollered "You call me when you're done, Lila."

"I will!"

Tucker listened to Cat Country radio and sang along for the whole hour drive toward campus. Lila rolled down her window to let her brother's caterwauling out and the spring wind in. Pink and white blossoms waved in the apple orchards and cows grazed on the green hills. A hawk wheeled over the pine woods and hills, all alone, seeing everything.

At Burger Factory, Tucker ate a bacon double cheeseburger and onion rings but Lila felt so nervous she could barely finish a grilled chicken sandwich.

"You're awful quiet," Tucker said. "Are you excited to see State College?"

"Yeah," said Lila. "I've been there before for Shakespeare plays, but it's been a while." "It must feel different knowing you'll be going there," Tucker said.

"I don't know I'll be going there. I can't even apply till September."

"You'll get in," he said. "With your grades you'll get a scholarship for sure. I know Mom and Dad will help you as much as they can and I will too."

Lila shook her head.

"I feel bad taking their money and I couldn't take yours."

Lila had seen her mom and dad lay out the bills on the table and argue about which credit card to pay off after they thought all their kids were in bed. They had always wanted a new house with two bathrooms and more than three bedrooms. The house they lived in had been Dad's grandparents' homestead. Jolene and Lila had shared their room until T.J. was born. Dad and Tucker had put a wall up in the attic to make half of it Lila's new room, a little nest of books with her writing desk looking out from the third floor window. The ceiling sloped; you could only stand up in the center of the room.

"I'm proud of your grades, Lila," Tucker said for the first time ever. "Jolene and I tease you a lot for being a nerd, but if anyone else picks on you, We'll punch 'em out. We want you to make it in college. You'd be the first one in our family to graduate. You could be a teacher, an author, a lawyer or the president if you want."

Lila shook her head and said "I couldn't get elected for anything."

"Well, I'd vote for you. Especially if you let me borrow Air Force One for a date with Jennifer Lawrence."

Lila burst out laughing.

"We gotta have dreams," Tucker persisted.

"What's your dream?" Lila asked her brother. "Don't tell me stuff about girls or cars. I mean your real dream in life."

"I dream about owning my own house, an old one I could remodel, with a big garden. I'd like to grow most of my own food and have cows and chickens and a horse. I'd like to have a wife and kids

and have barbecues out in the yard with all our family and friends. I'd take all the extra fruit and vegetables and give it to the food bank. That would make me happy."

"Are you happy working at the mill?"

She had never asked him that before.

"Sure," said Tucker. "All the maintenance crew guys are cool. Bob's kind of an idiot manager sometimes, but I ignore most of what he says anyway. I like working with Mom and Dad and I'm proud to be in a union."

Lila said "I just dream of getting a book in print someday, somehow."

"You will, Lila. You will."

Tucker dropped her off in the parking lot by the admin building, the one old brick building among the 1960s concrete and glass ones.

"Enjoy your lecture," he said.

"Enjoy work."

"Lila, make sure you call Dad, even if you have a ride, or he will totally freak out. He probably fixed the truck already and I'll leave my Jeep at home just in case he needs it."

"Thank you, Tucker."

Lila pushed open a huge wooden double door of the admin building and looked down the quiet hallway. She passed empty classrooms and bulletin boards with flyers for plays, movies, rock shows in the quad, Take Back the Night and voter registration. Almost every cultural event in the county took place on the State College campus, except for movies and the rodeo.

Lila climbed wide marble steps to the third floor. At the far end of the hall golden light shone through the windows of two double doors. She checked the room number on the flyer and found it next to the door.

She opened the door as quietly as possible, hoping not to draw too much attention to herself. She wanted to sit in the back, yet wanted to be sure Mr. Whittier saw her. She looked up at the four speakers seated on stage and found him. She was just in time; the English department dean was introducing the professors and Mr. Whittier. The audience applauded them as Lila walked in. The lecture hall was so full that she had to sit near the front at the end of a row.

As Mr. Whittier stepped up to the microphone, Lila waved but she couldn't tell if he saw her or if the stage lights obscured the audience. He read from and discussed *The Yellow Wallpaper* by Charlotte Perkins Gilman.

"The husband presumes that as a doctor, he is qualified to diagnose his wife. He never questions whether his own feelings and desires might make him less than objective about her health. He believes that her dissatisfaction with life is a physical illness that rest can cure. He wants her to feel better, but he also feels shame that she is unhappy, maybe unhappy with him and their marriage. His shame is another reason for him to isolate his wife in her bedroom. He thinks every woman with a home, husband and children should be happy. Why not his wife? He never even asks the question that Freud couldn't answer: *What do women want?*"

"Freedom," one female student called out.

"Exactly," said Mr. Whittier. "That answer would be too terrifying for the doctor to contemplate.

"Charlotte Perkins Gilman struggled with depression and endured rest cures, but unlike the narrator of *The Yellow Wallpaper* she fought her way out of the trap.

"Gilman left her first marriage. She pursued her own writing career and wrote Herland the story of a feminist utopia. She became one of the best known writers in the first wave of the American feminist movement at a time when women could not vote and co-educational colleges were a radical idea. None of us would be here today, including me, if Gilman not risked writing honestly about her deepest fears and highest hopes."

Lila enjoyed his analysis of the story but wondered why Mr. Whittier would not be here at State College without Charlotte Perkins Gilman. It had always been a co-educational school. Maybe a female professor had encouraged Mr. Whittier's studies. He had told a story once about his mother pulling his teenage writings out of the trash and telling him not to give up on them.

The three professors discussed Wings of the Dove, The Age of Innocence and Jane Eyre. Dr. Chopra, Dr. Ziemkowski and Dr. Jackson were

all brilliant, engaging women who told jokes in their lectures, unlike most of Lila's high school teachers who struggled to keep their classes' attention and rarely risked making students laugh.

Lila took notes in a black and white composition book in a fold-down one-arm desk chair, just like the older college students around her.

This is college, she thought. *This is what it feels like to learn as much as I can as fast as I can about subjects that actually interest me. Everyone in here has read all these books and understood them too.* She hadn't felt that way since grade school. In junior high, Ryan Johnson and associates started picking on anyone who actually read books.

Even in her family, her mom had rushed to the Bookmobile with her for story hour when she was three, four, five and six, but after that Mom and Dad were too busy and tired to read aloud to her. They complimented her grades but tuned out when she told them about her reports on Sacajawea or the ankylosaurus. Mom read *Reader's Digest* and *The Ryegrass Review* newspaper when she had time to read at all. Even Jolene teased Lila for liking Jane Eyre.

"Why do you like such old books? Why don't you just watch the movie?"

Lila gazed across the faces of the audience and saw adults of all ages, some white-haired who could have been professors or adults with long careers behind them going back to school. Students had come from all over the US, from Japan, Saudi Arabia, Kenya and Germany. One big Samoan wore his State College T-shirt with a sarong and flipflops.

This lecture was free, anyone could attend, but to study here, Lila would need $25,000 a year. This was the closest college to home and cheapest in the state but her entire family combined could not pay that much.

What would it feel like to only see Mom, Dad, Tucker, Jolene and T.J. on some weekends, holidays and summers? Would her family resent her for "leaving them behind"? Mom had been proud of Jolene when she went but Dad had said the money would have been better spent on a house than an education.

Lila didn't want her own house or family, not yet, and never in Ryegrass. She had felt that for a long time and wanted to talk to the one person who might understand.

A question and answer period followed the lectures but Lila couldn't think of an intelligent question and there were a flock of hands in the air. She waited until the last question was discussed and the audience began to walk out.

As she approached the podium, Mr. Whittier was listening to the three professors and drinking a glass of water. She waved to him and he saw her this time.

"Lila! I'm so glad you could be here."

He introduced her to Dr. Chopra, Dr. Ziemkowski and Dr. Jackson.

"This is Lila Blake, one of my best student writers."

"It's good to meet you," said Dr. Jackson. "What do you like to write?"

"I've written some short stories and a screenplay."

"I teach screenwriting and film every winter," said Dr. Ziemkowski. "Including Jane Campion and Ida Lupino."

Lila nodded; she had seen a few movies by these directors, but her only filmmaking experience was short films made on Jolene"s cell phone.

Mr. Whittier said goodbye to the professors and sat on the edge of the stage, his legs hanging next to Lila.

"Did you get a ride here or do you need a ride back home?" he asked.

"Yes," said Lila. "I could use a ride. Tucker drove me but he had to go to work."

She put off calling Dad and didn't want to ask him to drive an hour out of town when Mr. Whittier was going back to Ryegrass anyway.

He hopped down from the stage and landed beside her with a thump. She reached out to steady his arm and make sure he didn't fall. He smiled and patted her shoulder.

"Before we go back, let's get a coffee at Cafe Utopia," he said. "My treat."

"Will it be crowded?" Lila asked.

"It's never empty and open 24/7," he said. "But this is Sunday night, so most people there will be finishing papers at the last minute." They walked to the edge of campus to Cafe Utopia, an 1880s wooden storefront. Its wide arched windows showed tables full of books, coffee cups and students and others discussing everything. Two smokers outside argued politics.

"Less government regulation means more jobs."

"Less regulation means water that cools the nuclear plants goes in our drinking water!"

Inside, the walls were painted cobalt, lime green, purple, every color but white and covered with paintings and drawings of mermaids, aliens and landscapes with wild rabbits in sagebrush. One entire wall was a chalkboard. People had written:

God is dead and it is we who killed him. - Nietzsche

In the midst of winter I found there was, within me, an invincible summer. - Camus

One cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well. - Virginia Woolf

Nietzsche is dead. - God

Mr. Whittier wound his way easily between tables with glowing laptops, chemistry textbooks and bowl-sized cappuccino cups. Customers lined up for coffee and food by the counter with the hissing espresso machine. Cooks stirred soup and added sprouts and hummus to sandwiches.

"Get whatever you like," said Mr. Whittier.

"I shouldn't spoil my dinner," said Lila.

She felt starved and couldn't wait to dig into her mother's Sunday crockpot roast at home. She decided on a Monkey Mocha with whipped cream and sliced bananas on top.

Mr. Whittier got a cup of chai with soy milk and lentil soup.

"Are you vegetarian?" Lila asked.

"All my life," he said. "I've been known to drive all the way out here for a vegan 7-layer bar. My wife complained but I brought her one too."

The coconut, chocolate and graham bars did look pretty good. They settled in to eat at a quiet table in the back of the room.

"Do you ever wish you taught at State College?" Lila asked.

He thought about it, then shook his head.

"No. I like teaching high school. I like seeing students discover 1984 and Shakespeare for the first time and really get it."

Lila remembered students complaining about Shakespeare; "It's English but you have to translate it!" They all acted out scenes, some better than others, but everyone who read it ultimately "got" the stories. Lila felt much less patient with others than Mr. Whittier.

"I couldn't teach," she said. "I couldn't speak in front of a group."

"I think you could if you really cared about your subject and your audience."

"What do you do when an audience doesn't listen?"

"I present them with everything the text has to offer and a little of my own interpretation and experience. Then I ask for their interpretation and experience. They may like what they read or not. They may hate it and disagree, but even then they can learn from it. Everyone brings something different to a story they read and takes different insights away."

"I really liked the lecture," Lila said. "I loved what you said about *The Yellow Wallpaper*."

"Thank you."

"When I was in the audience I felt like I was going to college here. Like I was out of high school and living here."

"Is State College where you want to be?"

Lila hesitated.

"I want to go to a four-year school. I've been saving money from my nanny job for three years. I have ten thousand."

"That's impressive."

"That's not nearly enough, even for one year here."

"Have you considered any other colleges?"

"It's hard to when I know I can't afford it. My folks have to save for their retirement and support my sister and baby nephew. I can't just blow $100,000 on myself. It's wrong."

Mr. Whittier looked serious. He opened his leather briefcase.

"I want to show you something," he said.

He handed her a printed list of colleges. She flipped through it and noticed ones for each state, Alaska, Washington, Iowa, California and New York. Each college had a list of department websites, deans and scholarships, with all the requirements to apply for each one.

"Where did you get this?" she asked.

"I made this," he said. "I checked everything online first, then called the departments to be sure. I update it each summer for the fall. Every one of these scholarships would pay for all four years of college tuition and they are all merit-based. You might not qualify for every single one, but most of them you would, and the scholarship applications are free."

"Why doesn't Mrs. Putnam hand these out to everyone?" Lila asked.

Mrs. Putnam, the career counselor, was red-faced, constantly angry and used her one required meeting with Lila to tell her "Writing is not a career. You should switch to marketing if you want to make a living and not bury yourself in debt."

She had never read anything Lila had written, only glanced at her report cards and test scores as if counting coins.

"I've given this to Mrs. Putnam every year," he said. "The other teachers and I give it out to students and even ask to students to go into Mrs. Putnam's office and ask for scholarship information so she'll have to hand it out. She says college is a waste of money for most of our students and Ivy Leagues are only for millionaires.

"I know that scholarships are competitive and there are no guarantees. I'm shocked at how much tuition has gone up since I worked my way through U of Iowa with Americorps, a few grants and an all-night diner job. It makes me sick sometimes to see people who need and deserve an education not try for it and to have anyone telling them 'College a waste of money.' Not learning, not choosing the career you actually want is a waste of your life."

Lila blinked back tears.

"It's your decision," Mr. Whittier said. "You have all year to think about it, to talk to your parents and to see which schools and programs you are interested in. But I wanted to encourage you to try for college and not to limit your choices to State College alone. I'd write you a recommendation for anywhere."

She wanted to read her work in front of an audience or better yet to have hundreds of students reading and appreciating her words and then discussing them with her and writing their responses.

Lila reached her hand out as if to hold his hand, her arm stretched across the checkerboard table, maybe just to steady herself. He wrapped both hands around his oversize chai mug, sipping the spices from faraway. Mr. Whittier didn't seem to notice her hand but looked Lila straight in the eyes.

"Don't be discouraged, Lila," he said. "Wherever you go, whatever you study or work on, please keep writing and don't give that up."

"I couldn't give it up," Lila said. "I always knew that, but what if I never get published?"

He smiled.

"Do you know how many times my writing has been rejected?

"854. That includes my book, my screenplay and all my articles and short stories that have been printed now. Almost every one of them got rejected - a lot - before a publisher accepted it. That's normal. You get used to rejection."

"I'd like to get used to acceptance for once," she said.

"In college you would."

"I can't leave my family, my friends."

"Apply here. It won't hurt anything. Visit and meet the professors. But if you want to try other colleges, go for more than one."

"How do you know I can succeed?"

"I know that because I've read your writing. I don't know you as well as your family but I have seen your talent and motivation. There's something else you should see."

He removed a picture from his briefcase. It showed a teenage boy with big square glasses, bad acne and shaggy blond hair. He wore a buttoned-up shirt and grinned through braces at a sign beside him reading *Welcome to the University of Iowa*." He was ugly, skinny but so happy that she recognized his eyes.

"That's me when I was seventeen," Mr. Whittier said. "I felt like nobody understood me. I lived in an Indiana town where everyone grew corn or worked at the corn syrup factory and if you were a boy and couldn't play football, you weren't a male and needed to be punched every day, which I was. I wrote a novel then and gave it to a girl I had a crush on. I heard her and all her friends laughing about it in the lunchroom and she wouldn't even speak to me. I wanted to die, at the time, but then I began to think of going away."

"You have a great life now," Lila says. "Your job, your family, you're published."

"Lila, I got it all by writing and you can too. You make your life - you, not your genetics, not your environment - but your decisions. I'm a hopeful existentialist or a stubborn beatnik s.o.b. as my dad used to say."

Lila laughed.

Mr. Whittier looked at his watch and said "We should drive home."

Lila excused herself to the restroom and finally called her dad.

"I had wondered when I'd hear from you. The truck's up and runnin'. Should I meet you by the admin building there?"

"I've got a ride, Dad, with Mr. Whittier. We're just leaving. My phone's about to die."

"Now wait just a minute…"

She hung up.

Lila looked back at Cafe Utopia. She could be happy at State College, she realized, but also at University of Iowa, Barnard, Evergreen State College or Xavier University in New Orleans. Maybe even Oxford.

On the drive back to Ryegrass she asked Mr. Whittier about his travels.

He had studied in London and Paris and taught English in Busan, South Korea. He told her about taking the train from Calcutta to Bombay and the Trans-Siberian railroad. He had honeymooned in Venice.

"I've never even been on an airplane," Lila admitted.

"You will. Sooner than you think," he said. "If money was no object where would you go?"

"Piazza San Marco in Venice. Rio de Janeiro at Carnivale. Boston and New York. Alaska and Hawaii. London and the Lake District where Austen and Wordsworth lived. All over Ireland. Russia. Kyoto, with the old Buddhist temples and Angkor Wat. Ayers Rock in Australia. The Egyptian pyramids and the Mayan pyramids. I'd like to see the Himalayas, not even to try to climb there, just to see them. Have you ever climbed any mountains?"

"Only the Appalachians," he said. "They were very attainable mountains."

They laughed.

"I wanted to ask you something," Lila said. "Sure."

"In your lecture, you said you wouldn't be at State College today without Charlotte

Perkins Gilman. I wanted to ask what you meant."

"I had a teacher in high school who encouraged me, Mrs. Jenner. She drove the debate team to U of Iowa. She's the one who took that picture of me and told me I should apply there. Without women like Charlotte, Mrs. Jenner wouldn't have become a teacher and neither would I."

The lights of Ryegrass shone in the darkness like white and yellow stars. She enjoyed

seeing this with Mr. Whittier, but immediately dreaded being seen with him by anyone she knew, especially Dad waiting on the front porch. He would squint at Mr. Whittier, sizing him up, suspicious and skeptical of him as a rival role model. Jolene and Tucker would tease her again.

"Just drop me off at the end of the driveway please" she said.

"Sure. Lila, if you ever want to meet with me and your parents about colleges, I'd be happy to."

"Thank you," she said. "I'll show them the list. Thank you for making that for all your students."

He reached out and shook her hand, as an equal.

"Good night, Mr. Whittier."

"Good night, Ms. Blake."

Slowly she walked up the gravel driveway and watched his red tail lights pull away.

Mom and Dad sat on the porch, holding hands and swinging gently in the porch swing.

Upstairs, Jolene sang T.J. to sleep. Tucker had left his Jeep and walked to his shift at the mill. He would walk home after eleven just in case she might need a ride. How could she tell them she was leaving?

She climbed the front steps and Mom beckoned to her, making room for her to sit on the porch swing.

"Did you like your lecture?" Mom asked.

"I loved it," said Lila. "It was great to hear about women writers, how their books helped the suffrage movement, so all women could get the vote and be able to go to college and have careers."

"One day they'll be reading your book at State College," Dad said.

Lila was surprised.

"We're proud of you, honey," Mom said. "You study hard and work hard. We know you'll make your own way."

Lila didn't take the college list out of her composition book, but for the first time in months, she sat down between her parents and hugged them both. Maybe they didn't understand her, but they loved her and believed in her. They would help her any way they could. No matter where she studied or lived, no matter how far away she traveled, her family would always be with her, in every hopeful word she wrote.

She remembered being four years old and going to the Bookmobile in Patterson Park with Mom holding one hand, dad holding the other. Lila would take two steps and on the third step they would swing her between them as if she could fly away.

STORIES

The Land Where It Rained Erasers

Samrat Bose

A modern fairytale.

It had all been very hectic.

Rahul collected his papers from his office desk and rushed home. At his doorstep, he fumbled for his keys before finally gaining entry. He had just four hours left for his flight. He swore as he gulped down a cup of tea and almost burned his mouth. As he waited for his taxi, he began to think about his day.

It was a miracle that he could leave his office when he did. The whole day had been a mess. How he wished he could turn things around. He woke up late as his phone alarm did not ring. He realised he had not left it to charge overnight and it had shut itself off. He put it on charge as he went for a quick shower but then in his hurry had left his phone at home. He had almost forgotten about his meeting with a client and it was an innocent query from Raj over a relaxed lunch that almost choked him as he realised this. He returned to his table and while he was furiously tapping away on the keyboard finalising the presentation, he noticed a black mark on his right sleeve just above the wrist. He felt it was futile to attempt to wash it so rolled his sleeves halfway up his forearm during the presentation. The meeting went on for longer than expected as Rahul had done a rather good job after all and the client was interested in having a rather long discussion about it.

Finally on his way to the airport, he heaved a sigh of relief. The roads were relatively empty for some reason and it took less time than usual to reach his terminal. Having already checked in online, he made it through security and to his gate. There was now ample time for him to sit back, relax and curse his client. Once he had boarded, he settled in cosily and stared out of the window. He felt more and more relaxed as the plane taxied on the tarmac, ran the runway and finally took to the air. Rahul unfastened his seatbelt and settled in further. The skies had gradually turned a deeper hue of blue. Rahul realised it was night as he was two hours into the flight. There were stars but the moon was nowhere to be seen. As he continued to gaze, he noticed that one star seemed brighter than the rest. It was quite far away in the beginning but was gradually getting bigger. Rahul sat up a little. It was obvious that the flight was not going toward it, for he would not be able to see it from his window then. As a few more minutes passed, he realised it was not a star after all. It was some kind of a very bright cloud; or at least it resembled one. As it came nearer, his plane took a turn and swerved toward and finally, entered it.

As soon as it happened, there was a sudden flash of light which made Rahul jump. He looked around. The other passengers were either playing with their phones or asleep. Looking outside once again, he found they were flying over a rather brightly lit part of the world. He could not understand it. It had just turned night and surely, it could not turn into day in a matter of minutes! He peered out of his window and tried looking downwards. No, it was day all right. He could see greenery beneath in the form of mountains and valleys. After a while, roads criss-crossed the scenery and small vehicles could also be seen. Rahul thought it was all very odd. He had taken this flight before and a lot of the times had been at this same time. He could vouch that he had never ever seen this before.

As things started getting bigger, he realised the flight was descending. He could see bigger buildings and what appeared to be the runway. The flight took a final turn and descended on it.

As he got off the plane, he noticed things were very different. On the tarmac were mounds of small pellets. There were not many mounds but a few were scattered here and there, more toward the airport building than toward the runway, for which he was thankful. When he passed by one of them, he noticed these pellets were actually small erasers. Now how curious was that? He turned around to his fellow passenger walking beside, a man in a grey hat, and wondered aloud why people would have small dunes of erasers scattered around this way. The man looked at Rahul with a rather astonished face. "Yes, but isn't that normal?" he asked.

Rahul could not remember if he had read or heard anywhere that there was a new regulation of some sort in airports. As he looked away from the rather bemused gaze of the man, obviously the reaction to Rahul's perplexity, he was surprised once again.

The erasers had all disappeared.

Rahul did not have time to ponder much as he was already in the airport building, rushed ahead by the passengers behind him. Everyone seemed hurried but they formed a steady, almost mechanized stream of people as they just walked along. No one seemed to have noticed the erasers; at least there was not a murmur he could hear. He could not see the man in the hat any more and was thankful about it. Clearing immigration, he suddenly realised that all this was rather new. After all, this was supposed to be a domestic flight.

As he continued to walk along the rather familiar airport building, he found the familiar face of the taxi driver waiting for him with a placard. He had used this taxi service before and they were quite reliable. Ramesh smiled and greeted him as he approached, took his bag and went toward the parking lot. As he stepped out of the airport, he was surprised once again. The sky was of a rainbow hue.

"What's going on?" asked Rahul.

"Anything wrong, sir?" asked Ramesh, with a look of concern.

"The sky. It's a rainbow colour all over!"

"Yes," replied Ramesh. "It's a rather bright day, isn't it? It's always good after a spell of rain, and as you know, we have just had the morning rain."

Bright day? Of course it was rather bright. But a rainbow sky? Rahul caught a glimpse of Ramesh's face in the rearview mirror as he started to drive. It was a puzzled expression. Rahul decided to keep his thoughts to himself as the car took a slip road and sped along the motorway.

"So what about the erasers?" Rahul asked Somesh as they met on the office balcony. Somesh was a colleague he had known over the years. A colleague but almost a friend, Rahul could ask him questions of any sort and get away with it. "What erasers?"

"Eraser pellets were strewn around the tarmac. They would be a nightmare in any airport. How are they even there in the first place?"

"Eraser pellets?" asked Somesh.

"Yes, eraser pellets," carried on Rahul. "Some guy almost acted like it was normal to have pellets strewn around on the tarmac." Rahul stopped as his eye caught a glimpse of something on the far end of the balcony. A small mound of those erasers clustered there.

"Damn, Somesh, what's going on?" Rahul exclaimed.

Somesh looked at him in bewilderment. "But that's rain, Rahul. Eraser rain. Whatever's happened to you?"

"Eraser rain?" Rahul felt almost at the verge of losing his sanity. The rainbow sky was laughing at him. He staggered to a chair that Somesh hastily drew forward. He realised his clothes were soaked in sweat. Somesh knelt beside him. "Are you feeling okay?" he asked with a look of genuine concern.

"I...I'm not so sure any more," replied Rahul, his voice barely audible. Somesh helped to loosen the tie around Rahul's neck and made him sit back.

"Rahul," he said softly, "that's eraser rain, like it or not. You had the same reaction when you were here last. Don't you remember?"

Rahul remembered nothing. His mind was in a tizzy as Somesh went on. "We are indeed the lucky ones, Rahul. We get eraser rain. They fall at the sight of the slightest imperfection and sort things out. Look at that spot where the erasers were."

Rahul turned to his right. The mound was not there any more. What was a dirty corner, unattended a few moments ago, was spotless now. The flower pot that stood in that corner with the wilting flowers had vanished. A plastic plant now stood there, in all its shine and bright colours. "This beautiful place you see, Rahul, was once all natural. The plants, the birds, animals. Even the blue sky. They were natural, but imperfect. That is when it all changed. When one day the skies opened up and it rained erasers. Wherever they fell, on whatever they fell, they cleaned it all up. We now have no dirty puddles to jump into and get dirty, no stray dogs messing around the streets, no birds dropping litter around and the

sky...the sky does not carry those worthless clouds that would drench us without warning. We now have spotless weather, a rainbow hued sky all the year round with no nights and darkness. On the ground, our trees do not shed leaves; they are uniformly green all the year round. The weather telecast is perfect; every morning sees a shower as we leave for work and we are made spotless as we walk out of the house at that very hour."

Somesh paused. "But why am I having to tell you all this? Look at yourself, Rahul. You look perfect."

Rahul saw himself in a reflection on a glass pane. He could not recognise himself. Despite the hurried start, the flight, the emotional upheavals and his sweat-drenched feel, he looked pristine. He also noticed something else. The image did not have a frown while in reality, he felt he was frowning as he tried to make sense of it all. He touched his forehead.

"No frowns, Rahul." Somesh was smiling at him. "No negative emotions, no place for doubt. It's all been taken care of."

"But who? Who controls all this?" cried Rahul, staring at his image which just stood there, staring back at him.

"We do, Rahul. We all do and have done so over a while now. We work, play and do everything bound by perfect timing. No delays, no problems. It is all just perfect."

Rahul stepped back. Somesh was staring at him now. It was then that something hit Rahul. Somesh had not blinked even once.

"To blink, to miss, is imperfection, Rahul."

Rahul did not quite hear this. He was tearing down the stairs, regardless of the fact he had nine stories to climb down. He heard Somesh's voice calling out to him. It echoed and reverberated from the walls as he raced down and out of the building. Once out, he hailed a taxi. "To the airport. And double fast."

"There is no fast or slow, sir," droned the driver. "It is always the perfect speed."

Rahul hurtled out of the car and got into the airport building. He was scheduled to return the next day but could not wait any more. He sped to the airline's counter and asked if his ticket could be pre-poned. The lady behind the counter stared at him for a while then looked at her screen. Yes, there was a flight in an hour.

On board, Rahul opened his briefcase and looked inside. He expected to have his cheese sandwich smelling by now, having forgotten to eat it over such a long time. He half-apologetically looked at the person next to him as he opened the box. It was fresh. Fresh as rain. Rahul was hungry but of two minds if he really wanted to eat it. He shut his briefcase, leaned back on his seat and shut his eyes.

The flight took off so smoothly that he did not even realise it. He felt a sudden shudder and woke with a start. "Put on your seatbelt, sir. We are about to land." The stewardess was smiling at him.

Rahul looked out of the window. It was raining outside. Water was streaming down across the window pane. It was somewhat rough outside and the plane took a few bumps. Rahul felt like jumping out of his seat in sheer joy, but of course he could not do that. So he resigned himself to a smile and hummed a tune. His fingers began to tap a rhythm on the hand rest, then stopped abruptly. His sleeves were spotlessly clean.

The flight hit the tarmac hard, bumped twice, then sped along the runway.

REVIEW

Pappadum

Balarka Banerjee

Living in Kolkata, many of us are guilty of falling into the mindset that "South India" is somehow one giant, amorphous region. This is the root of a lot of jokes about how Bengalis of typically see the rest of the country as simplistically divided along "north" and "south", often forgetting the massive diversity that exists south of the Deccan. Unfortunately, this mindset is also frequently applied to food. The Kolkata foodie is certainly a big fan of "South Indian Cuisine" but this is typically limited to Dosa, Idli, Utthapam and sambar. These dishes have come to form part of the staples for most people and are commonly featured on many restaurant menus. However, it is often overlooked what a wonderfully diverse and distinct range of cuisines are actually prevalent in that region. This is partly because there is not a big representation of these cuisines on the Kolkata food scene.

However, one restaurant that is looking to highlight the culinary gems of southern and coastal India is the playfully named "Pappadam". It's located on SR Das Road, Mudiali, just off Southern Avenue, which has lately become a major foodie hub in South Kolkata. It's a sister establishment to the popular "Biriyani Company" and is located next door to it. We were invited to dinner by the owner Saugata Banerjee and his wife. The cozy 30 seater restaurant is tastefully decorated with warm vibrant colours and contemporary artwork true to the region. As we sat down to dinner we were immediately greeted with an assortment of pappadams and piping hot cups of delicious rasam. Saugata comes from a background in Economics and management and has successful careers in academics and business. His love for food is what drew him into the restaurant business when he opened the Biriyani Company. Saugata explained to us how the concept of Pappadam had come out of their passion for travelling in southern India and the food that they had grown to love. The menu was designed to take people on journey from the Arabian Sea to the Bay of Bengal, sampling delicacies form a broad of range of regions such as Goa, Coorg, Chettinad, Andhra, Konkani and Malabari. The big focus was on the coastal regions and primarily seafood, which should excite every Bengali.

For starters we decided to try the Squid Kali Mirch and Chicken Chettinad. Squid is a notoriously unforgiving seafood to cook as it has a tendency to turn rubbery. However, the squid was clearly fresh and cooked to perfection, so that it was soft on the inside and crunchy on the outside. The seasoned coating had strong flavours of black pepper and a good hit of chilli. It was dish similar to "salt and pepper squid" often seen in Mediterranean or South East Asian cuisine, but this one had a distinctly Indian twist to it. While Chicken Chettinad is a dish many would be familiar with, the Pappadam version was cooked extremely well and with a delicate touch. Each piece of chicken was soft and succulent, covered in spices which sing on your palate, without overpowering it.

For mains Saugata strongly recommended "appam and mutton stew" as well as the "Goan fish curry" with a side of lemon rice and Goan beans. Appam is a common Keralite dish but rarely makes an appearance on the menus of most South Indian restaurants. They are small fluffy pancakes made from fermented rice and coconut milk. It is similar to a dosa but usually soft and smaller. It is typically served with a white, lightly flavoured mutton stew. Pappadam's appam and stew is indeed the kind of dish you could easily eat almost every day. The light uncomplicated flavours bring that comforting familiarity that we love about home-cooked food. It was also refreshingly different from the stronger, more robust flavours of most of the other dishes and served to balance the meal beautifully.

The Goan fish curry delivered the strong punchy flavours that one would expect. The rich tangy sauce perfectly complemented the sweet flesh of pomfret fish. The fluffy hot lemon rice was the ideal accompaniment along with the crunchy and fresh green beans. As we reached the end of the meal, Saugata promised us a surprise final course. The menu featured two desserts, namely halwa and payasam, as sweet dishes are not typically a big feature of South Indian coastal cuisine. However, knowing the Bengalis' love for sweets Pappadam has created a fusion dessert of sorts. We were served fresh hot Appams with the Bengali favourite nolen gur (liquid jagegry)! The result was delicious and reminded me of the "luchi" and nolen gur we often have during special occasions or festivals. The dish was not yet on the menu, but to me it seemed like an instant hit.

Pappadam is a unique gem in the burgeoning South Kolkata food scene. The cuisine was unique and each dish we tried had distinct, strong and balanced flavours and clearly used fresh, quality produce. The menu is diverse with many delicious seafood, meat, poultry and vegetarian options. The prices seemed reasonable for the quantity and quality of food (most starters priced around Rs 150-200 and mains at Rs. 250-300). They also offer the option of booking larger groups or even the whole restaurant. The staff was courteous and attentive and dishes were served promptly. Overall, the thoroughly satisfying culinary experience ensured that we would want to come back again and also recommend it highly.

Disappearing Chicago

"Life Feathers"